ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ (নিসার বিশপ গ্রেগরি-লিখিত)
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ ἤτοι ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΜΩΥΣΕΩΣ (সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ অর্থাৎ মোশির জীবনী)

গ্রীক পাঠ্য : Simonetti critical Edition, 1984 ; Simonetti এর সংস্কৃত গ্রীক পাঠ্য on-line না থাকায়, বিকল্প হিসাবে এ লিংক দ্রষ্টব্য (যা প্রায়ই Simonetti-এর পাঠ্য থেকে যথেষ্ট ভিন্ন)।

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ
AsramSoftware - Donations
Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : November 1, 2024

Version 1.1 (April 22, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

নিসার সাধু গ্রেগরি

সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ

অর্থাৎ

মোশির জীবনী

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

- সাধু গ্রেগরির সংক্ষিপ্ত জীবনী
- সাধু গ্রেগরির লেখাসমূহ
- মোশির জীবনী
- মূল্যায়ন

সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ অর্থাৎ মোশির জীবনী

- ১ম পুস্তক
- ২য় পুস্তক

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

গণনা (গণনাপুস্তক)

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রবচন (প্রবচনমালা)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

সিরা (বেন সিরা)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

এজে (এজেকিয়েল)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)

২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)

১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)

প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

সাধু গ্রেগরির সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু গ্রেগরি আনুমানিক ৩৩৫ সালে কাপ্পাদোকিয়ায় (আজকালের তুরস্কের মধ্যবর্তী অঞ্চলে) আদর্শ খ্রিষ্টিয়ান একটা ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের ভাইবোনদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে তাঁর বড় দিদি মাক্রিনা ও বড় ভাই বাসিলের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। বড় দিদি মাক্রিনা ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা ও বড় ভাই বাসিল ছিলেন তাঁর জীবনের আদর্শ। উন্নত শিক্ষা লাভের পরে তিনি অলঙ্কারশাস্ত্র-শিক্ষকতা পালন করেন ও বিবাহ করেন; কিন্তু পরবর্তীকালে বড় ভাইয়ের ইচ্ছাক্রমে তিনি জগৎ প্রত্যাহার করে বাসিল-প্রতিষ্ঠিত একটা মঠে নির্জন জীবন যাপন করেন। সেখানে তিনি ধর্মীয় গবেষণায় দিন কাটান।

তবু তিনি বেশিক্ষণ সেজীবন ভোগ করতে পারেন না, কারণ আরিউস-ভ্রান্তমতপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কারণে বাসিল (যিনি ইতিমধ্যে কায়েসারিয়ার (আজকালের কাইসেরির) বিশপ ও কাপ্পাদোকিয়া অঞ্চলের প্রধান বিশপ হয়েছিলেন) ৩৭১ সালে গ্রেগরিকে নিসা ধর্মপ্রদেশের বিশপ পদে নিযুক্ত করেন; দার্শনিক-মনা গ্রেগরি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে ধর্মপ্রদেশের পরিচালনায় তত সফল হন না।

৩৭৯ সালে বাসিল মৃত্যুবরণ করেন; ৩৮১ সালে গ্রেগরি কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভায় যোগ দেন; বিশেষ পালকীয় দায়িত্ব পালনে আরোব অঞ্চলের মণ্ডলীগুলো দেখতে যান; ৩৯৪ সালে কনস্তান্তিনোপলিসে আর একটা আঞ্চলিক ধর্মসভায় যোগ দেন; এবং সম্ভবত অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। খ্রিষ্টমণ্ডলী সাধু গ্রেগরির পর্ব ১০শে জানুয়ারীতে পালন করে।

সাধু গ্রেগরির লেখাসমূহ

ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, সাধু গ্রেগরি তত্ত্ববিদ্যায় উন্নত প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন; তিনি প্লেটোর মতবাদের পন্থী ছিলেন, ও বিশেষভাবে আলেক্সান্দ্রিয়ার ইহুদী দার্শনিক ফিলোন (খ্রিঃপূঃ ২০-৫০ খ্রিষ্টাব্দ) ও আলেক্সান্দ্রিয়ার খ্রিষ্টিয়ান ঐশতত্ত্ববিদ অরিগেনেস (১৮৫-২৫৩) এর লেখায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন: সেই ফিলোন ও অরিগেনেস উভয়ই তৎকালীন গ্রীক কৃষ্টির দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করে বাইবেলের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেই অনুসারে সাধু গ্রেগরির লেখাসমূহও সেই ধারা অনুসরণ করে, এবং এধরনের লেখাগুলোর মধ্যে 'মোশির জীবনী' প্রাধান্যের অধিকারী।

তাছাড়া তিনি আরিউস-মতবাদের বিপক্ষেও কিছুটা লেখেন, যেমন: 'এউনোমিউসের বিপক্ষে', 'আপোল্লিনারিউসের ভ্রান্তমতের বিপক্ষে', বিশ্বাস প্রসঙ্গ', ও অন্যান্য ক্ষুদ্র লেখা।

বাইবেল ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে এ লেখাগুলো উল্লেখযোগ্য, 'হেক্সামেরোন প্রসঙ্গ' (অর্থাৎ বাইবেলের প্রথম ছয় পুস্তকের ব্যাখ্যা), 'মানব-নির্মাণ প্রসঙ্গ', সামসঙ্গীতমালার শিরনাম প্রসঙ্গ' ও অন্যান্য ক্ষুদ্র লেখা।

সাধনা-জীবন সম্পর্কে উপরোল্লিখিত 'মোশির জীবনী' বাদে এ লেখাগুলোও উল্লেখযোগ্য: 'খ্রিষ্টীয় জীবনধারণ', সিদ্ধতা প্রসঙ্গ', 'কৌমার্য প্রসঙ্গ', 'মাক্রিনার জীবনী', 'উপদেশক বিষয়ক উপদেশমালা', 'পরম গীত বিষয়ক উপদেশমালা', 'প্রভুর প্রার্থনা', 'সুখ-বাণী প্রসঙ্গ' ও অন্যান্য ক্ষুদ্র লেখা।

মোশির জীবনী

সর্বপ্রথমে, লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, যে লেখা সাধারণত 'মোশির জীবনী' বলে পরিচিত, সেই লেখার প্রকৃত নাম হল 'সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ অর্থাৎ মোশির জীবনী'। এতে স্পষ্ট দাঁড়ায়, সাধু গ্রেগরির এলেখার প্রধান লক্ষ্য হল 'সদ্‌গুণ' সম্পর্কে কথা বলা, এবং মোশির জীবনী হল সেই মাধ্যম যা সদ্‌গুণ বিষয়টা স্পষ্ট করে তোলে। আর আসলে ২য় পুস্তক সদ্‌গুণ বিষয়টা উপস্থাপন করার জন্য মোশির জীবনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ব্যবহার করে।

তবে 'সদ্‌গুণ' ধারণা সম্পর্কে দু' একটা কথা বঞ্চনীয় হতে পারে। গ্রীক কৃষ্টিতে ἀρετή (আরেতে) ধারণা নৈতিক জীবনের শীর্ষস্থানের অধিকারী; শব্দটার সাধারণ

অর্থ হল ‘গুণ’, কিন্তু এমন গুণ যা একক (ফলে ‘গুণাবলি’ শব্দ বা ধারণা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ও সহজাত নয় বরং নৈতিক আচরণ বৃদ্ধি ক্ষেত্রে সাধনারই ফল; এজন্য এ গ্রীক শব্দের জন্য এই অনুবাদে ‘সদ্‌গুণ’ শব্দ ব্যবহৃত। তাই, যেমন গ্রীক তত্ত্ববিদ্যা অনুসারে সদ্‌গুণ ও সিদ্ধ জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তেমনি সাধু গ্রেগরির ধারণায়ও সিদ্ধতা (বা সিদ্ধ জীবন) ও সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন এক; এমন সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন যা ঐশজীবনে সহভাগিতা বলেই উপলব্ধ।

‘মোশির জীবনী’ চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১) মুখবন্ধ: এখানে সাধু গ্রেগরি লেখার উপরোল্লিখিত প্রধান বিষয় তথা ‘সদ্‌গুণ’ প্রশস্ত ভাবে উপস্থাপন করেন;

২) মোশির জীবন বৃত্তান্ত: এখানে তিনি যাত্রাপুস্তক ও গণনা পুস্তক অনুসরণ করে মোশির জীবন সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেন;

৩) মোশির জীবন-বৃত্তান্তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা: মোশির জীবন বৃত্তান্তে যা উপস্থাপন করা হল তা তিনি সেই একই অনুক্রম অনুসারে প্রশস্ত ভাবে ও এক একটা ঘটনার আধ্যাত্মিক অর্থ সহকারে ব্যাখ্যা করে সদ্‌গুণ সংক্রান্ত শিক্ষাও উপস্থাপন করেন। তাই তিনি মোশির আধ্যাত্মিক জীবন-যাত্রা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ব্যক্ত করে মোশিকে সিদ্ধতা অভিমুখে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আদর্শ বলে তুলে ধরেন।

৪) উপসংহার: লেখার ৩য় অংশের সারকথা উপস্থাপিত: মোশি সত্যিই সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের ও সিদ্ধতার আদর্শ, এবং পাঠক তেমন আদর্শের অনুকারী হতে আহূত, সেও যেন মোশির মত ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে ওঠে এমনকি ঈশ্বর দ্বারা তাঁর বন্ধু বলে স্বীকৃত হয়, কেননা ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে ওঠাই প্রকৃত সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য ও সিদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্য। এতে মুখবন্ধে যা পুস্তকের লক্ষ্য বলে উপস্থাপিত হয়েছিল, পুস্তকের উপসংহারে সেই লক্ষ্যও সিদ্ধিলাভ করে।

সাধু গ্রেগরির শিক্ষা সঠিক ভাবে বুঝবার জন্য একটা শব্দই বিশেষ ব্যাখ্যার যোগ্য, তথা: θεωρία (থেওরিয়া), যার আক্ষরিক অর্থ হল ‘দর্শন’ কিন্তু খ্রিষ্টীয় পরিভাষায়, সেসময় এমন অন্তর্দৃষ্টি নির্দেশ করত যে অন্তর্দৃষ্টি শাস্ত্রের আক্ষরিক অর্থের চেয়ে ‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর অর্থ’ বের করত; আরও, শব্দটা সেই ‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর ব্যাখ্যা’ও নির্দেশ করত যা দ্বারা শাস্ত্রের ‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর অর্থ’ বের করা হত। ‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর অর্থ’ ও ‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর ব্যাখ্যা’ শব্দদ্বয় এই অনুবাদে

‘আধ্যাত্মিক অর্থ’ ও ‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ শব্দ দ্বারা উপস্থাপিত; কিন্তু পাঠক/পাঠিকা যেন মনে রাখেন যে ‘আধ্যাত্মিক’ বলতে, এখানে ‘রহস্যাবৃত’ বোঝায়। সাধু গ্রেগরি θεωρία (থেওরিয়া) শব্দটা ঠিক এ অর্থেই ব্যবহার করেন, এবং সেই অনুসারে তিনি ‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ প্রয়োগ করে শাস্ত্রের কোন না কোন বাহ্যিক ঘটনার ‘রহস্যাবৃত-আধ্যাত্মিক অর্থ’ খুঁজে বের করেন।

এতে সাধু গ্রেগরির বিশিষ্ট আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায়; প্রকৃতপক্ষে বিশেষজ্ঞগণ সাধু গ্রেগরির ‘রহস্যকেন্দ্রিকতারই’ কথা বলেন কারণ তিনি বহুবার μυστικός (মিস্তিকোস) শব্দ ব্যবহার করেন যার অর্থ ‘রহস্যাবৃত’। কিন্তু ‘রহস্যকেন্দ্রিকতা-আধ্যাত্মিকতা’ ক্ষেত্রেও দু’টো কথা বলা বাঞ্ছনীয়, কেননা আজকালে আধ্যাত্মিকতা বলতে প্রায় সবকিছুই বোঝায়, যেমন ব্যক্তিগত ও উচ্চ ধরনের ধ্যান-ধারণা, অসাধারণ জ্ঞানপ্রাপ্তি, কঠোর অনুশীলনী তথা কৃচ্ছ্রসাধনা, পছন্দমত সাধনা ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু, সাধু গ্রেগরির ও সেকালের লেখকদের বেলায় ‘রহস্যকেন্দ্রিকতা-আধ্যাত্মিকতা’ শব্দ খ্রিষ্টীয় রহস্য-উপলব্ধিকেই কেন্দ্র ও লক্ষ করে, যেখানে খ্রিষ্টীয় রহস্য বলতে সেই সাক্রামেন্তসমূহ বোঝায়, বিশেষ করে এউখারিস্তিয়া-রহস্যকেই বোঝায় যা সত্যিকারে রহস্যময় যেহেতু পবিত্র আত্মার কর্মের ফল (বাস্তবিকই এইখারিস্তিয়া-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অনুষ্ঠাতা বলেন, ‘... আসুন, এ পবিত্র রহস্যগুলি যোগ্যরূপে উদ্‌যাপন করার জন্য আমাদের পাপ স্বীকার করি’); ও সেজন্য রহস্যকেন্দ্রিকতা-আধ্যাত্মিকতা অর্জন করা কেবল ব্যক্তি-বিশেষের জন্যই সংরক্ষিত ব্যাপার নয় বরং সবার সমান অধিকার। এই অনুসারে, সাধু গ্রেগরির প্রস্তাবিত আধ্যাত্মিকতার শীর্ষচূড়া হল ঈশ্বরকে অনুসরণ করা (২৫০-২৫২ দ্রঃ)। তাই, যে কেউ মোশির মত ‘ঐশ্বরিক কণ্ঠের অপেক্ষা করে ও প্রার্থনা করে সে যেন ঈশ্বরের পিছনে যেতে পারে’, সে-ই ঈশ্বরের প্রকৃত দাস; প্রকৃতপক্ষে এপুস্তকে অন্য ধরনের প্রার্থনা বা ধ্যান বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনী উল্লিখিত নয়: বরং আকাঙ্ক্ষা একটামাত্র, তথা ঈশ্বরের কণ্ঠ শোনা; প্রার্থনাও একটামাত্র, তথা ঈশ্বরের অনুসরণ করা।

তবে কি, এখানে জাগতিক বিদ্যার জন্য কোন স্থান নেই? অবশ্যই স্থান আছে, কেননা যেমন মোশি মিশরীয়দের উচ্চশিক্ষার অধিকারী ছিলেন, তেমনি সাধু গ্রেগরিও গ্রীক তত্ত্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন; কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে সতর্কতা দাবি করেন পাছে জাগতিক বিদ্যা আমাদের সাহায্য করতে করতে আমাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্রের স্থান দখল করে। তাঁর নিজের কথায়, ‘তত্ত্ববিদ্যা নিজের দীর্ঘকালীন প্রসববেদনার কোন্ ফল

দেখাতে পারে? অথবা, তেমন ও তত বেদনার কোন্ যোগ্য ফল দেখাতে পারে?' (২য় পুস্তক ১১ দ্রঃ)।

যে বিষয় সাধু গ্রেগরির সার্বিক শিক্ষাকে একত্রে ধরে রাখে, তা হল 'অবিরত অগ্রগতি' (২১৯, ৩০৬ দ্রঃ): প্রাচীনকালের গ্রীক দার্শনিকদের সাধারণ ধারণাই যে সিদ্ধতা কর্মসিদ্ধিতে স্থিত, কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকদের মত অর্থাৎ স্তোয়া মতবাদের পন্থীদের মত সাধু গ্রেগরিও এধরনের সিদ্ধতা অস্বীকার করেন; বরং ফিলোন ও অরিগেনেসের এমন ইঙ্গিত অনুসরণ ক'রে যা অনুসারে সিদ্ধতা ধাপের পর ধাপের ধারাবাহিকতা বলে বর্ণিত, তিনি তেমন অগ্রগতিকেই সিদ্ধতা বলে নির্দেশ করেন। এই অগ্রগতি-ধারণা পুস্তকের মুখবন্ধে ঘোষিত (১:৫-১০): 'যখন একজন নির্দিষ্ট সীমা খুঁজে পেতে পারে না, তখন সে কেমন করে নির্দিষ্ট সীমার নাগাল পেতে পারে?' আরও, যেহেতু 'সিদ্ধতার পক্ষে একমাত্র সীমা হল সীমাহীন হওয়া', সেজন্য সদ্‌গুণের লক্ষ্যে দৌড়ে থামা সম্ভব নয়, থামলে রিপুর সূচনা হবে (১:৫; ২:২৪২) দ্রঃ)। এর ফলে সাধু গ্রেগরি সিদ্ধতা-ধারণাটা এভাবে নির্দেশ করেন, 'মঙ্গলের অংশভাগিতা অনুক্ষণ বৃদ্ধি করার ইচ্ছায় নিবিষ্ট থাকাতেই মানব স্বরূপের সিদ্ধতা প্রকাশ পায়' (১:১০ দ্রঃ)। তারপর, তিনি এই 'বৃদ্ধি' শব্দটা 'অগ্রগতি' শব্দে পরিণত করে ঘোষণা করেন, 'কোন সীমা ঈশ্বর অভিমুখে আরোহণের অগ্রগতি রোধ করে না, কারণ মঙ্গল সীমাহীন; মঙ্গল-বাসনার অগ্রগতিও কোনও তৃপ্তি দ্বারা বিঘ্নিত নয়' (২৩৯ দ্রঃ)। এবং এই অগ্রগতিতে থামা যায় না: বাস্তবিকই মোশি আরোহণে যে ধাপে পৌঁছে যেতেন, সেই ধাপে সবসময় এমন আর এক ধাপ পেতেন যা সেটার চেয়ে ঊর্ধ্বতর (২২৬ দ্রঃ)। তাই সদ্‌গুণে অংশভাগিতা অবিরত বৃদ্ধি পায়, কেননা যদিও দেহ তৃপ্তি পেতে পারে, তবু প্রাণ সবসময় পিপাসিত হয়ে থাকে (২৩০ দ্রঃ)। সদ্‌গুণে অগ্রগতি মঙ্গলে অবস্থানে সিদ্ধ হয়, কেননা 'মানুষ মঙ্গলে যতখানি সুস্থির ও অবিচল থাকে, ততখানি সে নিজের সদ্‌গুণ-দৌড় সম্পন্ন করে' (২৪৩ দ্রঃ)। এক কথায়, মানুষের পক্ষে একমাত্র সাধ্য সিদ্ধতা হল সিদ্ধতা অভিমুখে অবিরত অগ্রগতি: 'প্রাণের জন্য সিদ্ধতা অভিমুখে পথ হল উত্তম মঙ্গল অভিমুখে জীবনের অবিরত অগ্রগতি' (৩০৫-৩১৪ দ্রঃ)।

এবার আসুন, সাধু গ্রেগরি যে ধর্মতাত্ত্বিক ক'টা ধারণা এপুস্তকে অনুধাবন করেন, সেগুলো সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করি।

ঈশ্বর : সাধু গ্রেগরির আধ্যাত্মিক শিক্ষা এ ধর্মতাত্ত্বিক ধারণায় দৃঢ় স্থাপিত যে, ঈশ্বর অসীম। মুখবন্ধে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'যা সঠিক ও মূখ্য অর্থে মঙ্গল, যার স্বরূপ হল মঙ্গলময়তা তথা স্বয়ং ঈশ্বরত্ব, যা কিছু প্রকৃতিগত ভাবে মঙ্গলকর বলে পরিগণিত, এসমস্ত কিছুই হলেন সেই ঈশ্বরত্ব, ও ঈশ্বরত্ব সেইভাবেই অভিহিত'। এবং যেহেতু রিপু ছাড়া সদ্‌গুণের অন্য সীমা নেই ও যা ঈশ্বরত্বের বিপরীত তা ঈশ্বরত্ব গ্রহণ করে নিতে পারে না, সেজন্য ঐশ্বরিক স্বরূপ অসীম ও অপরিসীম। ঈশ্বর বিষয়ে এটাই সাধু গ্রেগরির ধর্মতত্ত্ব যা তিনি পুস্তকের তিনটে স্থানে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন, তথা: জ্বলন্ত ঝোপের ঐশদর্শন (২য় পুস্তক ২২-২৬ দ্রঃ); সিনাই পর্বতে ঐশবিধান প্রকাশ (১৬২-১৬৬ দ্রঃ); ও ঈশ্বরকে দেখবার জন্য মোশির আবেদন (২২১-২২২, ২৩১-২৩৯, ২৪৯-২৫৫ দ্রঃ)। সেই অনুসারে, 'আমি সেই আছি যিনি আছেন' (যাত্রা ৩:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ) ঈশ্বরের এই উক্তি দেখায়, ঈশ্বর সেই সত্যকার সত্ত্ব যাঁর উপর অস্তিত্বশীল সমস্ত বিছু নির্ভর করে। একমাত্র ঈশ্বর স্বনির্ভরশীল, এবং তাঁর এ স্বনির্ভরশীলতার অংশ হওয়ায় সৃষ্ট সমস্ত কিছু অস্তিত্বের অধিকারী হয় (২য় পুস্তক ২৩-২৪ দ্রঃ)। অসীম ঈশ্বর অদৃশ্যমান ও ধারণাতীত (১ম পুস্তক ৪৬ দ্রঃ)। যেহেতু ঈশ্বর মানবীয় সমস্ত ধারণা ও বর্ণনা অতিক্রম করেন, সেজন্য তিনি মানুষের কাছে অদর্শনীয় ও অজ্ঞেয় (১৬২-১৬৫; ২৩৪ ও পরবর্তী পদ দ্রঃ)। ঈশ্বর স্বরূপে অসীম, তিনি কোন সীমায় সীমাবদ্ধ নন (২৩৬-২৩৮ দ্রঃ)। ঈশ্বর বিষয়ে মানুষের আংশিক অভিজ্ঞতা তাঁর অবিরত অনুসরণ দ্বারা অর্জনীয়: 'ঈশ্বর যেখানে আমাদের চালনা করেন তাঁকে সেখানে অনুসরণ করা, সেটাই ঈশ্বরকে দেখা' (২৫২ দ্রঃ); আরও, 'ঈশ্বরকে দেখা বলতে তাঁকে বাসনা করায় কখনও তৃপ্ত না হওয়া বোঝায়' (২৩৯, ২৩৪ দ্রঃ)।

খ্রিষ্ট : খ্রিষ্টের মাংসধারণ, ধন্যা কুমারীর যিশুকে প্রসব, ও খ্রিষ্ট যে দু'টো স্বরূপের অধিকারী (তথা তিনি যে মানব ও ঐশ্বরিক স্বরূপের অধিকারী): এ তিনটে বিষয় সাধু গ্রেগরির খ্রিষ্টতত্ত্বকে চিহ্নিত করে। মোশির জীবন বৃত্তান্তে তিনি মাংসধারণের ছ'টা পূর্বচিহ্ন ব্যক্ত করেন:

১। সেই জ্বলন্ত ঝোপ (২য় পুস্তক ২০ ও পরবর্তী পদ দ্রঃ);

২। মোশির সেই লাঠি যা সাপে রূপান্তরিত (২য় পুস্তক ২৬-২৭, ৩১-৩৪ দ্রঃ);

৩। মোশির ডান হাতের পরিবর্তন (২য় পুস্তক ৩৬-৪০ দ্রঃ);

৪। মান্না (১৩৯ দ্রঃ);

৫। তাঁবু (১৭৪ দ্রঃ);

৬। পাথরফলক দু'টো (২১৬ দ্রঃ)।

এ ছ'টা পূর্বচিহ্ন দ্বারা সাধু গ্রেগরি এ তিনটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দিতে পারেন:

১। ধন্যা মারীয়ার চিরকালীন কুমারীত্ব (২য় পুস্তক ২১ দ্রঃ);

২। মানব উৎপত্তিহীন খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব ও মানবজন্ম (১৭৫ ও পরবর্তী পদ দ্রঃ);

৩। খ্রিষ্ট আমাদের খাতিরে পাপ হলেন ও আমাদের স্বরূপের পরিবর্তন ঘটালেন।

মাংসধারণ-রহস্যের পাশাপাশি সাধু গ্রেগরি ক্রুশের নানা পূর্বচিহ্নও প্রদর্শন করেন, যেমন: মিশর থেকে আঘাত সরাবার সময়ে প্রার্থনারত মোশি হাত বাড়ান (৭৮ দ্রঃ) ও আমালেকের সেনাদলের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের হয়ে প্রার্থনা করার সময়েও হাত বাড়ান (১৫০ ইত্যাদি পদ দ্রঃ); যে কাঠ তেতো জল মিষ্ট করে (১৩২ দ্রঃ) সেই কাঠও ক্রুশের পূর্বচিহ্ন; কাঠের বহনদণ্ডে ঝোলানো আঙুরগুচ্ছ (২৬৭ দ্রঃ) ও উত্তোলিত সেই ব্রঞ্জের সাপও ক্রুশের পূর্বচিহ্ন।

পবিত্র আত্মা: মাংসধারণ-রহস্য পবিত্র আত্মার প্রভাবে হয় (২১৬ দ্রঃ); ঐশঅনুগ্রহ পবিত্র আত্মা দ্বারাই এখনও আমাদের মধ্যে পুষ্পিত হয় (১৮৭ দ্রঃ); যে মেঘ প্রান্তরে ইস্রায়েলীয়দের চালনা করত, তিনি সেই মেঘও পবিত্র আত্মা বলে ব্যাখ্যা করেন (১২১ দ্রঃ); ও তাঁবুতে যে প্রদীপগুলো রয়েছে, সেগুলো পবিত্র আত্মার রশ্মি বলে ব্যাখ্যা করেন (১৮১ দ্রঃ)।

স্বর্গদূতগণ: ঈশ্বর মানবজাতির সহায়তা ও সুমন্ত্রণা দানের দায়িত্ব স্বর্গদূতদের হাতে ন্যস্ত করেন; সেজন্য অনিষ্টের বিরুদ্ধে ধার্মিকদের সংগ্রামে স্বর্গদূতগণ সহায়তা করেন (৫১, ৪৫ দ্রঃ)। মানুষের প্রাণের স্বরূপের মত তাঁদের স্বরূপও অশরীরী ও আত্মিক (১৫১ দ্রঃ); এবং স্বর্গদূতদের নানা শ্রেণি তাঁবু বিষয়ক ব্যাখ্যায় নির্দেশিত (১৭৯ দ্রঃ)।

মানুষ ও মানুষের প্রাণ: 'মানব স্বরূপ আদিতে ছিল অভঙ্গুর ও অমর' (২১৫ দ্রঃ); কিন্তু এই মানব স্বরূপ পাপে পতিত হল (২য় পুস্তক ৪৫ দ্রঃ)। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি মানুষের অবাধ্যতার সময়ে মরা ও পার্থিব চামড়ার একটা আবরণ প্রাণকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল (২য় পুস্তক ২২ দ্রঃ), সেজন্যই মানবজাতি এখন মরণশীলতা ও ভাবাবেগ-

দুর্মতি দ্বারা চিহ্নিত। তাই নিচের দিকে ধাক্কা পেয়ে দেহ নিচের দিকে ছুটতে থাকে, কিন্তু হালকা ও ঊর্ধ্বগামী প্রাণ ভাবাবেগ-দুর্মতি দ্বারা বিঘ্নিত না হলে ঈশ্বর অভিমুখে উড়তে থাকে (২২৪ ও পরবর্তী পদ দ্রঃ)।

সেকালের ধারণা অনুসারে, মানুষের প্রাণ যুক্তিবিশিষ্ট, অভিলাষবিশিষ্ট ও রোষবিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত (৯৬, ১২৩ দ্রঃ)। তার অভিলাষবিশিষ্ট অংশ পার্থিব আমোদপ্রমোদে পূর্ণ হয়েও সর্বদা তৃপ্তিহীন। তাসত্ত্বেও প্রাণের নিম্নস্থিত অংশ দু'টো যে একেবারে খারাপ তা নয়, কেননা সেই অংশ দু'টোই প্রাণের যুক্তিবিশিষ্ট অংশকে চলার প্রেরণা দেয়। তবু প্রাণ যাতে নিয়মিত ভাবে সক্রিয় হতে পারে, সেজন্য দরকার আছে, যুক্তিবিশিষ্ট অংশটাই বাকি অংশ দু'টোকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, দিক-নির্দেশনা দেবে ও একতাবদ্ধ রাখবে। সাধু গ্রেগরির নৈতিক আবেদন স্পষ্ট: আত্মসংযম ও ভাবাবেগ-নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন; এক্ষেত্রে তিনি বলেন, 'মেষগুলোর মত আমাদের প্রাণের সমস্ত প্রেরণা যুক্তির ঊর্ধ্বতর ইচ্ছার অধীনে বশীভূত' করা দরকার (২য় পুস্তক ১৮ দ্রঃ)।

স্বাধীন বেছে নেওয়াটা ও ঈশ্বরের সহযোগিতা: 'মোশির জীবনীতে' মানুষের 'স্বাধীন বেছে নেওয়া' ধারণা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টা এধারণা দ্বারা শুরু হয় যা অনুসারে 'আমরা এক প্রকারে সবাই হলাম নিজেদেরই পিতা যারা যেভাবে ইচ্ছা করি ঠিক সেই স্বাধীন বেছে নেওয়াটা অনুসারেই নিজেদের জনিত করি' (২য় পুস্তক ৩ দ্রঃ)। আদমের পতনের পর থেকে প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের দূরদৃষ্টি দ্বারা নিযুক্ত একটা সহায়ক দূত ও মানুষের স্বরূপের সংহারক একটা অপদূতের মধ্যে স্থিত (২য় পুস্তক ৪৫ ইত্যাদি দ্রঃ)। এ প্রতিযোগী দু'টোর মধ্যে স্থিত হয়ে মানুষ বেছে নেয় সে কাকে অনুসরণ করবে, তাতে সে যার পক্ষে দাঁড়ায় তাকে বিজয়ী করে (২য় পুস্তক ১৪ দ্রঃ)। সাধু গ্রেগরি ফারাওর কঠিন হৃদয় সম্পর্কেও যথেষ্ট স্থান দেন (২য় পুস্তক ৭৩-৭৮): সে প্রসঙ্গে তিনি এটার উপর জোর দেন যে, ঈশ্বর থেকে সরে যাওয়ার সূচনা মানুষেরই সিদ্ধান্তের ফল; ঈশ্বর সকলকে একই প্রেরণা দান করেন, কিন্তু একটা মানুষ এক দিকে ও অন্য মানুষ অন্য দিকে ঝুঁকে পড়ে; সাধু গ্রেগরি বলেন, 'মানুষ এই আমরা সেই আলো ও সেই অন্ধকারের কারণসমূহ আমাদের অন্তরে, আমাদের স্বরূপে ও আমাদের স্বাধীন বেছে নেওয়াতেই রাখি, ও আমরা যে অবস্থা ইচ্ছা করি সেই অবস্থায়ই রয়েছি' (৮০ দ্রঃ)। তিনি আরও বলেন, 'যখন একই স্থানে একজন অমঙ্গলে আঘাতগ্রস্ত ও অন্য একজন আঘাতগ্রস্ত নয়, এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন বেছে নেওয়াটা এক একজনের অনুরূপ পার্থক্য

ব্যক্ত করে, তখন এটা স্পষ্ট হবে যে, আমরা নিজেরা অমঙ্গল বেছে না নিলে কোনও অমঙ্গল দেখা দিতে পারে না’ (৮৮ দ্রঃ)। তাতে অনুমান করা যেতে পারে, ঈশ্বরের কাজ সহযোগিতা বলে সম্পাদিত; এমন সহযোগিতা যা সেই প্রাণের সহায়তা করে যে প্রাণ সদ্‌গুণ অভিমুখে যাত্রায় পদার্পণ করেছে; যারা যোগ্য, পবিত্র আত্মা তাদেরই মঙ্গলের উদ্দেশে পথ দেখান (১২১ দ্রঃ), কেননা ‘যে কেউ সদ্‌গুণে অগ্রসর হয়, তার সঙ্গে সেই সাহায্যও যোগ দেয় যা ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতিকে দান করেন’ (২য় পুস্তক ৪৪ দ্রঃ)।

বাপ্তিস্ম: সেকালের প্রচলিত খ্রিষ্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে সাধু গ্রেগরি লোহিত সাগর-পার বাপ্তিস্মের পূর্বচিহ্ন হিসাবে দেখেন (১২৪-১২৯ দ্রঃ)। তাঁর মুক্তিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গত মিল রেখে তিনি বাপ্তিস্মকে প্রধানত অনিষ্টের শক্তির উপরে বিজয় বলে অনুধাবন করেন। যারা দাসত্বের অধীন, তারা সঙ্গে করে স্বৈরশাসককেও জলে টেনে নেয়। ‘পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্ম’ সমস্ত ভাবাবেগের মৃত্যু ঘটায়। সেই রহস্যাবৃত তথা সাক্রামেন্তীয় জল শত্রুর মৃত্যু ঘটায় ও ঈশ্বরের বন্ধুকে জীবন দান করে। সাধু গ্রেগরি এতে যথেষ্ট সচেতন যে, সেই জলে জাদু জাতীয় কোন রূপান্তর হয় না; তাঁর বক্তব্যের যথেষ্ট স্থান সেই অসঙ্গতিকে দেওয়া হয় যা অনুসারে, বাপ্তিস্মে পাওয়া মুক্তির পরেও ভাবাবেগের প্রতীক সেই মিশরীয় সেনাদলকে বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজনদের জীবনে চলতে দেওয়া হয়; অন্য স্থানে তিনি এ সাবধান বাণী শোনান যে, বাপ্তিস্মের পরেও ‘বাসনার কামড়’ প্রাণে কার্যকর থাকে (২৭৭ দ্রঃ)। যারা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান সম্পাদন করে, সাধু গ্রেগরি তাদের ‘প্রক্ষালনপাত্র’ বলে অভিহিত করেন, কারণ তারা ‘রহস্যাবৃত অর্থাৎ সাক্রামেন্তীয় জল দ্বারা পাপের কালিমা থেকে নিজেদের ধৌত করে’, ‘অনুগ্রহ-কর্ম অনুশীলন করে’, ও ‘ঐশ্বরিক দানের অংশী হয়’ (১৮৫ দ্রঃ)।

পুনঃপ্রতিষ্ঠা তথা সার্বিক পরিত্রাণ: সবকিছু যে একদিন ঈশ্বরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে, এধারণা পুস্তকে স্পষ্টভাবে উপস্থিত। সেই অনুসারে, মিশরের উপরে অন্ধকারের তিন দিন পরে যে আলো পুনরায় ফিরে আসে, তা ‘সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা’ বলে ব্যাখ্যা করা হয় ‘যা এসমস্ত কিছুর পরে সেই সকলের জন্য স্বর্গরাজ্যে প্রতীক্ষায় রয়েছে যারা জাহান্নামে দন্ডিত হয়েছে’ (৮২ দ্রঃ)। যারা নিজেদের জীবনধারণে মিশরীয়দের অনুকরণ করে, তাদের জন্য আগুনের দণ্ড বাস্তব (৮৩ দ্রঃ), কিন্তু তা চিরকালীন হবে না: মোশির দু’ হাত বাড়ানো বিষয়টা ‘কষ্টনিবারণ ও দণ্ডমুক্তি’ বোঝায় (২৮৪ দ্রঃ)। তবু মনে রাখা উচিত, পুনঃপ্রতিষ্ঠা-ধারণা উপস্থাপন করার আগে,

ধারণাটার গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে সাধু গ্রেগরি বলেন, 'হয় তো'; তাতে বোঝা যায়, তিনি নিজেও এবিষয়ে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করছিলেন। এতে সাধু গ্রেগরিও, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, তাঁর নিজের শিক্ষাগুরু সেই অরিগেনেসের মত নিগূঢ় বিষয় অনুসন্ধান করায় ভীত নন, কিন্তু যা অনিশ্চিত বিষয় তা অনিশ্চিত বলেই উপস্থাপন করেন; বাস্তবিকই পরবর্তী একটা মহাসভা পুনঃপ্রতিষ্ঠা-ধারণা অগ্রাহ্য করে।

ঐশশাস্ত্র: নিজের উপস্থাপিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলোকে শাস্ত্রীয় ভিত্তির উপরে স্থাপন করাই সাধু গ্রেগরির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কেবল 'মোশির জীবনীর' বর্ণনাই যে শাস্ত্রের বিবরণীতে ভিত্তি করে তা শুধু নয়, সেই জীবনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রায়ই শাস্ত্র-ভিত্তিক, এ এমন বিষয় যা বাইবেলের অসংখ্য উদ্ধৃতি প্রমাণ করে। মুখবন্ধে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, এবিষয়ে শাস্ত্রকে সুমন্ত্রণাদাতা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত' (১ম পুস্তক ১১ দ্রঃ); আরও, পুরাতন নিয়মের নবীগণ ও নূতন নিয়মের প্রেরিতদূতগণ হলেন পবিত্র আত্মার এমন যন্ত্র যা তুরির মত ঐশ্বরিক কণ্ঠ ধ্বনিত করে (১৫৯ দ্রঃ)। এক কথায়, যে পবিত্র আত্মা শাস্ত্রকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনিই যে সেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যায়ও পথদিশারী হবেন, তা যুক্তিসঙ্গত শুধু নয়, তা অত্যাবশ্যকও বটে; এর ফলে পবিত্র আত্মা যার হাতে শাস্ত্রকে ন্যস্ত করেছেন, সেই মণ্ডলী শাস্ত্রের সঙ্গে সেটার ব্যাখ্যাও আপন সন্তানদের হাতে সম্প্রদান করে থাকে, অর্থাৎ মণ্ডলী যা গ্রহণ করেছে সেই ঐশশাস্ত্রকে সম্প্রদান করে ও শিক্ষা দানকালে শাস্ত্রের পরম্পরাগত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে।

খ্রিষ্টমণ্ডলী: সাধু গ্রেগরি স্থানে স্থানে সেকালের মণ্ডলীর বিষয়েও আমাদের অবগত করেন। তিনি এমন সময়ে, ৪র্থ শতাব্দীতে, এপুস্তক লেখেন যখন মণ্ডলী প্রতিমাপূজার উপর জয়ী হয়েছিল ও বহুসংখ্যক মানুষ খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করে নিচ্ছিল (২য় পুস্তক ২০৩ দ্রঃ)। তবু তিনি জানেন, সেই নব বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষ অনেকেই বিশ্বস্ত হয়ে থাকেনি, নিজেদের জীবনে খ্রিষ্টীয় বৈশিষ্ট্যও বৃদ্ধি করেনি: 'যারা স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির আহ্বান গ্রহণ করে ও সেই বাণীকে আঁকড়িয়ে ধরে, তারা অনেকেই এখনও বিরোধীর দ্বারা প্রলোভনের আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন' (২য় পুস্তক ৫৬ ইত্যাদি পদ; ১২৫ ইত্যাদি পদ দ্রঃ)।

সেই ৪র্থ শতাব্দীতে যত ভ্রান্তমত মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, সাধু গ্রেগরি সেবিষয়েও নিজের চিন্তা প্রকাশ করেন (২য় পুস্তক ১৬, ১৬১, ২১৮ দ্রঃ): ভ্রান্তমতপন্থীরা যখন কোন দেশে কর্তৃত্ব চালায়, সেসময় যে যে খ্রিষ্টিয়ান পিছটান দেয়,

তাদের তেমন ব্যবহারের কারণগুলোর মধ্যে একটা হল, তারা মণ্ডলীতে প্রতীয়মান ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক অশেষ তর্কাতর্কি থেকে দূরে সরে যেতে চায়।

নিজে বিশপ হওয়ায় তিনি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও সেই অনুসারে নিজেকে 'তত সংখ্যক আত্মাদের পিতা' বলে দেখেন (১ম পুস্তক ২); তাঁর পূর্বসূরীদেরও তিনি 'পিতা' বলে অভিহিত করেন (২য় পুস্তক ১৩ দ্রঃ); এবং 'মণ্ডলীর বিধিনিয়ম ও প্রথা' দানে পুষ্টিকর খাদ্য যুগিয়ে দেওয়া নিজের কর্তব্য জ্ঞান করেন (২য় পুস্তক ১২ দ্রঃ)। এবং যে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন শাস্ত্রীয় শিক্ষা থাকে না, সেবিষয়ে 'পিতৃগণ থেকে আগত বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরাই' ধর্মতত্ত্বকে স্বীকৃতি দেয় (২য় পুস্তক ৪৫ দ্রঃ)।

সাধু গ্রেগরি সেই সমস্ত ভ্রান্তমতও উপস্থাপন করেন যা যাজকীয় (অর্থাৎ বিশপ সংক্রান্ত) ও প্রবীণ-সংক্রান্ত ভূমিকা চ্যালেঞ্জ করে। সবাই যে ঐশ্বরিক রহস্যগুলো তথা সাক্রামেন্তসমূহ, বিশেষভাবে এউখারিস্তিয়া-রহস্যকেই শেখার জন্য নিজেদের উদ্যোগে ছুটে আসবে তা হতে পারে না, বরং এমন ব্যক্তিকে বেছে নিতে হবে যারা ঐশ্বরিক বিষয়াদি শুনতে ও সেবিষয়ে শিক্ষা দিতে সুযোগ্য (১৬০ দ্রঃ)। মিদিয়ানে মোশির পলায়ন ও তারপরে মুক্তি-সংবাদ নিয়ে তাঁর ফিরে আসাটায় নিহিত শিক্ষা এ, 'জনগণের মধ্যে কথা বলার জন্য যে কেউ উপযোগী শিক্ষা দ্বারা নিজের কথা বলা ক্ষেত্রে নিজেকে প্রস্তুত করেনি, তার পক্ষে প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য হাজির হওয়া উচিত নয়' (২য় পুস্তক ৫৫ দ্রঃ)। সাধু গ্রেগরি বহুবার এমনটা দেখেন, স্বার্থপর ও উচ্চাভিলাষী মানুষ ঈশ্বরের সেবাকর্ম নিজেরাই নিজেদের উপর আরোপ করতে ইচ্ছা করে (২৭৯ দ্রঃ); এ ধরনের মানুষ আরামপূর্ণ ও সহজ জীবন অন্বেষণ করে: কিন্তু 'যাজকীয় ফল একরকম, এই ফল আর একরকম' (২৮৬ দ্রঃ)। এবিষয়ে তাঁর নানাবিধ উদাহরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, তেমন ব্যক্তিদের বিষয়ে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল (২৮৩ দ্রঃ)।

তিনি তাঁবু বিষয়টা (১৮৪-১৮৮ দ্রঃ) মণ্ডলীর কাঠামো সম্পর্কে কিছুটা বলার জন্যও ব্যবহার করেন। মণ্ডলীর স্তম্ভ হলেন সেই প্রেরিতদূত, শিক্ষাগুরু ও নবীরা যাঁরা মানুষের কাছে সুসমাচারের আলো বহন করেছেন। মণ্ডলীতে স্তুতি-যজ্ঞ ও প্রার্থনার ধূপ প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করা হয়; যারা বাপ্তিস্ম সম্পাদন করে তারা 'প্রক্ষালনপাত্র' বলে অভিহিত; যে কাপড়গুলো নিজেদের মধ্যে তাঁবুকে ঘিরে রাখে, সেগুলো হল ভালবাসায় ও শান্তিতে বিশ্বাসীদের মিলের প্রতীক। সন্ন্যাস-জীবন মণ্ডলীর বিশেষ ভূষণ বলে উল্লিখিত, এবিষয়ে সাধু গ্রেগরি বলেন, 'রক্তলাল রঙে রঞ্জিত যে চামড়া ও ছাগলোমের

যে কাপড় তাঁবুর অলঙ্কারে সহযোগিতা দান করে, সেগুলো এক একটা হল পাপী মাংসের মৃত্যুকরণ (রো ৮:৩ দ্রঃ) যার প্রতীক হল রক্তলাল চামড়া, ও সংযম অনুযায়ী কঠোর জীবনধারণ যা দ্বারা বিশেষভাবে মণ্ডলীর তাঁবুই ভূষিত করা হয়’।

মূল্যায়ন

সাধু বাসিল, তাঁর ছোট ভাই সাধু গ্রেগরি, ও উভয়ের বন্ধু নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরি : এ তিন ব্যক্তিত্ব মণ্ডলীতে ‘কাপ্পাদোকীয় পিতৃগণ’ বলে অভিহিত। সাধু বাসিল মণ্ডলীতে তাঁর পরিচালনা ও সংগঠনকারী ভূমিকার জন্য, ও নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরি উপদেশ দানে তাঁর অদ্বিতীয় নৈপুণ্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন ; কিন্তু নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন না ; তিনি নির্জন জীবন ও দর্শনশাস্ত্র ভালবাসতেন ও যখন বড় ভাই সাধু বাসিল তাঁকে বিশপ পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন, তখন আদর্শবান ভাইয়ের প্রতি বাধ্যতার খাতিরেই তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেন, কিন্তু তিনি কেমন যেন ভাইয়ের ছায়ায় জীবনযাপন করলেন। অথচ ভাইয়ের মৃত্যুতে তাঁর গুপ্ত গুণাবলি প্রকাশ পেল যদিও নির্জন জীবনধারণই হয়ে থাকল তাঁর মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর লেখাগুলো, বিশেষভাবে ‘সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ অর্থাৎ মোশির জীবনীই’ বিশেষ প্রশংসা অর্জন করল। তথাপি তাঁর সুখ্যাতি কেবল পূর্ব ইউরোপের অর্থোডক্স মণ্ডলীগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকল, কেননা অজানা কারণে লাতিন মণ্ডলীগুলোতে তাঁর লেখাগুলো এমনকি তাঁর নামও একেবারে অপরিচিত হয়ে থাকল। কেবল আনুমানিক ১৯৫০ সালেই হঠাৎ করে তাঁর নাম ও তাঁর লেখাগুলোর আধ্যাত্মিকতা, গভীরতা ও উৎকৃষ্টতা স্বীকৃতি লাভ করে, যার ফলে যিনি গতকাল পর্যন্ত সেই তিন মহাব্যক্তিত্বের মধ্যে নিম্ন বলে পরিগণিত ছিলেন, তাঁর বিষয়ে ধারণা আজ অন্য রকম : হ্যাঁ, তিনি নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ গ্রেগরির চেয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রে কম মার্জিত ছিলেন, বড় ভাইয়ের চেয়েও সংগঠনে কম কার্যকর ছিলেন, তাঁর গুরু সেই বিখ্যাত অরিগেনেসের চেয়েও কম লেখার লেখক ছিলেন, কিন্তু চিত্তের গভীরতা ক্ষেত্রে তাঁরা কেউই তাঁর সমকক্ষ হলেন না।

নিসার পবিত্রজনদের জন্য বিশপ

আমাদের পিতা গ্রেগরি-লিখিত

সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ

অর্থাৎ

মোশির জীবনী

সূচীপত্র

১ম পুস্তক

পরিচ্ছেদঃ ১ ১৬

মুখবন্ধ

১। ঘোড়দৌড়ের দর্শকদের এমনটা ঘটে যে, তারা যাদের পক্ষপাতী, সেই রথচালকেরা যদিও প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় দ্রুতগতিতে কম উদ্যোগী নয়, তথাপি সেই দর্শকেরা ঊর্ধ্ব থেকে সেই প্রতিযোগিতা চোখ দিয়ে আলিঙ্গন ক'রে জয়ী হবার বাসনায় চিৎকার দিয়ে চালকদের উৎসাহিত করে, এমনকি তারা মনে করে, ঘোড়াদের সঙ্গে নিজেরা পায়ে সামনে ঝুঁকে ও ঘোড়াদের দিকে চাবুকের বদলে নিজেদের বাড়ানো হাত ঝাঁকিয়ে তারা রথচালকদের আরও দ্রুতগতিতে দৌড়োতে উৎসাহিত করে; তাদের এ আচরণ যে বিজয়ের জন্য অবদান রাখবে এজন্য যে তারা এভাবে ব্যবহার করে তা নয়, কিন্তু এজন্যই সেইভাবে আচরণ করে কারণ প্রতিযোগীদের প্রতি গভীর আবেগ ও মনোযোগ দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা কথায় ও রঙ্গভূমিতেও নিজেদের সহযোগিতা ব্যক্ত করে। আমার বন্ধুদের ও ভাইদের মধ্যে হে আমার প্রিয়তম, তুমি যে সদ্‌গুণের ক্রীড়াঙ্গনে ঐশ দৌড়ে উত্তমরূপে নিবিষ্ট এবং ক্ষিপ্র ও হালকা পদক্ষেপে স্বর্গীয়

আহ্বানের পুরস্কার অভিমুখে ধাবিত, মনে হচ্ছে আমিও তেমন কিছু করছি যখন আমার কণ্ঠ দিয়ে তোমার পাশে পাশে চলি ও অধিক মনোযোগ সহকারে গতি বৃদ্ধি করার জন্য তোমাকে প্রেরণা দিই ও উৎসাহিত করি। আমি অবিবেচক আগ্রহ দ্বারা তাড়িত হয়েই যে তেমনটা করছি এমন নয়, কিন্তু প্রিয় সন্তানকে যা কিছু আনন্দ দিতে পারে, তা দান করার জন্যই আমি এভাবে ব্যবহার করছি।

২। কেননা, যেহেতু সম্প্রতিকালে আমার কাছে প্রেরিত পত্রে তুমি এমনটা প্রার্থনা কর যেন আমি সিদ্ধ জীবন সম্পর্কে কিছুটা পরামর্শ তোমার কাছে লিখে পাঠাই, সেজন্য আমি মনে করেছি, আমার কথা দিয়ে তোমার কাছে এমন কিছু উপস্থাপন করব না যা অন্য ক্ষেত্রে তোমার উপযোগী হতে পারবে, বরং এমন কিছু অর্পণ করব যা অবশ্যই তোমার পক্ষে বাধ্যতা ক্ষেত্রে অনর্থক আদর্শ বলে গণ্য হবে না। কেননা তত সংখ্যক আত্মাদের পিতা বলে নিযুক্ত এই আমি যদি তোমার সুবিবেচক যৌবনের আহ্বান গ্রহণ করা আমার এ বার্ধক্যের পক্ষে উচিত বলে বিশ্বাস করি, তাহলে এই যে ক্ষণে তোমার যৌবনকে আমা দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত বাধ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে অনুশীলন করানো হচ্ছে, সেই ক্ষণে এটাই আরও বেশি সমুচিত হবে যে, তোমার মধ্যে বাধ্যতার আজ্ঞা দৃঢ়ীকৃত করা হোক।

৩। কিন্তু এখন সেই সময় হয়েছে যে সময়ে বক্তব্যের দিশারী হিসাবে ঈশ্বরকে মনোনীত করে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পদার্পণ করি। হে প্রিয়তম, তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ, সিদ্ধ জীবন যে কি, আমি যেন তোমার কাছে তা বর্ণনা করি; অবশ্যই তোমার উদ্দেশ্যই, তুমি যা অনুসন্ধান করছ, আমার একথার সাহায্যে তা পাবার পর যেন আমার এ লেখার দ্বারা স্পষ্ট করা সেই উপকার তোমার নিজের জীবনে সার্থক করে তুলতে পার। কিন্তু উভয় লক্ষ্য পূরণ ক্ষেত্রে আমি নিজেকে অপদার্থ মনে করি, কেননা আমি স্বীকার করি, কথার মধ্য দিয়ে সিদ্ধতার সীমা নির্দেশ করা, এবং সেই কথা যা আমাদের বুঝিয়ে দেবে তা কেমন করে জীবনে বাস্তবায়িত করতে হয় তা প্রদর্শন করা, এ লক্ষ্য দু'টো আমার সাধ্যের ঊর্ধ্বে। এমনকি, হয় তো আমি শুধু নয়, কিন্তু যাঁরা সদ্‌গুণ (ক) অনুধাবনে উৎকৃষ্ট, সেই মহাপ্রাণদের মধ্যে অনেকেও এতে সম্মত হবেন যে, তেমন লক্ষ্য তাঁদের পক্ষেও নাগালের অতীত।

৪। কিন্তু, সামসঙ্গীতের ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে, যাতে এমনটা মনে না হয় যে, *‘যেখানে ভয় করার কিছু নেই আমি সেখানে ভয় করি’* [ক], সেজন্য আমি যা বলতে চাই তা তোমার কাছে আরও স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করব।

৫। ইন্দ্রিয়যোগ্য যা কিছু রয়েছে, সেই সমস্ত কিছু ক্ষেত্রে সিদ্ধতা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় সীমাবদ্ধ [ক], যেমনটা ধারাবাহিক ও অধারাবাহিক পরিমাণ ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। কেননা পরিমাণ ক্ষেত্রে যা কিছু পরিমেয়, তা তার কতগুলো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় ধারণকৃত, এবং যে কেউ এক হাত পরিমাণ বা দশ সংখ্যা লক্ষ করে, সে এটা জানে যে, সেই দু’টোর পক্ষে একটা সূচনা ও একটা সমাপ্তির অধিকারী হওয়াই সেই দু’টোর সিদ্ধতা। অন্যদিকে, সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে আমরা প্রেরিতদূতের কাছ থেকে এটা শিখেছি যে, সিদ্ধতার পক্ষে একমাত্র সীমা হল সীমাহীন হওয়া। কেননা চিন্তা-ভাবনায় মহান ও গভীর সেই ঐশ্বরিক প্রেরিতদূত [খ] সদ্‌গুণের লক্ষ্যে অনুক্ষণ দৌড়োতে দৌড়োতে আরও বেশি সামনের দিকে ছুটে দৌড়োনোতে কখনও ক্ষান্ত হননি; সেই দৌড়ে থামা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনকই হত। কেন? কারণ যেকোন মঙ্গল স্বরূপে সীমাহীন, এবং তার সীমাবদ্ধতা কেবল তার বিপরীতের উপস্থিতেই সীমাবদ্ধ যেইভাবে জীবন মৃত্যু দ্বারা ও আলো অন্ধকার দ্বারা, এবং, সাধারণ ক্ষেত্রে, যা কিছু মঙ্গলকর তা যা মঙ্গলের বিপরীত বলে গণ্য, তা সেটা দ্বারাই সমাপ্ত হয়। তাই, যেমন জীবনের শেষ পরিণাম হল মৃত্যুর সূচনা, তেমনি সদ্‌গুণের লক্ষ্যে দৌড়ে থামাটা হল রিপুর জন্য দৌড়ের সূচনা।

৬। এজন্যই আমার বক্তব্য তখনই আদৌ লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল না যখন আমি বলেছিলাম যে, সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে সিদ্ধতার সীমা নির্দেশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কেননা আমরা দেখিয়েছি যে, যা কিছু সীমাবদ্ধ তা সদ্‌গুণ নয়।

যেমন আমি বলেছিলাম, যাঁরা সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন অনুধাবন করেন তাঁদের পক্ষেও সিদ্ধতার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি এবিষয়েও আমার বক্তব্য স্পষ্ট করব।

৭। যা সঠিক ও মূখ্য অর্থে মঙ্গল, যার স্বরূপ হল মঙ্গলময়তা তথা স্বয়ং ঈশ্বরত্ব, যা কিছু প্রকৃতিগত ভাবে মঙ্গলকর বলে পরিগণিত, এসমস্ত কিছুই হলেন সেই ঈশ্বরত্ব, ও ঈশ্বরত্ব সেইভাবেই অভিহিত। এবং যেহেতু আমরা দেখিয়েছি যে, রিপু ছাড়া সদ্‌গুণের অন্য সীমা নেই, ও এটাও দেখিয়েছি যে, যা ঈশ্বরত্বের বিপরীত তা ঈশ্বরত্ব গ্রহণ করে

নিতে পারেন না, সেজন্য আমরা এটা বুঝতে পারি যে, ঐশ্বরিক স্বরূপ অসীম ও অপরিসীম। অন্যদিকে, যে কেউ সত্যকার সদ্‌গুণ অন্বেষী, সে ঈশ্বরের অংশী ছাড়া অন্য কিছুর অংশী নয়: এজন্যই ঈশ্বর হলেন সিদ্ধ সদ্‌গুণ। অতএব, প্রকৃতিগত দিক দিয়ে যা মঙ্গল যারা তা জানে, যেহেতু তারা সেটার অংশী হতে বাসনা করে, এবং যেহেতু এই মঙ্গল কোন সীমা মানে না, সেজন্য এটাই আবশ্যক যে, যা অসীম সেদিকে ধাবিত হয়ে যে কেউ সেটার অংশী হতে চেষ্টা করে, তার বাসনাও কখনও বিরাম পেতে পারে না।

৮। সুতরাং, সিদ্ধতার নাগাল পাওয়া অসাধ্য, কেননা যেইভাবে বলা হয়েছে, সেই অনুসারে সিদ্ধতা কোন সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় ও সদ্‌গুণের একমাত্র সীমা হল অসীমতা। তাই যখন একজন নির্দিষ্ট সীমা খুঁজে পেতে পারে না, তখন সে কেমন করে নির্দিষ্ট সীমার নাগাল পেতে পারে?

৯। তথাপি, যেহেতু এই যুক্তি আমাদের দেখিয়েছে, আমরা যে লক্ষ্য অন্বেষণ করি তার নাগাল পেতে পারি না, সেজন্য যিনি বলেন '*সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হও যেমন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা সিদ্ধতা-প্রাপ্ত*' (ক), আমরা যে সেই প্রভুর আদেশ অবহেলা করব তা হতে পারে না। কেননা স্বরূপে যা মঙ্গল, যদিও আমরা তা সম্পূর্ণরূপে অর্জন করতে পারি না, তবু যারা বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের পক্ষে সেটার একটা অংশ মাত্রও অর্জন করা মহৎ লাভ (খ)।

১০। সুতরাং, যেটুকু সিদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব, সেটুকুর সম্পূর্ণরূপে অভাবী হয়ে না থেকে যাবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখাতে হবে, এমনকি, আমরা নিজেদের জন্য যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি সেই লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা অনুসারে যতখানি সিদ্ধতা অর্জন করতে পারি তা ততখানিই অর্জন করতে হবে। কেননা এমনটা হতে পারে যে, মঙ্গলের অংশভাগিতা অনুক্ষণ বৃদ্ধি করার ইচ্ছায় নিবিষ্ট থাকাতেই মানব স্বরূপের সিদ্ধতা প্রকাশ পায়।

১১। আমি মনে করি, এবিষয়ে শাস্ত্রকে সুমন্ত্রণাদাতা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। কেননা ইশাইয়ার নবীয় বাণী দ্বারা ঐশকণ্ঠ বলে, '*বিবেচনা করে দেখ তোমাদের পিতা আব্রাহাম ও তোমাদের প্রসব করেছিলেন যিনি, সেই সারার কথা*' (ক)। অবশ্যই, ঐশ্বরিক বাণী এই আহ্বান সেই সকলের প্রতি উচ্চারণ করে যারা সদ্‌গুণের বাইরে ভ্রান্তপথে চলে, যাতে করে, যারা সমুদ্রে বন্দরের দিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তারা যেমন কোন

উচ্চস্থানের উপরে ওঠা কোন একটা অগ্নি-সঙ্কেত বা কোন একটা পর্বতচূড়া দে'খে তাদের কাছে আবির্ভূত সেই চিহ্নের খাতিরে নিজেদের ভুল সংস্কার করে, তেমনি যারা হালবিহীন মন দ্বারা তাড়িত হয়ে জীবন-সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়, ঐশ্বরিক বাণী সেই আব্রাহাম ও সারার আদর্শের খাতিরে যেন ঐশইচ্ছার বন্দরের দিকে তাদের পুনরায় চালনা করে।

১২। কেননা, যেহেতু মানবজাতি নর-নারীতে বিভক্ত, ও সেই নর-নারীদের কাছে নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সদ্‌গুণ বা রিপু বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, সেজন্য ঐশকণ্ঠ নর-নারীদের কাছে সদ্‌গুণের উপযোগী আদর্শ দেখিয়েছে যেন তারা যা কিছু তাদের সংক্রান্ত তথা, নর আব্রাহামকে ও নারী সারাকে লক্ষ ক'রে সবাই সেই পরিচিত আদর্শের খাতিরে সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের দিকে চালিত হয়।

১৩। তাই, সেই অগ্নি-সঙ্কেতের ভূমিকা পূরণ করার জন্য ও প্রাণ জীবন-ঝড় দ্বারা আর আঘাতগ্রস্ত না হয়ে, ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের অবিরত তরঙ্গমালার কারণে রিপু-গহ্বরেও নৌকাডুবি না হয়ে সেই প্রাণের পক্ষে সদ্‌গুণের নিরাপদ বন্দরে গিয়ে পৌঁছোনো কেমন করে সম্ভব হয় তা দেখাবার জন্য, আমাদেরও পক্ষে সেই মানুষদের একজনেরও স্মৃতি যথেষ্ট যাঁরা জীবন আচরণের জন্য সুখ্যাত।

এবং এমনটা হতে পারে যে, সেই উৎকৃষ্ট মানুষদের জীবনধারণ এজন্যই মহৎ সূক্ষ্মতার সঙ্গে বর্ণিত, যাতে, যাঁরা পূর্বকালে উত্তম পরিণতি অর্জন করেছেন তাঁদের সকলকে অনুকরণ করার মাধ্যমে পরকালের মানুষদের জীবনও মঙ্গলের দিকে চালিত হয়।

১৪। হয় তো কেউ বলবে, তবে এখন কি? আব্রাহামের বিষয়ে যেমন বলা হয়, আমি যখন সেইমত কাল্দীয় নই, মোশির জীবনী যেমন বর্ণনা করে আমাকে যখন সেই মিশরীয়ের কন্যার দ্বারা লালন-পালন করাও হয়নি, ও সাধারণ ক্ষেত্রে, এদের সকলের মধ্যে যখন আমার এমন কিছুই নেই যা প্রাচীনকালের কোন একজনেরও সঙ্গে জীবনধারণের অনুরূপ, তখন এরা যেমন ব্যবহার করতেন, আমি কেমন করে তাঁদের একজনেরও মত ব্যবহার করতে পারি যখন এমন একজনেরও অনুকরণ করতে পারি না যিনি জীবনধারণ ক্ষেত্রে আমা থেকে অতখানি দূরে?

তেমন মানুষের কাছে আমাদের উত্তর এ, সেই কাল্দীয় হওয়াটা আমরা সদ্গুণও বলে গণ্য করি না, রিপুও নয়; আরও, একটা মানুষ মিশরে বাস করে বিধায় বা বাবিলনে অবস্থান করে বিধায় যে সদ্গুণ অনুযায়ী জীবন থেকে সরে যায় তাও নয়; এমনকি, যে যোগ্য, ঈশ্বর যে কেবল যুদেয়ায়ই তার কাছে সুপরিচিত তাও নয়, এবং আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী যে সিয়োন, তাও ঈশ্বরের আবাসগৃহ নয় (ক)। কিন্তু কোন্ কাল্দীয় বা মিশরীয় থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে, এবং সুখী জীবনে গিয়ে পৌঁছোবার জন্য কোন্ বাবিলনীয় বন্দিদশা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে, তা বিচার-বিবেচনা করার জন্য আমাদের আরও সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যা ও তীক্ষ্ণতম দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

১৫। এজন্যই আমরা আমাদের আলোচনায় মোশিকে জীবনের আদর্শ বলে উপস্থাপন করছি। প্রথমে আমরা দ্রুতভাবে তাঁর জীবন সেইভাবে বর্ণনা করব যেভাবে ঐশশাস্ত্র থেকে শিখেছি, এবং এইভাবে আক্ষরিক অর্থের অনুরূপ আত্মিক অর্থ অনুসন্ধান করতে পারব যাতে সদ্গুণ বিষয়ক উপযোগী শিক্ষা অর্জন করতে পারি ও সেই সিদ্ধ জীবন জানতে পারি যা মানুষদের মধ্যে যাপন করা উচিত।

মোশির জীবন বৃত্তান্ত (যাত্রা ১:১৬ দ্রঃ)

১৬। কথিত আছে, যখন স্বৈরশাসকের বিধান নবজাত ছেলেদের বাঁচিয়ে রাখতে নিষেধ করছিল, সেসময়েই মোশি জন্মগ্রহণ করলেন, ও নিজের সৌন্দর্যে তিনি সেই অন্যান্য গুণাবলির পূর্বলক্ষণ দিলেন যা সময়মত যুক্ত হবে। কাঁথায় জড়ানো শিশুকে এত সুন্দর দেখে পিতামাতা তাঁকে হত্যা করতে ঘৃণাবোধ করলেন।

[যাত্রা ২:১-৯ দ্রঃ]

১৭। পরে, যখন সেই স্বৈরশাসকের হুমকি আরও বেশি চাপ দিতে লাগল, তখন, মোশির বিষয়ে যাঁরা আমাদের কাছে সূক্ষ্মরূপে খবর দেন সেই লেখকগণ যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন, সেই অনুসারে তাঁর পিতামাতা তাঁকে নীল নদের জলস্রোতে নির্দ্বিধায় ফেলে না দিয়ে বরং তাঁকে গায়ে মেটে তেল ও আলকাত্রায় মাখা একটা ঝাঁপিতে রেখে সেইভাবে জলস্রোতের হাতে তুলে দিলেন। ঐশ্বরিক এক পরাক্রম দ্বারা চালিত হয়ে ঝাঁপিটা জলের গতিবিধি দ্বারা আপনা আপনিই এমন মাটির উঁচু ঢিপির দিকে চালিত

হয়ে স্রোতের আড়াআড়ি ভাবে স্থিত সেই ঢিপির গায়ে গিয়ে থামল। ঝাঁপিটা যেখানে মাটিতে বসে গেছিল, রাজার কন্যা নদীকূলের সেই মাঠে গিয়ে পৌঁছে ঝাঁপিতে চিৎকার করা শিশুকে খুঁজে পেলেন, ও এমনটা দেখে যে, শিশুকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁর প্রতি স্নেহে অনুরক্তা হয়ে তাঁকে নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করলেন। এবং যেহেতু শিশুটি সহজাত স্বভাবের কারণে সেই বিদেশী স্তন অগ্রাহ্য করছিলেন, সেজন্য তাঁর পরিবারের একজনের বিচক্ষণতার খাতিরে তাঁকে মাতৃস্তনের দুধ খাওয়ানো হল।

১৮। পরে, রাজার কাছে লালিত-পালিত হওয়ার পর ও পৌত্তলিকদের কাছে মহৎ মর্যাদার বিষয় সেই জাগতিক বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর (ক) বাল্যকাল ছেড়ে তিনি, যিনি তাঁর নিজের মা বলে গণ্য ছিলেন ও তাঁকে নিজের ছেলে বলে গ্রহণ করেছিলেন তাঁকে আর স্বীকার না করে বরং যিনি তাঁর প্রকৃত মা ছিলেন তাঁরই কাছে ফিরে যাওয়া ও তাঁর গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে জীবনযাপন করা বেছে নিলেন।

একজন হিব্রু ও একজন মিশরীয়ের মধ্যে মারামারি দেখা দিলে মোশি স্বদেশীর সাহায্যে এসে বিদেশীকে হত্যা করলেন (খ); তারপর, দু'জন হিব্রুর মধ্যে হাতাহাতি হলে তিনি এটাই বলে যে, ঝগড়ার সময়ে ভাইদের পক্ষে রোষ নয় স্বভাবই সালিশ হিসাবে বেছে নেওয়া উচিত, তিনি সেই দু'জনের বিরোধিতা শেষ করে দিতে চেষ্টা করলেন।

[যাত্রা ২:১৬-২১ দ্রঃ]

১৯। যে দোষী ছিল তার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে মোশি এ অপমানকে উচ্চতর তত্ত্ববিদ্যায় নিজেকে নিবিষ্ট করার সুযোগ করলেন, এবং লোকদের সংসর্গ থেকে সরে গিয়ে বাকি জীবন একাকীত্বে অতিবাহিত করলেন ও একজন বিদেশীর সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এ বিদেশী এমন মানুষ ছিলেন যিনি যা উত্তম তা খুঁজে বের করতে বিচক্ষণ ও মানুষদের রীতিনীতি ও জীবনধারণ বিষয়ে অধিক বিজ্ঞ ছিলেন। এনার পক্ষে একটামাত্র ঘটনাই যথেষ্ট হল (আমি রাখালদের বিরুদ্ধে সেই আক্রমণের কথাই বলছি) আর তিনি সাথে সাথেই যুবকটির সদ্‌গুণ অনুমান করলেন, কেমন যেন যুবকটি নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে ন্যায্যতার পক্ষে লড়াই করেছিলেন ও ন্যায্যতাকে মূল্যবান গুণ বলে বিচার ক'রে সেই রাখালদের কুকর্মকে শাস্তি দিয়েছিলেন যারা

প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন ক্ষতি করেনি; তাই সেই বিদেশী লোক যুবকের প্রতি বিস্ময়মগ্ন হয়ে, ও যিনি বাহ্যত দীনহীন ছিলেন তাঁর সদ্‌গুণ মহৎ ঐশ্বর্যের চেয়ে মূল্যবান জ্ঞান ক'রে তাঁকে স্ত্রীরূপে তাঁর নিজের মেয়েকে বিবাহ দিলেন ও তাঁকে যেমন খুশি তেমন জীবন যাপন করতে দিলেন। মোশি পর্বতমালার মধ্যে একাকী জীবন বেছে নিলেন, এমন জীবন যা শহরের কোলাহল থেকে দূরবর্তী ও মরুপ্রান্তরে পশুপাল পালনে নিবিষ্ট।

[যাত্রা ৩:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

২০। বিবরণী এটা বলে যে, তেমন জীবনধারণে বিশিষ্ট এক কাল অতিবাহিত করার পর মোশির আশ্চর্যময় একটা ঐশদর্শন হল। ঠিক মধ্যাহ্নেই সূর্যের আলোর চেয়ে তীব্রতম অন্য একটা আলো তাঁর চোখের সামনে ঝলকিয়ে উঠল এবং তেমন অস্বাভাবিক দৃশ্যের জন্য স্তম্ভিত হয়ে তিনি পর্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করে এমন ঝোপ দেখলেন যা থেকে আগুনের মত আলো উৎসারিত হচ্ছে, এবং ইতিমধ্যে শাখাগুলো সেই আগুন দ্বারা শিশির দ্বারাই যেন ইন্ধন পেয়ে বেড়ে উঠছে, যার জন্য তিনি মনে মনে বললেন, 'আমি এই অসাধারণ দৃশ্য দেখতে যাব'। তিনি তখনও কথা বলছেন এমন সময় সেই আলোর বিস্ময়কর ব্যাপার কেবল চোখ দিয়ে গ্রহণ করে নিলেন শুধু নয়, কিন্তু —এটাই সবকিছুর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার—তাঁর শ্রবণশক্তিও সেই আলো দ্বারা আলোকিত হল। কেননা আলোর উপকার ইন্দ্রিয় দু'টোর মধ্যে ভাগ ভাগ হয়ে রশ্মিমালার উজ্জ্বলতা দ্বারা চোখ চমকাচ্ছিল ও সেইসঙ্গে শুচিতম আদেশমালা দানে রহস্যময় ঝলক দ্বারা কান আলোকিত করছিল। সেই আলো থেকে যে কণ্ঠস্বর নির্গত হচ্ছিল তা মোশিকে আজ্ঞা দিল তিনি মরা চামড়ার জুতোতে ভারী হয়ে যেন পর্বতের দিকে এগিয়ে না যান, কিন্তু জুতো থেকে পা মুক্ত করে তিনি যেন সেই অবস্থায়ই ততখানি মাটি স্পর্শ করেন যতখানি মাটি সেই আলোতে আলোকিত ছিল।

[যাত্রা ৩:১৬–৪:৭ দ্রঃ]

২১। এসমস্ত কিছুর পরে (কেননা আমার বিশ্বাস যে, বক্তব্যটার মানুষের ঘটনাদি বিবরণীতে বেশিক্ষণ ইতিস্তত করবার নয় যাতে করে আমরা আমাদের সঙ্কল্প রক্ষা করতে পারি) মোশি তাঁর পাওয়া ঐশদর্শন দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়ে মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে

নিজের গোষ্ঠীকে মুক্ত করে দেবার আদেশ পান। এবং তিনি যেন ঈশ্বর থেকে আগত সেই শক্তি বিষয়ে সমুচিত ভাবে সচেতন হন, সেজন্য, তাঁর হাতে যা কিছু ছিল, ঐশ্বরিক ব্যবস্থা ক্রমে তা দিয়ে সেই শক্তির অভিজ্ঞতা করেন। পরীক্ষা এটা, হাত দ্বারা মাটিতে ফেলানো লাঠি প্রাণবন্ত হয়ে একটা পশু, একটা নাগদানবই হয়; আরও, হাত দিয়ে উচ্চতে তোলা হলে নাগদানবটা পশু হবার আগে যা ছিল তা পুনরায় হয়ে যায়। পরে, বুকে দেওয়া হাত তুষারের মত সাদা হয়, ও একই অঙ্গভঙ্গি করার পর পুনরায় তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়।

[যাত্রা ৪:১৮-২৭ দ্রঃ]

২২। পরে, যখন মোশি বিদেশী স্ত্রীকে ও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সন্তানদের সঙ্গে করে মিশরের দিকে নেমে যাচ্ছিলেন, তখন এটা বলা হয় যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এমন দূতও এগিয়ে এলেন যিনি তাঁর অন্তরে মৃত্যু-আশঙ্কা সঞ্চার করলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটি পুত্রের পরিচ্ছেদনের রক্ত দিয়ে সেই দূতকে প্রশমিত করলেন। ঠিক তখনই মোশি আরোনের দেখা পেলেন, তিনিও সেই সাক্ষাতের জন্য ঐশইচ্ছা দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিলেন।

[যাত্রা ৫:১-২৩ দ্রঃ]

২৩। তাঁরা দু'জনে সাধারণ সভায় জনগণকে সম্মিলিত ক'রে, যারা মেহনতি কাজের দুরবস্থায় অত্যাচারিত ছিল তাদের কাছে দাসত্ব থেকে মুক্তির সংবাদ দিলেন। এবিষয়ে স্বয়ং স্বৈরশাসকের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা হল, এবং ঠিক এই কারণেই স্বৈরশাসক মেহনতি কাজে নিযুক্ত সকল সরদারদের উপর ক্রুদ্ধ হল, এমনকি সে খোদ ইস্রায়েলীয়দের উপরেও আগের চেয়ে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হল, তাতে দেয় ইটের সংখ্যা বেড়ে গেল ও আরও বেশি ভারী আজ্ঞা দেওয়া হল যার ফলে ইস্রায়েলীয়েরা মাটির জন্য কষ্ট পাচ্ছিল শুধু নয়, কিন্তু খড়কুটো ও নলখাগড়ার জন্যও জর্জরিত হল।

[যাত্রা ৭:১০-১৩ দ্রঃ]

২৪। মোশি ও আরোন যে ঐশ্বরিক বিস্ময়কর কাজ সাধন করছিলেন, যেহেতু ফারাও (এটাই ছিল মিশরীয়দের সেই স্বৈরশাসকের নাম) সেই বিস্ময়কর কাজের বিরুদ্ধে নিজের মন্ত্রজালিকদের জাদু উপস্থাপন করতে চেষ্টা করছিল, সেজন্য যখন

মোশি মিশরীয়দের চোখের সামনে নিজের লাঠি পুনরায় পশুতে পরিণত করলেন, তখন মনে হয়েছিল, মন্ত্রজালিকদের লাঠিগুলোতে স্থিত জাদু একই বিস্ময়কর কাজ সাধন করছিল। কিন্তু চালাকিটা তাদের কর্মের পরিণতিতে প্রকাশিত হল, কেননা মোশির লাঠির রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন নাগদানব মন্ত্রজালিকদের লাঠিগুলো অর্থাৎ নাগদানবগুলোকে গ্রাস করে এটা দেখাল যে, সেই লাঠিগুলো রক্ষাকারী ও জীবনময় কোনও ক্ষমতার অধিকারী ছিল না, সেগুলো কেবল নাগদানবের বাহ্যিক চেহারারই অধিকারী ছিল, সেই যে চেহারা জাদুবলে তাদেরই চোখে দেখানো হয়েছিল যারা খুব সহজে প্রবঞ্চিত হয়েছিল।

২৫। যখন মোশি দেখেন, সকল প্রজা অপকর্মের প্রধানের মত একই চিন্তা-ভাবনা করছে, তখন অনিষ্টের অভিজ্ঞতা থেকে কাউকেই রেহাই না দিয়ে তিনি গোটা মিশরীয় জনগণের বিরুদ্ধে সার্বিক আঘাতের উদ্ভব ঘটান। এবং মিশরীয়দের উপরে এই আঘাত হানবার জন্য তাঁর সঙ্গে বাধ্য সৈন্যরূপে সেই সমস্ত উপাদানও যোগ দিল [ক] যা আমরা বিশ্বে দেখতে পাই তথা মাটি, আগুন, হাওয়া ও জল, এবং এগুলো মানুষদের ইচ্ছাক্রমে নিজ নিজ কার্যক্ষমতা পরিবর্তন করল; কেননা যে দোষী, সে একই সময়ে ও একই স্থানে একই শক্তি দ্বারা শাস্তি পাচ্ছিল, ও যা কিছু অনিষ্ট থেকে মুক্ত ছিল তা অক্ষত হয়ে থাকছিল।

[যাত্রা ৭:২০-২২ দ্রঃ]

২৬। তখন মোশির আদেশ ক্রমে মিশরে যত প্রকার জল রক্তে রূপান্তরিত হল, যার ফলে মাছও রূপান্তরিত সেই জলের মাংসময় ঘনতায় মারা গেল, কিন্তু যে হিব্রুরা জল তুলত, তাদের জন্য রক্ত ছিল জল। এর ফলে, হিব্রুদের কাছে যে জল পাওয়া যেত, মন্ত্রজালিকদের জাদুও সেই জলে রক্তের বাহ্যিক চেহারা কৃত্রিম ভাবে দেখাবার সুযোগ পেল।

[যাত্রা ৭:২৬ ইত্যাদি দ্রঃ]

২৭। একই প্রকারে এমন অসংখ্য বেঙ মিশরকে দখল করল যেগুলোর জন্মবিস্তার খুবই বহুসংখ্যক হল, কিন্তু তা যে প্রাকৃতিক ঘটনার ফল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারত তা নয়, কিন্তু তেমনটা ঘটেছিল কারণ বেঙ-প্রজাতিকে যে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, সেই

আজ্ঞা জন্তুর সেই প্রকৃতির পরিবর্তন করল যা সেসময় মনে হচ্ছিল বেঙের আসল প্রকৃতি। গোটা মিশর এ জন্তুগুলো দ্বারা বিনষ্ট হল, এমনকি বেঙগুলো মানুষদের ঘরেও অসুবিধা সৃষ্টি করছিল, কিন্তু হিব্রুদের জীবনধারণ এ দুর্বিপাক থেকে অক্ষত থেকে গেল।

[যাত্রা ১০:২১-২৩; ১১:১–১২:৩০ দ্রঃ]

২৮। তেমনি ভাবে, মিশরীয়দের জন্য হাওয়া দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও ব্যবধান মানল না, এতে মিশরীয়েরা একরূপ অন্ধকারে রইল, কিন্তু হিব্রুদের জন্য এই পরিস্থিতিতে সাধারণ নিয়মের কোনও কিছুরই পরিবর্তন হল না। এবং বাকি যত অসাধারণ ঘটনা একই ভাবে ঘটল তথা শিলাবৃষ্টি, আগুন, ফোড়া, মশা, ডাঁশ, পঙ্গপাল-মেঘ: এগুলো যে যার প্রকৃতি অনুসারে মিশরীয়দের ক্ষতি করল, কিন্তু হিব্রুরা এসমস্ত দুর্বিপাকের কোনও ক্ষত ভোগ না করে খবরাখবর ও বর্ণনা দ্বারা তাদের প্রতিবাশীদের দুর্ভাগ্যের কথা অবগত হত। তারপর প্রথমজাতদের মৃত্যু হিব্রুদের ও মিশরীয়দের মধ্যকার ব্যবধান আরও স্পষ্ট করে তুলল, কেননা এদের যা কিছু ছিল অধিক প্রিয়তম, সেই প্রথমজাতদের মৃত্যুর জন্য তারা অঝোরে চোখের জল ফেলছিল, কিন্তু হিব্রুরা সমস্ত শান্তশিষ্টতা ও নিরাপত্তায় রইল, কারণ তারা প্রতিটি দরজার দুই বাজু ও সেটার কপালি রক্ত দিয়ে চিহ্নিত করেছিল বিধায় তাদের জন্য পরিত্রাণ রক্তসিঞ্চন দ্বারা নিশ্চিত হল।

[যাত্রা ১২:৩১–১৪:৫ দ্রঃ]

২৯। এসমস্ত ঘটনার পর, মিশরীয়েরা প্রথমজাতদের মৃত্যুর জন্য অবসন্ন হতে হতে ও প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে ও সবাই মিলিত ভাবে যে যার দুর্ভাগ্যের জন্য চোখের জল ফেলতে ফেলতে মোশি, মিশরীয়দের ধনসম্পদ অগ্রিম হিসাবে সঙ্গে করে নিতে আগে থেকে ইস্রায়েলীয়দের এমনটা বলার পর, পথদিশারী হিসাবে তাদের প্রস্থান-যাত্রা চালনা করলেন, এবং (এবারও সেই বিবরণী অনুসারে) মিশর থেকে তিন দিন যাত্রাপথের পর, ইস্রায়েল যে মিশরে দাসত্বে থেকে যায়নি এবিষয়ে মিশর রাজ অনুশোচনা করলেন, তাঁর সমস্ত প্রজাকে যুদ্ধসজ্জিত করলেন ও ইতস্তত না করে অশ্বারোহীদের নিয়ে হিব্রু জনগণের পিছনে ধাওয়া করতে লাগলেন। সেই অশ্বগুলো ও অস্ত্রশস্ত্রের তেমন ব্যবস্থা

দেখা মাত্র, যুদ্ধ-সংগ্রামে অবিজ্ঞ ও তেমন দৃশ্যে অভ্যস্ত নয় সেই হিব্রুরা ভয়ে অভিভূত হয়ে মোশির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। এই পর্যায়ে বিবরণী মোশির বিষয়ে সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনা উপস্থাপন করে, কেননা তাঁর কর্মকাণ্ড দ্বিবিধ হল, অর্থাৎ তিনি কণ্ঠ ও বাণী দ্বারা ইস্রায়েলীয়দের উৎসাহিত করছিলেন ও উচ্চ প্রত্যাশা রাখতে প্রেরণা দিচ্ছিলেন, এবং মনে মনে ঈশ্বরের কাছে সেই হতভাগাদের জন্য সহায়তা প্রার্থনা করছিলেন ও কেমন করে সেই বিপদ এড়ানো যাওয়া যাবে সেবিষয়ে ঐশমন্ত্রণা দ্বারা প্রশিক্ষিত হচ্ছিলেন, কারণ, বিবরণী অনুসারে, ঈশ্বর নিজেই তাঁর নীরব কণ্ঠে কর্ণপাত করছিলেন।

[যাত্রা ১৫:২১-২২ দ্রঃ]

৩০। ঐশ্বরিক পরাক্রম দ্বারা একটা মেঘ সাধারণ প্রকৃতি অনুসারে কাজ না করে জনগণকে পথ দেখাচ্ছিল, কেননা মেঘটা বাষ্প ও ধুম্র দিয়ে গঠিত ছিল না, কারণ হাওয়া বাষ্পের কারণে ঘনীভূত হয় ও আর্দ্রতা বাতাসের কারণে সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু সেই মেঘের অলৌকিক ব্যাপার এমনটা ছিল যা মানব ধীশক্তির চেয়ে এতই মহৎ ও উৎকৃষ্ট যে, মেঘটা জনগণকে সূর্যের উষ্ণ রশ্মির দীপ্তি থেকে রক্ষা করে তার নিচে যা কিছু ছিল তার জন্য ছায়া দিচ্ছিল ও চিক্কণ শিশিরপাতে উত্তপ্ত হাওয়াকে আর্দ্রসিক্ত করছিল—এবিষয়ে শাস্ত্রই সাক্ষী। এমনকি রাত্রিবেলায় মেঘটা সন্ধ্যা থেকে প্রভাত পর্যন্ত আগুন হয়ে গিয়ে নিজের আলোতে ইস্রায়েলীয়দের আলো দান করছিল [ক]।

[যাত্রা ১৪:১৯-২২ দ্রঃ]

৩১। মোশি মেঘটা লক্ষ করতে করতে ও জনগণকে সেই আবির্ভাব অনুসরণ করার জন্য শিক্ষা দিতে দিতে তারা লোহিত সাগরে গিয়ে পৌঁছোল; এবং সেখানে, যখন মেঘটা সাগর-পারের জন্য নির্দেশ দিচ্ছিল ও মিশরীয়দের সেনাদল জনগণকে পশ্চাদ্ভাগে এমনভাবে ঘিরে রাখছিল যার ফলে, শত্রুরা শত্রুদের ও জলের মাঝখানে স্থিত লোকদের বিনাশ থেকে রেহাই দিচ্ছিল না, তখন ওই দেখ, ঐশ্বরিক পরাক্রমে প্রভাবান্বিত হয়ে মোশি সবচেয়ে বিস্ময়কর কাজ সাধন করলেন: সাগর-তীরে এগিয়ে গিয়ে তিনি সাগরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন ও সাগর যেখানে আঘাতগ্রস্ত হয়েছিল ঠিক সেইখানে দু' ভাগ হল। এবং কাঁচ একদিকে ভাঙতে শুরু করলে যেমন ভাঙন

বিপরীত প্রান্ত পর্যন্ত সোজা লাইনে প্রসারিত হয়, তেমনি যখন সেই গোটা সাগর লাঠির আঘাতে এক প্রান্তে দু' ভাগ হল তখন ঢেউগুলোর বিভাজন বিপরীত তীর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোল। এবং সাগর যেখানে দু' ভাগ হয়েছিল মোশি সেখানে নেমে গিয়ে সেই নিম্নস্থলে সূর্যের দ্বারা শুকনো ও আলোকিত দেহে সাগরের শুকনো তলদেশে সেই গহ্বর বেয়ে পায়ে হেঁটে চললেন এবং সেই এক প্রকার দেওয়াল বিষয়ে ভয় পাচ্ছিলেন না যা ঢেউ হঠাৎ করে দু' পাশে গঠন করেছিল, কেননা জল দুই পাশে ঘনীভূত হয়েছিল।

[যাত্রা ১৪:২৬–১৫:২১ দ্রঃ]

৩২। কিন্তু যখন ফারাও মিশরীয়দের সহ সবেমাত্র ঢেউতে টানা সেই পথ দিয়ে সাগরে ছুটে গেল, তখনই জল পুনরায় জলের সঙ্গে মিলিত হল এবং সাগর আগের অবস্থা-মত নিজের উপর দিয়ে পুনরায় প্রবাহিত হতে হতে জলের বাহ্যিক চেহারা ও দৃশ্য এক হল কিন্তু বিপরীত তীরে ইতিমধ্যে ইস্রায়েলীয়েরা শ্রম থেকে ও সাগর পারের মানসিক চাপ থেকে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সেই উপলক্ষে তারা সেই ঈশ্বরের উদ্দেশে জয়গীতি জাগিয়ে তুলল যিনি রক্তপাত ছাড়া তাদের জন্য এক জয়চিহ্ন উত্তোলন করেছিলেন, কারণ মিশরীয়দের গোটা সেনাবাহিনী, অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র ও রথ সহ জল দ্বারা নিমজ্জিত হয়েছিল।

[যাত্রা ১৫:২২-২৫ দ্রঃ]

৩৩। তারপর মোশি এগিয়ে যান, ও তিন দিন ধরে জলহীন পথ চলার পর অসুবিধায় পড়েন, কারণ সেনাদলের পিপাসা মেটাবার জন্য তাঁর কিছুই ছিল না; কেননা যে জলাশয়ের কাছে তারা শিবির বসিয়েছিল, তা সামুদ্রিক জলেরই এমন জলাশয় ছিল যা সমুদ্রের জলের চেয়ে তেতোই ছিল। জলের ধারে স্থিত ইস্রায়েলীয়েরা জলের পিপাসায় দগ্ধ হচ্ছিল, এমন সময় মোশি ঈশ্বর থেকে আগত অনুপ্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেখানে পাওয়া এক টুকরো কাঠ জলের মধ্যে ফেলেন ও সেই টুকরো কাঠের খাতিরে জল হঠাৎ করে খাবার জল হয়, কেননা সেই কাঠ নিজের প্রতাপে জলের প্রকৃতি তেতো থেকে মিষ্টি জলে পরিণত করেছিল।

[যাত্রা ১৫:২৭ দ্রঃ]

৩৪। এবং যেহেতু মেঘ আগে আগে এগিয়ে চলছিল, সেজন্য তারাও সেই দিশারী মেঘের গতি অনুসরণ করে অন্য স্থানে গেল: তারা সবসময় সেই মত চলছিল, অর্থাৎ, মেঘ যেখানে থেমে বিশ্রামের জন্য সঙ্কেত দিচ্ছিল তারা সেখানে থামত, ও মেঘ যে দিকে তাদের যাত্রা পরিচালনা করতে শুরু করছিল, তারা পুনরায় সেদিকে এগিয়ে চলছিল।

পরে, তেমন দিশারী মেঘ অনুসরণ করতে করতে তারা খাবার জলসিঞ্চিত এমন জায়গায় এসে পৌঁছে যা বারোটা উৎস দ্বারা উৎসারিত জল দ্বারা প্রচুর জলে জলসিক্ত ও খেজুরগাছের বাগানের ছায়ায় আবৃত ছিল। খেজুরগাছগুলো সত্তরটা ছিল, ও অল্পসংখ্যক হলেও তবু দর্শকদের মধ্যে বিস্ময় জাগাবার জন্য যথেষ্টই ছিল, কেননা গাছগুলো গঠনে মহৎ ও দেখতে সুন্দর ছিল।

[যাত্রা ১৭:১-৬ দ্রঃ]

৩৫। তারা পুনরায় যাত্রা শুরু করলে সেই দিশারী মেঘ সেনাদলকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চালনা করে। এ এমন জনহীন স্থান ছিল যা শুকনো ও দগ্ধ বালুতে ভরা কেননা এক বিন্দু জলও মাটিকে আর্দ্রসিক্ত করছিল না; এবং সেখানে পিপাসা পুনরায় জনগণকে কষ্ট দিতে শুরু করল, কিন্তু একটা উচ্চস্থানে স্থিত একটা শৈল মোশি দ্বারা লাঠি দিয়ে আঘাতগ্রস্ত হলে মিষ্টি ও খাবার উপযুক্ত জল উৎসারিত করল, এমনকি এত পরিমাণ জল উৎসারিত করল যা তেমন বৃহৎ সেনাদলের দরকারের জন্য যথেষ্ট ছিল।

[যাত্রা ১৬:১৪ দ্রঃ]

৩৬। মিশর থেকে বের হওয়ার সময়ে ইস্রায়েলীয়েরা যাত্রার জন্য যে খাবার ব্যবস্থা করেছিল, সেই স্থানেই সেই খাবারের সর্বরাহও ফুরিয়ে গেল, এবং জনগণ ক্ষুধায় কষ্টভোগ করতে করতে যত বিস্ময়কর কাজের মধ্যে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর কাজ ঘটে, কেননা খাদ্য নিয়মত ভূমি থেকে নয়, শিশিরের মত স্বর্গ থেকেই নিচে প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই শিশির সকালবেলায় তাদের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল ও যারা তা জড় করত তাদের জন্য খাবার হয়ে যাচ্ছিল। কেননা যা নিচে পড়ছিল তা জলের ফোটা ছিল না যেভাবে সাধারণত শিশিরের বেলায় ঘটে, কিন্তু ফোটার বদলে এমন গুচ্ছই পড়ছিল যা

দেখতে ধনে বীজের মত গোলাকার বরফের সমতুল্য ও যার স্বাদ মধুর স্বাধের চেয়েও মিষ্ট ছিল।

[যাত্রা ১৬:১৬-২৪ দ্রঃ]

৩৭। এ বিস্ময়কর কাজের পাশাপাশি বিস্ময়কর অন্য কিছুও দেখা যেতে পারত, কেননা সেই সমস্ত কিছু কুড়িয়ে নেবার জন্য যারা বেরিয়ে যাচ্ছিল তারা পৃথক পৃথক ছিল (বয়সে ও বলে অবশ্যই তারা পৃথক ছিল), তবু যে যার ভিন্ন কার্যক্ষমতা অনুসারে একজন অন্য একজনের চেয়ে কম বা বেশি কুড়িয়ে নিচ্ছিল না, কিন্তু যা জড় করা হচ্ছিল তা এক একজনের প্রয়োজন অনুসারে পরিমিত ছিল, যার ফলে যে বেশি বলবান সেও বেশি পেত না, যে বেশি দুর্বল সেও সঠিক পরিমাণের চেয়ে কম পেত না। এবং তাছাড়া বিবরণী আমাদের আর একটা বিস্ময়কর কাজের কথা জানায়, অর্থাৎ, এক একজন এক এক দিনের জন্য যে পরিমাণ কুড়িয়ে নিত, তারা আগামী দিনের জন্য কিছুই বাঁচিয়ে রাখত না, কেননা যে কেউ সঞ্চয়ের লক্ষ্যে দিনের খাবারের কোন কিছু পরদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখত, সে যা বাঁচিয়ে রেখেছিল তা খাবার হিসাবে তার পক্ষে অকেজোই হত কেননা তা কীট জমাত।

[যাত্রা ১৬:২৫-৩০ দ্রঃ]

৩৮। এবং এই খাদ্য-বিবরণীর সঙ্গে অস্বাভাবিক আর একটা কথা রয়েছে; যেহেতু রহস্যাবৃত ব্যবস্থা ক্রমে সপ্তাহের এক দিন বিশ্রামে সম্মানিত করা হত, সেজন্য আগের দিন যদিও নেমে পড়া খাদ্যের পরিমাণ আগের দিনের পরিমাণের মত ছিল এবং যারা কুড়িয়ে নিচ্ছিল যদিও তাদের উদ্যোগ আগের দিনের উদ্যোগের সমান ছিল, তবু এটা দেখা যাচ্ছিল যে, জড় করা পরিমাণ সাধারণ পরিমাণের চেয়ে দ্বিগুণ ছিল, যাতে বিশ্রামের নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য কেউই খাবারের প্রয়োজনীয়তা অজুহাত হিসাবে না তুলত। এবং ঐশ্বরিক পরাক্রম আরও সুন্দর ভাবে এতে প্রকাশ পেত যে, অন্যান্য দিনগুলোতে যেমন অবশিষ্ট খাদ্য অকেজো হত, সাব্বাৎ দিনের (সাব্বাৎ, এটাই ছিল সেই দিনের নাম) আগের সন্ধ্যায় বাঁচিয়ে রাখা খাদ্য সেইভাবে নষ্ট হত না, যার ফলে সেই খাদ্য নতুন করে কুড়িয়ে নেওয়া খাবারের চেয়ে পুরাতন খাদ্য বলে মনে হচ্ছিল না।

[যাত্রা ১৭:৮-১০ দ্রঃ]

৩৯। পরে তারা বিদেশী একটা জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল; যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল, বিবরণী তাদের আমালেকীয় বলে। সেসময়ই ইস্রায়েলীয়েরা প্রথম বারের মত প্রকৃত সংগ্রামের জন্য হাতে অস্ত্র নিল: তারা যে শত্রু সকলকে একভাবেই যুদ্ধে ঠেলা দিল তা নয়, কিন্তু বীরত্বের জন্য বেছে নেওয়া লোকদের নিয়ে, ও তাদের দলগুলোর মধ্যে যেগুলো ছিল সেরা দল তাদেরই নিয়ে সংগ্রামের সম্মুখীন হল। এই পরিস্থিতিতে মোশি আর একবার যুদ্ধ পরিচালনা ক্ষেত্রে এক নতুন কায়দা দেখালেন, কেননা মোশির সঙ্গে যিনি জনগণকে চালনা করছিলেন, সেই যিশু [অর্থাৎ যোশুয়া] যখন আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে সেনাদলকে মাঠে নামান, তখন, সেনা বিন্যাসের বাইরে একটা উচ্চস্থানে অবস্থিত পর্যবেক্ষণ জায়গায় মোশির দুই পাশে তাঁর দু'জন আত্মীয় দাঁড়াতে দাঁড়াতে মোশি স্বর্গের দিকে চোখ তোলেন।

[যাত্রা ১৭:১১-১৩ দ্রঃ]

৪০। সেদিন যা কিছু ঘটেছিল, সেই ঘটনাবলির মধ্য থেকে আমরা বিবরণীর মাধ্যমে এই বিস্ময়কর কাজের কথা জানতে পারি: মোশি স্বর্গের দিকে হাত উত্তোলন করলে তাঁর অধীনস্থ জনগণ শত্রুদের উপর জয়ী হত; কিন্তু তিনি হাত নামালে সেনাদল বিদেশীদের চাপে হার মানত। মোশির সেই সহায়কেরা যখন ব্যাপারটা বুঝলেন, তখন দু' পাশ দিয়ে নিচে গিয়ে তাঁর হাত দু'টো উচ্চ করে ধরে রাখছিলেন, কেননা অজানা একটা কারণবশত তাঁর হাত দু'টো ভারী হয়েছিল ও নাড়াতে কঠিন হয়েছিল। এবং তাঁকে সোজা অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য সেই দু'জন অধিক দুর্বল হওয়ায় তাঁকে একটা পাথরের উপরে বসালেন ও তাঁদের এ কাজের মধ্য দিয়ে এমনটা করলেন যাতে মোশি হাত দু'টো স্বর্গের দিকে উত্তোলিত রাখেন। তাঁরা তেমন ব্যবস্থা করলেই বিদেশীরা ইস্রায়েলীয়দের দ্বারা একেবারে পরাজিত হয়।

৪১। যে মেঘ জনগণের যাত্রা দিশারী হয়ে চালনা করছিল, যেহেতু সেই মেঘ সেই স্থানে স্থির হয়ে থাকছিল, সেজন্য জনগণও এগোতে পারছিল না যেহেতু স্থানান্তরের জন্য চালনা করার মত কেউই ছিল না। সেই স্থানে তাদের পক্ষে বিনা শ্রমেই জীবনযাপন করার মত প্রচুর উপায় ছিল, কেননা ঊর্ধ্ব থেকে হাওয়া তাদের উপরে আরও রুটি বর্ষণ

করাত, ও নিচে থেকে সেই শৈল জল দিত। তাছাড়া সেই মেঘ ভারী হাওয়া প্রমশিত করছিল, কেননা মেঘটা দিনের বেলায় উত্তাপ থেকে আশ্রয় ছিল ও রাতের বেলায় আগুনের মত উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দেওয়ায় অন্ধকার দূর করে দিচ্ছিল। তাই, শিবির যেখানে অবস্থিত ছিল, লোকদের পক্ষে পর্বতের পাদতলে সেই মরুপ্রান্তরে কিছু দিন কাটানো ভারী ব্যাপার ছিল না।

[যাত্রা ১৯:১-১৫ দ্রঃ]

৪২। ঠিক সেই অবস্থায়ই মোশি আরও বেশি অনির্বচনীয় একটা রহস্যাবৃত দীক্ষা-ক্রিয়ার প্রবর্তক হলেন, কেননা ঐশ্বরিক পরাক্রমই অকল্পনীয় বিস্ময়কর নানা কাজ দ্বারা গোটা জনগণের ও স্বয়ং প্রবর্তকের রহস্যাবৃত দীক্ষা-ক্রিয়া চালনা করল। রহস্যাবৃত দীক্ষা-ক্রিয়াটা এভাবে ঘটল: জনগণকে আদেশ করা হল তারা যেন, দেহের ও আত্মার কলুষ বলে যা জ্ঞাত, সেই ধরনের যেকোন কলুষ থেকে দূরে থাকে, যেন নানা প্রক্ষালন দ্বারা নিজেদের শোধন করে, যেন নির্ধারিত দিনের সংখ্যা ধরে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সংসর্গও এড়ায়, যাতে দীক্ষিত হবার জন্য তারা মনের যত আবেগপূর্ণ ও দৈহিক মনোভাব থেকে শোধিত হয়ে, ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হয়ে পর্বতের কাছে এগিয়ে যেতে পারে; পর্বতের নাম ছিল সিনাই। পর্বতের কাছে এগিয়ে যাবার অনুমতি কেবল তাদেরই দেওয়া হচ্ছিল যারা বিচারশক্তিসম্পন্ন জীব ও যারা যেকোন কলুষ থেকে নিজেদের শোধন করেছিল; এবং অধিক যত্ন সহকারে সতর্কতা করা হচ্ছিল যেন কোনও বিচারশক্তিহীন জীব পর্বতে আরোহণ না করে। এবং দৈবাৎ তেমনটা ঘটলে তবে বিচারশক্তিহীন প্রকৃতির যত জীব পর্বতে দেখা দিত, সেই সমস্ত জীবকে জনগণ দ্বারা পাথরাঘাতে মারতে হত।

[যাত্রা ১৯:১৬ দ্রঃ]

৪৩। তখন বিশুদ্ধ হাওয়ার স্বচ্চ উজ্জ্বলতা কালিমা দ্বারা কালো হয়ে গেল, তাতে চারদিকে ঘোর তমসায় ঘেরা পর্বত অদৃশ্য হল, কিন্তু একই সময়ে, ঘোর তমসার মধ্য থেকে দীপ্তিমান একটা আগুন দর্শকদের কাছে দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর করছিল, কেননা সেই আগুন চারপ্রান্ত থেকে এমন ভাবে পর্বতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল যে, যা কিছু সেই আগুনের বৃত্তের মধ্য থেকে দেখা যেত, সেই সবকিছু ধূম দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছিল।

মোশি জনগণকে আরোহণ পথের দিকে চালনা করছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেও সেই দৃশ্যের দিকে সাহসের সঙ্গে তাকাচ্ছিলেন না, বরং প্রাণে ভয়ে বিহ্বল হচ্ছিলেন ও দেহে আতঙ্কে অস্থির হচ্ছিলেন, যার ফলে তাঁর প্রাণের উদ্বেগ ইস্রায়েলীয়দের এড়াল না ও তিনি নিজে তাদের সামনে মেনে নিলেন, যা কিছু দেখা দিচ্ছিল তার জন্য তিনি ভীত, ও দেহে নিজেকে নিরুদ্বিগ্ন রাখতে পারছিলেন না।

[যাত্রা ১৯:১৯ দ্রঃ]

৪৪। কেননা, যা কিছু দেখা যাচ্ছিল, কেবল সেই দৃশ্যই যে চোখের মধ্য দিয়ে প্রাণকে ভীত করছিল তা নয়, কিন্তু আতঙ্ক কানের মধ্য দিয়েও ছড়িয়ে পড়ছিল, কেননা ঊর্ধ্ব থেকে একটা শব্দ, নিচে যা কিছু ছিল, তার উপরে যন্ত্রণাদায়ী ভাবে ও ভয়ানক ভাবে উপচে পড়ছিল। সেই শব্দের সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শ যেকোন কানের পক্ষে ছিল কষ্টদায়ী ও অপ্রীতিকর, কেননা শব্দটা অন্যান্য তুরির উচ্চধ্বনির মত ছড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু শব্দের গভীরতা ও ভয়ানকতা ক্ষেত্রে তুরিধ্বনির সঙ্গে একেবারে অতুলনীয় ছিল। এবং এগিয়ে আসতে আসতে শব্দটা আরও বেশি ভয়াবহ হচ্ছিল, কারণ তা অবিরত উচ্চতর হচ্ছিল ও কোলাহলকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করছিল। কণ্ঠ-অঙ্গহীন হয়েও শব্দটা ঐশ্বরিক পরাক্রম গুণে উচ্চারিতই ছিল, কেননা হাওয়াই বাণীকে উচ্চারণযোগ্য করছিল, এবং সেই বাণী যে বিনা কারণেই উচ্চারিত ছিল তা নয়, কেননা সেই বাণী ঐশ আদেশমালা প্রদান করছিল। এবং শব্দটা এগোতে এগোতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও আরও বেশি তীব্রতর হচ্ছিল, এবং তুরিধ্বনির কোলাহল নিজেকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, কারণ ইতিমধ্যে নিঃসৃত শব্দগুলো সেই শব্দগুলোর তীব্রতা দ্বারা পরাস্ত হচ্ছিল যেগুলো ধারাবাহিক ভাবে ধ্বনিত হচ্ছিল।

[যাত্রা ১৯:২৩ দ্রঃ]

৪৫। গোটা জনগণ যা দেখছিল ও শুনছিল তা বহন করতে সক্ষম ছিল না। তাই সবাই মিলে তারা মোশিকে অনুরোধ করল যেন তিনি নিজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণী তাদের কাছে হস্তান্তরিত করেন, কেননা ঊর্ধ্ব থেকে আগত শিক্ষা অনুসারে যা কিছু তিনি প্রচার করবেন, সেই সবকিছু যে ঐশ্বরিক একটা আদেশ তা তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করবে না। তাই সবাই দৌড়তে দৌড়তে পুনরায় পর্বতের পাদতলে ফিরে গেলে

মোশি একাকী হয়ে থাকলেন ও এমন আচরণ দেখালেন যা, তাঁর আচরণ যদি সাধারণ হত, তার চেয়ে ভিন্নই ছিল। কেননা অন্যান্য সকলে যেমন সবাই মিলে একই বিপদের সম্মুখীন হলে মহত্তর সাহসিকতার সঙ্গে সেই বিপদের সামনে দাঁড়ায়, তাঁর বেলায় সেই অনুসারে হল না, কেননা তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে একাই ফেলে রাখলেও তিনি আরও সাহসী হলেন ও এভাবে দেখালেন যে, যে আতঙ্কে তিনি আগে অভিভূত হয়েছিলেন, তা তাঁর নিজের উদ্বেগ ছিল না, কিন্তু ভীত লোকদের সঙ্গে সংবেদনশীলতার খাতিরেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

[যাত্রা ১৯:১৯-২০ দ্রঃ]

৪৬। সুতরাং, যখন তিনি নিজের সঙ্গে একাকী হলেন, তখন জনগণের ভীরুতা থেকে একটা বোঝা থেকেই যেন মুক্ত হয়ে তিনি সেই ঘোর তমসারও (ক) মুখোমুখি হলেন, এবং অদৃশ্যতায় প্রবেশ করে দর্শকদের কাছে অদৃশ্য হলেন। কেননা ঐশ্বরিক রহস্যাবৃত তত্ত্বের পুণ্যালয়ে (ক) প্রবেশ ক'রে তিনি সেইখানে নিজে অদৃশ্যমান হয়ে অদৃশ্যমানের সংস্পর্শে এলেন; তাতে আমি মনে করি, তাঁর কর্মকাণ্ড দিয়ে তিনি আমাদের শিখিয়ে দিলেন যে, যে কেউ ঈশ্বরের সংস্পর্শে আসতে ইচ্ছা করে তার পক্ষে, সর্বপ্রথমে, যা কিছু বাহ্যিক চেহারা মাত্র তা ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক, এবং যা অদৃশ্য ও ধারণাতীত সেইদিকে একটা পর্বতচূড়ার দিকেই যেন মন ধাবিত ক'রে তাকে বিশ্বাস করতে হবে, যেখানে ধারণা গিয়ে পোঁছতে পারে না, সেইখানে ঈশ্বরত্ব রয়েছেন।

[যাত্রা ২০:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৪৭। মোশি সেখানে গিয়ে পোঁছে ঐশ্বরিক আদেশমালা গ্রহণ করেন। এটা এমন শিক্ষা ছিল যা সদ্‌গুণ সংক্রান্ত যার প্রধান বিষয় হল ধর্মভক্তি (ক) ও ঐশস্বরূপ বিষয়ে যথার্থ ধারণা পোষণ করা; অর্থাৎ, এটাই উপলব্ধি করা যে, ঐশস্বরূপ যেকোন উপলব্ধি-শক্তি ও যেকোন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ অতিক্রম করে যেহেতু আমরা যা কিছু জানতে পারি না কেন, তার সঙ্গে ঐশস্বরূপের তুলনা হতে পারে না। বাস্তবিকই মোশিকে এমন আদেশ করা হয়, ঈশ্বরত্ব বিষয়ে ভাবতে গিয়ে তিনি যেন উপলব্ধ কোনও বিষয়ের দিকে না তাকান, এবং যে স্বরূপ সমস্ত কিছু অতিক্রম করে, তিনি যেন সেই স্বরূপকে জ্ঞানের কোনও বস্তুর সদৃশ বলে গণ্য না করেন; বরং তিনি যেন এটা বিশ্বাস করেন যে, সেই

ঐশস্বরূপ আছে, ও সেই ঐশস্বরূপ যে কেমন অর্জনীয়, তা যে কী ধরনের বা তা যে কতটুকু বা কোথা থেকে আগত ও সেটার কেমন রূপ, এসমস্ত তিনি যেন অনুসন্ধান না করেন।

[যাত্রা ২০:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৪৮। সাধারণ ও বিশিষ্ট বিধি দিয়ে শিক্ষা উপস্থাপন করায় ঐশ্বরিক বাণী নীতি সম্পর্কেও নানা ব্যবস্থা যোগ করে। কেননা যে বিধি সমস্ত অপকর্ম বাতিল করে দেয়, সেই সাধারণ বিধি এটা যে, স্বদেশীদের ভালবাসতে হবে, এবং তেমন বিধিপালন থেকে এটাও অবশ্যই উৎপন্ন হয় যে, প্রতিবেশী কোন একজনকেও ক্ষতি করতে নেই। বিশিষ্ট বিধির মধ্যে পিতামাতার প্রতি সম্মান নির্দিষ্ট, এবং যা কিছু নিষিদ্ধ তার একটা তালিকা নির্দিষ্ট করা হয়।

[যাত্রা ২৫:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৪৯। তেমন বিধিমালা দ্বারা মনকে কেমন যেন পরিশুদ্ধ করে মোশি আরও বেশি সিদ্ধতর রহস্যাবৃত দীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ঐশ্বরিক পরাক্রম দ্বারা তাঁবুর পূর্ণতর দর্শন লাভে চালিত হন। সেই তাঁবু একটা মন্দির ছিল যার সৌন্দর্য এমন বৈচিত্র্যময় যা বর্ণনা করা কঠিন: নানা প্রবেশদ্বার, নানা স্তম্ভ, নানা পরদা, সেই ভোজনপাট, নানা দীপাধার, সেই ধূপ-বেদি, সেই আহুতি-বেদি ও সেই প্রায়শ্চিত্তাসন, এবং পবিত্রস্থানের মধ্যে ছিল সেই অংশ যা অগম্য ও অপ্রবেশ্য। এসমস্ত কিছুর সৌন্দর্য ও ব্যবস্থা পাছে স্মৃতি এড়ায়, এবং যারা পর্বতের নিচে ছিল সেই বিস্ময়কর কর্ম যেন তাদেরও কাছে প্রদর্শন করা হয়, সেজন্য মোশিকে এমন নির্দেশ দেওয়া হয় যেন বর্ণনা কেবল লিবিবদ্ধ পুস্তকের হাতে ন্যস্ত করা না হয়, বরং পৃথিবীতে যত অতিমূল্যবান ও জাঁকজমকপূর্ণ মাল পাওয়া যেতে পারে, তা ব্যবহার ক'রে বস্তুগত নয় সেই কর্মকে যেন বস্তুগত একটা নির্মাণকর্ম দিয়ে অনুকরণ করা হয়।

পরিমাণের দিক দিয়ে, সেই মালের মধ্যে সেই সোনাই প্রধান ছিল যা স্তম্ভগুলোর বাহির দিক মুড়ে দিত; এবং স্তম্ভগুলোর উপরি অংশ ও নিচের অংশ অলঙ্কৃত করার জন্য সোনার সঙ্গে রুপোও ব্যবহার করা হল; আমি মনে করি, এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল, যেন স্তম্ভগুলোর উপরি ও নিচের অংশের রঙের পার্থক্যের ফলে মধ্যবর্তী সোনা আরও

বেশি উজ্জ্বলতর উজ্জ্বলতা দেখায়। এমন স্থানগুলো ছিল যেখানে ব্রঞ্জের মাল ব্যবহার করা উপযোগী মনে হয়েছিল, যাতে স্তম্ভগুলোর রুপোর অংশগুলো তথা সেই শাথলা ও সেই চুঙি চারপাশে অলঙ্কৃত হয়।

[যাত্রা ২৬:৩১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৫০। পরদা, কাপড়, মন্দিরের বাহির দেওয়াল ও স্তম্ভগুলোর আচ্ছাদন-বস্ত্র, এসব কিছু নিপুণ বুনানি অনুসারে তৈরী ছিল, এবং এক একটা জিনিস তার সমুচিত মাল দিয়ে তৈরী ছিল। কোন না কোন বস্ত্রের জন্য রঙ ছিল নীল, বেগুনি ও সিঁদুরে লাল, এবং এমন শুভ্র সুতোর উজ্জ্বলতা যা তার প্রাকৃতিক চেহারা অনুযায়ী ও সম্পূর্ণরূপে অকৃত্রিম। অন্য বস্ত্রের জন্য ক্ষোম-কাপড় ব্যবহৃত ছিল, আরও অন্য বস্ত্রের জন্য, সেগুলোর ব্যবহার অনুসারে, ছাগলোম ব্যবহৃত ছিল। পরদার অলঙ্কার হিসাবে কোন কোন স্থানে উপযোগী ভাবে রক্তলাল চামড়া দেওয়া হয়েছিল।

৫১। পর্বত থেকে নেমে আসার পর মোশি, নির্মাণকর্মের যে নমুনা তাঁকে দেখানো হয়েছিল, সেই অনুসারে এসমস্ত কিছু নানা সহকারী দ্বারা তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু যে সময়ে তিনি মানুষের হাতে তৈরী নয় এমন মন্দিরে ছিলেন, সেসময়ে তাঁকে এটাও আদেশ করা হয়েছিল, তথা, যে যাজক মন্দিরের অভ্যন্তরীণ ভাগে প্রবেশ করবে তাকে কেমন অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে উজ্জ্বল হতে হবে। এবং সেই ঐশ্বরিক বাণী, পোশাক দ্বারা আবৃত যে অংশ তা থেকে শুরু না ক'রে কিন্তু যে অংশ বাইরে প্রকাশ্য তা থেকে শুরু ক'রে, যাজকের ভিতরের ও বাইরের পোশাক তাঁকে সূক্ষ্মরূপে আদেশ করেছিল।

[যাত্রা ২৮:৬-১২ দ্রঃ]

৫২। [যাজকের] স্কন্ধপটি দু'টো নানা রঙের কারণে বৈচিত্র্যময়ই ছিল, যে যে রঙ পরদার জন্য ব্যবহৃত, সেই একই রঙ ব্যবহৃত ছিল, কিন্তু তাছাড়া দুই দুই পাশে বন্ধনী সহ সোনার সুতো ছিল, যে বন্ধনী স্কন্ধপটি দু'টো একসাথে বেঁধে রাখছিল ও সোনার এক বৃত্তে দু'টো বৈদূর্য মণির জন্য বসার স্থান দিচ্ছিল। মণিমুক্তার সৌন্দর্য অবশ্যই সেগুলোর উজ্জ্বলতা থেকে আসছিল, এমন উজ্জ্বলতা যা সবুজাভ রশ্মি ছড়িয়ে দিচ্ছিল; তাছাড়া, নিপুণ কারুকাজ থেকে আসছিল খোদাই করা বস্তুগুলোর উজ্জ্বলতা, ও খোদাই

করা সেই বস্তুটা কোন না কোন প্রতিমা দেখাচ্ছিল না, কিন্তু অলঙ্কারটা ছিল পিতৃকুলপতিদের খোদাই করা নাম: এক একটা মণিমুক্তার জন্য ছ'টা নাম।

[যাত্রা ২৮:১৩-১৪ দ্রঃ]

৫৩। সেগুলোর অগ্রভাগ থেকে নানা ছোট্ট ঢাল ঝুলছিল, ও সূক্ষ্ম মালার মত নানা শেকলও ঝুলছিল যা একান্তর ভাবে বাঁধা অর্থাৎ সেগুলো উপর থেকে স্থালী বেয়ে চাকতির দুই পাশে নামছিল; আমি মনে করি, এসব কিছুর উদ্দেশ্য ছিল, যেন নিম্নস্থিত বস্তুগুলো দ্বারা আলোকিত হয়ে সেই নানা মালার সৌন্দর্য আরও বেশি উজ্জ্বল দেখাতে পারত।

[যাত্রা ২৮:১৫-৩০ দ্রঃ]

৫৪। বুকের উপরে ঝুলানো সেই বিখ্যাত সোনার ভূষণও ছিল যার মধ্যে চার সারি নানা ধরনের মণিমুক্তা ছিল যেগুলো পিতৃকুলপতিদের সংখ্যা অনুযায়ী: এক এক সারিতে তিনটে মণিমুক্তা বসানো ছিল ও সেই মণিমুক্তায় খচিত ছিল গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলের পতির নাম। স্কন্ধপটি দু'টোর নিচে পোশাকটা ঘাড় থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত নেমে যেত; পোশাকটা ঝুলন্ত উপযুক্ত ঝালর দিয়ে ভূষিত ছিল ও সেটার নিম্নপ্রান্ত বৈচিত্র্যময় বুনানি দিয়ে অলঙ্কৃত ছিল, এমনকি সেটা থেকে সোনার নানা অলঙ্কারও ঝুলানো ছিল: নানা সোনার কিঙ্কিণি ও ডালিম যা নিম্নপ্রান্ত অনুযায়ী একান্তর ভাবে বসানো।

[যাত্রা ২৮:৩৬-৪০ দ্রঃ]

৫৫। মাথার ফিতা রঙে ছিল নীল, ও যে পাত কপালে নামত তা ছিল খাটি সোনার, ও অনির্বচনীয় নাম দ্বারা খোদাই করা। আরও, সেই কোমর-বন্ধনী ছিল যা জামার বাড়তি অংশ বেঁধে রাখছিল, সেই অঙ্গরক্ষিণীর সূক্ষ্মতা ও সেই সমস্ত কিছুও ছিল যা পোশাকের গঠনের মধ্য দিয়ে প্রতীকমূলক ভাবে যাজকীয় গুণ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

৫৬। যে ঘোর তমসা অদৃশ্যমান করার অধিকার রাখছিল, সেই তমসা মোশিকে ঘিরে রাখতেই তিনি ঐশ্বরিক অনির্বচনীয় শিক্ষা দ্বারা এবিষয়ে ও সদৃশ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ও রহস্যাবৃত [ক] শিক্ষাদান অর্জনে নিজের চেয়েও আরও বেশি মহান হয়ে উঠে সেই ঘোর তমসা থেকে বের হন ও স্বদেশীদের কাছে নেমে যান যাতে,

ঐশদর্শনে যে সমস্ত বিস্ময়কর বিষয় তাঁকে দেখানো হয়েছিল, তাদের সকলকে সেই সমস্ত বিষয়ের অংশী করতে, বিধিনিয়ম স্থির করতে, ও পর্বতের উপরে তাঁকে দেখানো নমুনা অনুসারে জনগণের জন্য মন্দির ও যাজকত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

[যাত্রা ৩২:১৫-১৬ দ্রঃ]

৫৭। তিনি হাতে করে সেই পবিত্র পাথরফলক দু'টোও বহন করছিলেন যা ঐশ্বরিক উদ্যোগ ও দান স্বরূপ, ও যার গঠনের জন্য মানবীয় কোনও সহযোগিতা দাবি করেনি কিন্তু যার উপাদান ও তাতে যা খোদাই করা ছিল, সবই ছিল ঈশ্বরেরই কাজ। যা খোদাই করা ছিল সেটা ছিল বিধান। কিন্তু বিধানকর্তা আসবার আগে জনগণ লাথি মেরে ও প্রতিমাপূজার দিকে ফিরে সেই দান [ক] অর্পণে বাধা সৃষ্টি করল।

[যাত্রা ৩২:১-৬ দ্রঃ]

৫৮। কেননা যেহেতু সেই ঐশ্বরিক রহস্যাবৃত শিক্ষা গ্রহণে মোশি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলায় যথেষ্ট সময় কাটিয়েছিলেন ও চল্লিশদিন চল্লিশরাত ঘোর তমসায় সময়ের বাইরের সেই জীবনে অংশ নিয়েছিলেন কেমন যেন তিনি প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করেছিলেন (কেননা সেই সমস্ত সময় ধরে তাঁর দেহ কোনও খাদ্য দাবি করেনি), সেজন্য ইতিমধ্যে জনগণ, পরিচালক দাসের দৃষ্টি থেকে দূরবর্তী একটা ছেলের মত অদম্য ভাবাবেগ দ্বারা অবাধ্যতায় নিজেকে তাড়িত হতে দিয়েছিল, এবং আরোনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সেই যাজককে প্রতিমাপূজায় তার দিশারী হতে বাধ্য করেছিল।

[যাত্রা ৫২:১৯ দ্রঃ]

৫৯। এবং সোনার একটা প্রতিমা তৈরি ক'রে (প্রতিমা ছিল একটা বাছুর) তারা সেই ভক্তিহীনতা নিয়ে উল্লাস করছিল এমন সময় মোশি তাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের তাঁকে দেওয়া ফলক দু'টো ভেঙে দেন যাতে ঈশ্বরের দান-বঞ্চিত হয়ে তারা নিজেদের অপকর্মের যোগ্য প্রতিফল দেয়।

[যাত্রা ৩২:২৩-২৫; ৩৪:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৬০। পরে, লেবীয়দের কর্মের মধ্য দিয়ে জনগণের রক্তের দ্বারা সেই ভক্তিহীনতা শোধন ক'রে এবং অপরাধীদের প্রতি তাঁর প্রকাশিত রোষ প্রমশিত ক'রে, ও চল্লিশ দিনব্যাপী অবস্থানের পর তিনি নতুন করে সেই পাথরফলক দু'টো বয়ে আনেন যার

লেখা ছিল ঐশ্বরিক অধিকারসম্পন্ন, কিন্তু যার উপাদান মোশির হাত দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রকৃতির সীমার বাইরে আরও চল্লিশদিন ধরে নতুন করে বেরিয়ে যাবার পরেই তিনি সেগুলো এনে বহন করেন, এবং সেসময়ে তিনি আমাদের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে নয় কিন্তু অন্য নিয়ম অনুসারেই জীবনযাপন করেন, কেননা আমরা যা দ্বারা আমাদের প্রকৃতির দাবি শোধ করি তিনি নিজের দেহের জন্য সেই খাদ্যের কোন কিছুই পেলেন না।

৬১। এইভাবে, ঈশ্বর দ্বারা তাঁকে যা শেখানো হয়েছিল সেই অনুসারে মোশি যাজকত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদের জন্য তাঁবু গাড়লেন ও বিধিনিয়ম স্থির করলেন। এবং ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসারে হাতের কাজ দ্বারা, তথা তাঁবু, প্রবেশদ্বারগুলো ও সেগুলোর মধ্যে যা কিছু ছিল, ধূপ-বেদি, আহুতি-বেদি, দীপাধারগুলো, পরদা, যাবতীয় কাপড়, পরম পবিত্রস্থানের মধ্যে স্থিত প্রায়শ্চিত্তাসন, যাজকীয় পোশাক, অভিষেকের তেল, নানা যজ্ঞ, শুদ্ধিক্রিয়া, ধন্য-স্তুতিবাদ, অমঙ্গল বিতাড়ন-রীতি, পাপের বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত রীতি, এসমস্ত কাজ দ্বারা সবকিছু ব্যবস্থা করার পর যেহেতু তিনি জনগণের মধ্যে এসমস্ত কিছু রীতিমত ব্যবস্থা করেছিলেন সেজন্য নিজের বিরুদ্ধে নিজের আপনজনদের হিংসা জাগালেন, এ এমন কিছু যা মানব প্রকৃতির সহজাত দোষ।

[গণনা ১২:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৬২। কেননা যাঁকে যাজকীয় মর্যাদায় সম্মানিত করা হয়েছিল সেই আরোন, এবং ঈশ্বর দ্বারা মোশিকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল সেবিষয়ে স্ত্রীলোক-জাতীয় হিংসায় প্ররোচিত তাঁর সেই বোন মরিয়মও এমন নিন্দাজনক কথা উচ্চারণ করেছিলেন যার জন্য ঈশ্বরত্ব তেমন পাপের শাস্তি দেবার জন্য প্রভাবান্বিত হলেন। তখন মোশি নিজের সহিষ্ণুতার জন্য আরও বেশি শ্রদ্ধার যোগ্য হলেন, কেননা, ঈশ্বর সেই স্ত্রীলোকের মূর্খ হিংসা শাস্তি দিতে দিতে তিনি ক্রোধের উপরে নিজের স্বভাবকে প্রাধান্য দিয়ে বোনের প্রতি ঈশ্বরকে প্রশমিত করলেন।

[গণনা ১১:৪-৬; ১১:৩১-৩২ দ্রঃ]

৬৩। ইতিমধ্যে জনগণ পুনরায় অবাধ্যতার দিকে ফিরল: এসব কিছুর সূচনা হল খাদ্যলালসা ক্ষেত্রে অমিতাচার, কেননা স্বর্গ থেকে যে খাদ্য নেমে আসছিল তাতে স্বাস্থ্যকর ভাবে ও বিনা শ্রমে জীবনযাপন করতে তুষ্ট হল না কিন্তু মাংস খাবার বাসনা (ক) এমনটা করল যে তারা বর্তমান মঙ্গলদানগুলোর চেয়ে মিশরীয়দের মধ্যে তাদের আজীবন দাসত্ব পছন্দ করল। তখন, যে আবেগ তাদের আঘাত করেছিল সেবিষয়ে মোশি ঈশ্বরের কাছে বুদ্ধি যাচনা করলেন, এবং তারা যা বাসনা করছিল তা তাদের মঞ্জুর করায় ঈশ্বর এশিক্ষা দিলেন যে, সেইভাবে আচরণ করা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে তিনি ব্যবস্থা করলেন, তাতে ভূমির উপর দিয়ে উড়ন্ত মহৎ পরিমাণ পাখি হঠাৎ করে শিবিরের উপর একভাবেই নেমে পড়ল, এবং এর ফলে সেই সহজ পাখি-শিকার মাংসের বাসনাকে পরিতৃপ্ত করল।

[গণনা ১১:৩৩-৩৪ ইত্যাদি দ্রঃ]

৬৪। কিন্তু তাদের অনেকের মধ্যে সেই খাদ্যের আতিশয্য দেহের মেজাজ বিকৃত করে ধ্বংসাত্মক বমির কারণ হল, ও তাদের জন্য সেই পরিতৃপ্তির পরিণতি হল অসুস্থতা ও মৃত্যু: এ এমন দৃষ্টান্ত যা তাদের, ও যারা তাদের দিকে তাকাচ্ছিল তাদেরও খাদ্য-মিতাচারিতায় ফিরিয়ে নেওয়ায় কল্যাণকর হল।

[গণনা ১৩:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৬৫। পরে মোশি কয়েকজনকে সেই দেশ পরিদর্শন করতে পাঠালেন, সেই যে দেশে, ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে, তারা বসবাস করবে বলে প্রত্যাশা করছিল। এবং যেহেতু পাঠানো গুপ্তচরেরা সবাই সত্য কথা জানিয়ে দেয়নি কিন্তু কয়েকজন মিথ্যা ও মন্দ খবর আনল, সেজন্য জনগণ পুনরায় মোশির বিরুদ্ধে ক্রোধে প্রণোদিত হল। এবং যারা ঈশ্বরের সহায়তায় আস্থা রাখল না, তিনি তাদের এমন শাস্তি দিলেন যাতে তারা তাদের কাছে প্রতিশ্রুত সেই দেশ না দেখতে পায়।

[গণনা ২০:২ ইত্যাদি দ্রঃ]

৬৬। পরে, তারা মরুপ্রান্তরে এগোতে এগোতে পুনরায় তাদের জলের অভাব হল, ও জলের অভাবের পাশে পাশে ঐশ্বরিক পরাক্রমের স্মৃতিও কমে গেল। কেননা তারা

এমন প্রত্যাশা রাখল না যে, শৈল সংক্রান্ত আগেকার সেই অলৌকিক কাজের ভিত্তিতে এবারও তারা কোন কিছুর অভাব অনুভব করবে না, বরং পরিত্রাণদায়ী সমস্ত প্রত্যাশা থেকে সরে গিয়ে অপবাদ উত্থাপন করে ঈশ্বর ও মোশির বিরুদ্ধ এমনভাবে রুখে দাঁড়াল যে মনে হল মোশি নিজেও জনগণের অবিশ্বস্ততায় লিপ্ত হতে যাচ্ছেন; কিন্তু না, তিনি পরে সেই শক্ত পাথর জলে রূপান্তরিত করায় তাদের জন্য সেই অলৌকিক কাজ পুনঃসাধন করলেন।

[গণনা ২১:৪-৬ দ্রঃ]

৬৭। পরে অমার্জিত খাদ্যলালসা পুনরায় তাদের মধ্যে সুস্বাদু খাদ্যের বাসনা জাগাল, এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছুর অভাব না থাকলেও তবু তারা মিশরীয়দের প্রাচুর্য স্বপ্ন করছিল; কিন্তু কঠোরতম শাস্তি দ্বারা অবাধ্য যুবকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, বাস্তবিকই সাপ তাদের আক্রমণ করল ও কামড় দিয়ে তাদের দেহে মৃত্যুজনক বিষ ঢুকিয়ে দিল।

[গণনা ২১:৭-৯ দ্রঃ]

৬৮। যেহেতু সেই সাপগুলোর কারণে তারা একজনের পর একজন মারা পড়ছিল, সেজন্য ঐশ্বরিক পরামর্শ ক্রমে সেই বিধানকর্তা এক পরিমাণ ব্রঞ্জ সাপের আকারে ঢালাই করিয়ে সেটাকে একটা উচ্চস্থানে উত্তোলিত করালেন যাতে গোটা শিবিরের কাছে তা দৃষ্টিগোচর হয়। এইভাবে তিনি জনগণের মধ্যে সেই জন্তুদের দ্বারা ঘটিত ক্ষতি বন্ধ করে দিলেন ও জনবিনাশ বন্ধ করলেন। কেননা যে কেউ সাপের ব্রঞ্জ-জাতীয় প্রতিমূর্তির দিকে তাকাত, সে প্রকৃত সাপের কামড় আর ভয় পেত না, কারণ রহস্যময় এক বিপরীত কার্যফলের গুণে সেই তাকানোটাই বিষের কার্যকারিতা ব্যর্থ করত।

[গণনা ১৬:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৬৯। যেহেতু জনগণের কয়েকজন লোক পরিচালনার দায়িত্ব পাবার জন্য পুনরায় মোশির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল ও অন্যান্য কয়েকজন হিংস্রতা সহকারে নিজেদের উপর যাজকত্ব হস্তান্তরিত করতে চেষ্টা করছিল, সেজন্য মোশি পাপীদের হয়ে পুনরায় ঈশ্বরকে অনুনয় করলেন, কিন্তু ঐশ্বরিক শাস্তির ন্যায্যতা স্বদেশীদের প্রতি মোশির স্নেহের চেয়ে শক্তিশালী হল। কেননা, ঐশ্বরিক ইচ্ছা ক্রমে, যারা মোশির অধিকারের

বিরোধিতা করেছিল, তাদের সকলকে গ্রাস ক'রে ভূমি একটা গহ্বরে খুলে গেল ও পরে পুনরায় নিজেতে বন্ধ হল। এবং যারা যাজকত্বের জন্য উন্মাদ হয়েছিল, (তারা সংখ্যায় দু'শ পঞ্চাশ ছিল), তারা সবাই আগুন দ্বারা পুড়ে গিয়ে নিজেদের দুর্দশা দ্বারা জনগণকে সুবিবেচক হতে উপযোগী শিক্ষা দিল।

[গণনা ১৭:১৬-২৪ দ্রঃ]

৭০। এবং যাতে মানুষ আরও বেশি করে বুঝতে পারে যে যাজকত্ব-অনুগ্রহ ঈশ্বর দ্বারা তাদেরই মঞ্জুর করা হয় যারা তেমন অনুগ্রহের যোগ্য, সেজন্য প্রত্যেকজন নিজ নিজ লাঠি দেওয়ার সময়ে তা নিজ নিজ অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করার পর মোশি প্রতিটি গোষ্ঠীর গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের লাঠি আনালেন; সেগুলোর মধ্যে যাজক আরোনের লাঠিও ছিল। লাঠিগুলো মন্দিরের সামনে সাজিয়ে তিনি সেগুলোর মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে যাজকত্ব সম্পর্কে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন, কেননা সবগুলো লাঠির মধ্যে কেবল আরোনের লাঠিই কচি-ফুল ধরল ও কাঠ থেকে একটা ফল জন্মাল যা পাকা হল (ফলটা ছিল বাদাম)।

৭১। এই বিস্ময়কর কাজ অবিশ্বাসীদের কাছেও অধিক মহৎ মনে হল: যা শুকনো, যার ছাল ছিল না, শিকড়ও ছিল না তা কেমন করে একভাবে উর্বর হয়ে শিকড়বিশিষ্ট গাছপালার একটা গাছের মত ফল ধরল, কেননা সেই কাঠের জন্য ঐশ্বরিক পরাক্রম মাটি, ছাল, আর্দ্রতা, শিকড় ও কালের ভূমিকা আপন করছিল।

[গণনা ২০:১৭ দ্রঃ]

৭২। এসমস্ত ঘটনার পর, বিদেশী লোকদের মধ্য দিয়ে জনগণকে চালনা কালে মোশি তাদের মাঠ ও আঙুরখেত দিয়ে যেতে নিষেধ করে জনগণকে রাজকীয় রাস্তা ধরালেন, ডানে কি বাঁয়ে কোথাও তাদের সরতে দিলেন না। কিন্তু, যেহেতু শত্রুরা এ শর্তেও শান্তশিষ্ট থাকছিল না, সেজন্য যুদ্ধে বিদেশীদের পরাজিত করে তিনি পথের মালিক হন।

[গণনা ২২:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৭৩। তখন, যিনি মহত্তর জনগণের শাসক ছিলেন (জনগণের নাম ছিল মিদিয়ানীয়), সেই বালাক, যারা ইস্রায়েলীয়দের হাতে পড়েছিল তাদের দশায় কম্পান্বিত

হয়ে, এবং সেই ইস্রায়েলীয়দের হাতে একই দশা ভোগ করতে হবে বলে ভয় পেয়ে সাহায্য হিসাবে অস্ত্রের ও মানুষের শক্তি যোগাড় না করে বরং বালায়াম নামক একজনের দ্বারা অস্বাভাবিক জাদুশক্তি অর্জন করেন; সেই বালায়াম বিষয়ে এ খ্যাতি ছিল যে, তাঁর জাদুশক্তি নিশ্চিত, ও যত মানুষ তাঁর সহায়তা চেয়েছিল তারা মনে করছিল জাদু ক্ষেত্রে তিনি এক প্রকার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল পাখি-ওড়ার কায়দা পরীক্ষা, এবং কয়েকটা অপদূতের সাহায্যে তিনি যথেষ্ট অস্বাভাবিক একটা প্রতাপ প্রয়োগে লোকদের বিরুদ্ধে অমঙ্গল জাগানোর ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন (ক)। যারা তাঁকে সেই জনগণের রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের অনুসরণ করার সময়ে তিনি নিজের গাধার কণ্ঠ থেকে জানতে পারেন, যাত্রা তাঁর মঙ্গলজনক হবে না।

[গণনা ২২:২১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৭৪। পরে, তাঁকে যা করতে হবে তা দর্শনযোগে জেনে তিনি দেখলেন, যারা ঈশ্বর দ্বারা সাহায্য পাচ্ছিল তাদের ক্ষতি করার জন্য অশুভ জাদুশক্তি বেশি দুর্বল। তাই অপদূতদের পরাক্রমের নয়, ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় ভর পেয়ে তিনি এমন বাণী উচ্চারণ করলেন যা, যা ঘটবার কথা ছিল, সেবিষয়ে শুভ ফলাফলের প্রকাশ্য ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ হল। তাই, যে শক্তি তাঁকে জঘন্য ভাবে কাজ করতে বাধা দিল, যেহেতু সেই শক্তি ঐশ্বরিক পরাক্রম বিষয়ে তাঁকে সচেতন করল, সেজন্য তিনি জাদুবিদ্যা ত্যাগ করে ঐশ্বরিক ইচ্ছা ক্রমে নবীয় বাণী দিচ্ছিলেন।

[গণনা ২৫:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৭৫। এসমস্ত ঘটনার পর সেই বিদেশীরা পরাজিত হল, কিন্তু যে জনগণ শত্রুদের উপর জয়ী হয়েছিল তারা পরবর্তীকালে বন্দি মেয়েদের কারণে অবৈধ অসংযমের লালসা দ্বারা পরাস্ত হল, যতদিন না যারা লজ্জাকর ভাবে [মেয়েদের সঙ্গে] সংযুক্ত হয়েছিল ফিনেয়াস [বর্শার] এক কোপে তাদের বিঁধিয়ে দিলে, যারা উচ্ছৃঙ্খল লালসা দ্বারা অবৈধ সম্পর্কে নিজেদের প্রণোদিত হতে দিয়েছিল তাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ থেমে গেল। তখন বিধানকর্তা একটা উচ্চ পর্বতে উঠলেন ও দূর থেকে সেই দেশ লক্ষ করলেন যা পিতৃগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির জোরে ইস্রায়েলের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাই তিনি

পৃথিবীতে কোন কবর দিয়ে নিজের প্রস্থানের কোনও চিহ্ন বা স্মৃতি না রেখে মানব জীবন থেকে সরে গেলেন।

[দ্বিঃবিঃ ৩৪:১-৭ দ্রঃ]

৭৬। সময়ের গতি তাঁর সৌন্দর্যের ক্ষতি ঘটায়নি, তাঁর চোখের উজ্জ্বলতাও ক্ষীণ করেনি, তাঁর মুখমণ্ডলের দীপ্তিময় লাবণ্যেরও হ্রাস করেনি, তিনি বরং সবসময়ই নিজের সমান হয়ে থাকলেন এবং এইভাবে প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতায় সৌন্দর্যের অপরিবর্তনশীলতা রক্ষা করলেন [ক]।

৭৭। আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে তোমার কাছে এসমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করেছি যা আমরা তেমন মানুষের জীবন-বৃত্তান্ত থেকে আক্ষরিক অর্থে জানতে পেরেছি, যদিও সময় সময় কোন না কোন কারণে আলোচনাটা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছি। এখন সেই সময় এসে গেছে যখন জীবনের যে ঘটনাগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা সেই ঘটনাগুলো আমাদের বক্তব্যের নিরূপিত লক্ষ্যের জন্য উপযোগী করব, যাতে করে, আমরা যা যা বলে এসেছি, তা থেকে আমাদের কাছে যেন সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের জন্য উপকারী অবদান আসতে পারে [ক]। তাই আমরা এবিষয়ের ব্যাখ্যা শুরু করে দিই।

২য় পুস্তক

মোশির জীবন-বৃত্তান্তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

পরিচ্ছেদঃ ১ ১৯ ৪২ ৫৪ ৬৩ ৭৩ ৮৯ ১০২ ১১২ ১১৭ ১২২ ১৩০ ১৩৭ ১৪৭ ১৫২ ১৬২ ১৭০ ১৮৪ ১৮৯ ২০২ ২১৯ ২৫৬ ২৬৪ ২৬৯ ২৭৮ ২৮৭ ২৯১ ৩০৫ ৩১৯

মোশির জন্ম ও বাল্যকাল (যাত্রা ১:১৬ দ্রঃ)

১। যখন স্বৈরশাসকের বিধি সকল ছেলেকে হত্যা করতে হুকুম দেয়, সেসময়েই মোশির জন্ম হয়। তবে আমরা কেমন করে মানুষের দৈবাৎ জনিত জন্মকে স্বাধীন বেছে নেওয়াতে (ক) অনুকরণ করতে পারব? কেননা কেউ না কেউ একথা বলবে যে, সেই উৎকৃষ্ট প্রসবকে নিজের জন্মে অনুকরণ করা আমাদের উপর আদৌ নির্ভর করে না। প্রকৃতপক্ষে, যা অধিক কঠিন মনে হচ্ছে, তা থেকে অনুকরণটা শুরু করা আদৌ কঠিন নয়।

২। বাস্তবিকই কেই বা এটা জানে না যে, যা কিছু পরিবর্তনের অধীন, তা যা, তা কখনও হয়ে থাকে না, কিন্তু অবিরতই অন্য থেকে অন্য হয়, ও সেই পরিবর্তন আরও ভাল বা আরও মন্দ হয়ে দাঁড়ায়? (ক)। তাই এসো, আমরা এই ভিত্তির উপরে আমাদের ধারণা দাঁড় করাই। মানব স্বভাব যে দিকে একেবারে তাড়িত, সেই জড়তা ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের প্রতি প্রবণতার প্রতীক হল জীবনের সেই স্ত্রীলিঙ্গাত্মক ভাগ (খ) যা সেই স্বৈরশাসক (গ) ইচ্ছা করছিল তা বেঁচে থাকবে। কিন্তু সদ্‌গুণের কঠোরতা ও কড়াকড়িতা সেই সঞ্জাত পুত্রসন্তান দ্বারা নির্দেশিত যে স্বৈরশাসকের বিরোধী ও যার বিষয়ে স্বৈরশাসক সন্দেহ করে, ছেলেটি তাঁর ক্ষমতার প্রতি বিদ্রোহ করবে বলে অভিপ্রায় করছে।

৩। তাই যা কিছু অবিরত পরিবর্তনশীল, তা যে কেমন যেন সবসময় প্রসূত তা তো আবশ্যক, কারণ পরিবর্তনশীল প্রকৃতিতে এমন কিছু দেখা যায় না যা সবসময় নিজের

সমান হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, সেইভাবে জন্ম নেওয়া বাহ্যিক কোন উদ্যোগের উপর নির্ভর করে না, যেইভাবে সমস্ত জীবদের বেলায় ঘটে যেগুলো মাংসময় ভাবে প্রসূত। কিন্তু এই প্রসব স্বাধীন বেছে নেওয়াটার ফলেই হয়, এবং আমরা এক প্রকারে সবাই হলাম নিজেদেরই পিতা যারা যেভাবে ইচ্ছা করি ঠিক সেই স্বাধীন বেছে নেওয়াটা অনুসারেই নিজেদের জনিত করি, এবং কি হব তথা আমরা যে ছেলে বা মেয়ে হব তা আমরাই স্বাধীন ভাবে স্থির করি অর্থাৎ আমরা নিজেরাই স্বাধীন ভাবে সদ্‌গুণ বা রিপু স্থির করি।

৪। সুতরাং, যদিও স্বৈরশাসক এতে একেবারে অনিচ্ছুক ও মনে কষ্টও পায়, তবু আমাদের পক্ষে উৎকৃষ্টতম জন্মে আলোতে আসা সম্ভব; এমনকি, যারা তত সুন্দর প্রসবের জনক-হননী (অর্থাৎ, এরা যারা সদ্‌গুণের পিতা হয়, তারা উপরোল্লিখিত সেই শুভ চিন্তাই হতে পারে), তাদেরও পক্ষে সানন্দে ছেলের দিকে তাকানো ও তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব যদিও ব্যাপারটা স্বৈরশাসকের অভিপ্রায়ের বিপরীত।

৫। তবে, পাঠের আক্ষরিক অর্থ ছেড়ে কেউ যদি সেটার গুপ্ত অর্থ (ক) সূক্ষ্মতর ভাবে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা করে, তাহলে বিবরণীর অর্থ এ: সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনযাপনের আরম্ভ হল বিরোধীর মনের কষ্টের জন্য জন্ম নেওয়া: বলতে চাই, এমন জন্মে জন্ম নেওয়া যেখানে প্রসবকালে স্বাধীনতাই ধাত্রীর ভূমিকা পালন করবে। কেননা কেউই নিজের বিরোধীকে ক্ষতি করতে পারে না যদি না ইতিমধ্যে নিজেতে এমন চিহ্ন দেখায় যে-চিহ্ন বিরোধীর বিরুদ্ধে তার বিজয়ের প্রমাণ হতে পারে।

৬। এবং এই বীর্যবান ও সদ্‌গুণবিশিষ্ট ছেলেকে প্রসব করা, উপযোগী খাদ্য দানে লালন-পালন করা, ও সে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে জল থেকে নিস্তার পায় তেমন ব্যবস্থা করা কেবল এই স্বাধীন বেছে নেওয়াটার উপরে নির্ভর করে। কেননা যারা নিজেদের সন্তানদের স্বৈরশাসকের কাছে প্রদান করে, তারা তাদের উলঙ্গ অবস্থায় ও দূরদর্শিতা ছাড়াই জলস্রোতের হাতে তুলে দেয়। জলস্রোত বলতে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী সেই উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের তরঙ্গমালা দ্বারা আলোড়িত জীবন বোঝাই, কেননা যা কিছু স্রোতের ইচ্ছার হাতে রয়েছে, সেই উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগই তা নিমজ্জিত ও শ্বাসরুদ্ধ করে (ক)।

৭। অন্যদিকে প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শিতা সম্পন্ন চিন্তাধারা, অর্থাৎ সেই বীর্যবান ছেলের পিতামাতা যখন তাদের ভাল ছেলে জীবনের অনিবার্য পরিস্থিতি দ্বারা এজগতের তরঙ্গমালার দিকে তাড়িত হয়, তখন তারা তাকে একটা ঝাঁপিতে তুলে দেওয়ায় এমনটা ব্যবস্থা করে সে যেন স্রোতের জলে নিমজ্জিত না হয়। যে ঝাঁপি নানা তক্তা সংযোগে তৈরি হয়, সেই ঝাঁপি বলতে সেই শিক্ষাদীক্ষা বোঝা উচিত যা বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয়ের সংযোজন দিয়ে গঠিত।

৮। এ শিক্ষাদীক্ষা যা বহন করে তা জীবনের তরঙ্গমালার উপরে এমন ভাবে ধরে রাখবে, যার ফলে সেই শিক্ষাদীক্ষা থাকলে ছেলে উত্তাল তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হয়ে বেশিক্ষণ ধরে সমুদ্রে উদ্দেশবিহীন ভাবে চলবে না, কিন্তু স্থলে অর্থাৎ জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝার বাইরে গিয়ে পৌঁছে তাকে জলের গতিধারা দ্বারা নিরাপদ স্থানের দিকে আপনা আপনিই ভাসিয়ে দেওয়া হবে।

৯। একথা আমরা অভিজ্ঞতা থেকেও শিখি, কারণ যারা মানবীয় চালাকি দ্বারা নিজেদের নিমজ্জিত হতে দেয় না, খোদ অস্থিরতা ও তাদের কর্মকাণ্ডের সামনে-পিছনের গতি নিজের থেকে তাদের দূরে ঠেলে দেয়, কেমন যেন সেসমস্ত এটা ভাবে যে, যারা সদ্গুণের কারণে বিরক্তিকর হয়, তারা অনুপযোগী একটা বোঝা। যে কেউ এ পরিস্থিতির বাইরে রয়েছে, সে ঝাঁপিতে নিরাপদ অবস্থায় থাকলেও তবু মোশির অনুকরণ করুক ও চোখের জল অঝোরে ফেলুক, কেননা যে কেউ সদ্গুণ দ্বারা পরিত্রাণ পায়, তার জন্য চোখের জল হল নিরাপদ রক্ষা স্বরূপ।

১০। এবং যদি রাজার সেই বন্ধ্যা ও সন্তানবিহীন কন্যা (আমি মনে করি, তাকে জাগতিক তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে উপযুক্ত ভাবে তুলনা করতে পারি) ছেলেকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে এমনটা করে যাতে তাকে ছেলের মা বলে ডাকা হয়, তাহলে যুক্তি সেই মিথ্যা মায়ের আত্মীয়তা প্রত্যাখ্যান না করা সম্পর্কে সম্মতি দেয়, অন্তত ততক্ষণ ধরে যতক্ষণ একজন তার বয়সের অসিদ্ধতা বিচার-বিবেচনা না করে। কিন্তু যে কেউ ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বের দিকে যাত্রাপথের পথিক হয়, সে, যেইভাবে আমরা মোশি সম্পর্কে শিখেছি, সেই অনুসারে সে প্রকৃতিতে বন্ধ্যা নারীর ছেলে বলে অভিহিত হওয়াটা লজ্জার ব্যাপার জ্ঞান করবে।

১১। কেননা একথা একেবারে সত্য যে, জাগতিক শিক্ষা সবসময় গর্ভবতী কিন্তু কখনও প্রসব করে না। বাস্তবিকই তত্ত্ববিদ্যা নিজের দীর্ঘকালীন প্রসববেদনার কোন্ ফল দেখাতে পারে? অথবা, তেমন ও তত বেদনার কোন্ যোগ্য ফল দেখাতে পারে? ঈশ্বরজ্ঞানের (ক) আলোর নাগাল পাবার আগে তারা সবাই কি অপূর্ণ ও অসিদ্ধ হয়ে অকালজাত হয় না? অথচ তারা অবশ্যই মানুষ হতে পারত যদি সেই বন্ধ্যা প্রজ্ঞার গর্ভে সম্পূর্ণ রূপে জড়ানো অবস্থায় না থেকে যেত।

১২। সুতরাং, একজন ততক্ষণ ধরে মিশরীয়দের রানীর সঙ্গে জীবনযাপন করুক যতক্ষণ এমনটা মনে না হয় যে, তাদের কাছে যত উৎকৃষ্ট মঙ্গলদান রয়েছে সে সেগুলোর অভাবী; কিন্তু পরে, প্রকৃতি অনুসারে যে তার মা, সে তার কাছে ছুটে যাক, কেননা তাকে রানীর কাছে লালন-পালন করার সময়ও সে তার সেই প্রকৃত মা থেকে বিযুক্ত হয়নি, যেহেতু বিবরণী এটা বলে যে, তাকে মাতৃদুধ খাওয়ানো হয়েছিল। আমি মনে করি, এই ঘটনা আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, যদিও শিক্ষালাভের সময়ে আমরা জাগতিক বিদ্যার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে থাকি, তবু যে মণ্ডলী আমাদের পুষ্টিসাধন করে, সেই মণ্ডলীর দুধ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে নেই। দুধ বলতে আমি মণ্ডলীর সেই বিধিনিয়ম ও প্রথা বোঝাতে চাই যা দ্বারা প্রাণ পুষ্টিলাভ করল ও বলতে গেলে পেকে গেল ও আরোহণের জন্য যা থেকে প্রেরণা পেল।

[যাত্রা ২:১১-১২ দ্রঃ]

১৩। কিন্তু যে কেউ বিদেশী ও স্বদেশী ধর্মতত্ত্ব একসাথে লক্ষ করে, সে যে দেখবে, সে দুই শত্রুর মধ্যে রয়েছে, তার সেই ধারণা সত্য; কেননা বিদেশী ধর্ম যখন দেখায়, যুক্তি প্রয়োগে সে ইস্রায়েলীয় ধর্মের চেয়ে শক্তিশালী, তখন সেই ধর্ম হিব্রু শিক্ষার বিরোধী। এবং অতিরিক্ত হালকা প্রকৃতির বহু মানুষদের মতে বিদেশী ধর্ম ঠিক তাই মনে হল: তারা তো শত্রুদলে যোগ দেবার জন্য স্বদেশী বিশ্বাস ত্যাগ করেছে ও তেমনটা করে পিতৃগণের শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু যে কেউ বলবান ও বীর্যবান, মোশির দৃষ্টান্ত অনুসারে সে নিজের বর্শার আঘাতে দেখাবে, যে ধর্মতত্ত্ব ধর্মভক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, সেই ধর্মতত্ত্ব মৃত প্রাণ মাত্র।

১৪। অন্য একটা ব্যাখ্যা অনুসারে, একজন আমাদের নিজেদেরই মধ্যে একই সংগ্রাম দেখতে পারে। কেননা প্রতিদ্বন্দ্বিতার পুরস্কার স্বরূপ মানুষ এমন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝে রয়েছে যারা একে অন্যের বিরুদ্ধে দাবি উত্থাপন করে, ও সে যে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে এগিয়ে যায় তাকেই অপর প্রতিদ্বন্দ্বীর বিজয়ী করে। আমি প্রতিমাপূজা ও ঈশ্বরভক্তি, লাম্পট্য ও আত্মসংযম, ন্যায্যতা ও অন্যায্যতা, অহঙ্কার ও বিনম্রতা, এসমস্ত দ্বন্দ্বের কথাই বলছি, ও কল্পনাযোগ্য অন্যান্য যত দ্বন্দ্বের কথাও বলছি যার জন্য যে মিশরীয় সে হিব্রুর বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই করে।

১৫। নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে মোশি আমাদের শেখান, যেন তেমন যুদ্ধে আমরা সদ্‌গুণের পাশে আমাদের একজন স্বদেশীরই পাশে যেন স্থান নিই ও যে বিরোধী সদ্‌গুণকে আক্রমণ করত যেন তাকে হত্যা করি। কেননা ধর্মভক্তির বিজয় হল প্রতিমাপূজার মৃত্যু ও বিনাশ। একই প্রকারে, ন্যায্যতা দ্বারা অন্যায্যতাকে, ও বিনম্রতা দ্বারা অহঙ্কারকে হত্যা করা হয়।

[যাত্রা ২:১৩-১৫ দ্রঃ]

১৬। কিন্তু দু'জন স্বদেশীর মধ্যে সেই মারামারিও আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে; কেননা যদি ভ্রান্তিময় মতবাদ সত্যকার ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তার বিরোধিতা না করত তবে সেই জঘন্য ভ্রান্তমতগুলো প্রাধান্য পাবার স্থান পেত না। তবে, যেহেতু অনিষ্ট নিজের আক্রমণ দ্বারা জয়ী হয় ও সত্যের প্রাধান্য বিতাড়িত করে, সেজন্য, যা ন্যায্য তাকে বিজয় আরোপ করার জন্য যদি আমরা অতিরিক্ত দুর্বল হই, তাহলে দরকার আছে, বিবরণীর দৃষ্টান্ত অনুকরণ ক'রে, মহত্তর ও গভীরতর রহস্যাদি [ক] জানবার জন্য আমাদের এখান থেকে যত শীঘ্রই পালিয়ে যেতে হবে।

১৭। এবং যদি পুনরায় সেই বিদেশীর সঙ্গে জীবনযাপন করতে হয়, অর্থাৎ, যদি আমরা জাগতিক প্রজ্ঞার সঙ্গে সাহচর্য করতে বাধ্য হই, তাহলে, যারা অন্যায় ভাবে কুয়োগুলো ব্যবহার করত, সেই দুষ্ট রাখালদের দূর করে দেওয়ার পর অর্থাৎ যারা শিক্ষাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে সেই দুষ্ট শিক্ষকদের যুক্তি খণ্ডন করার পর, এসো, সেই জাগতিক প্রজ্ঞার সঙ্গে সাহচর্য করি।

১৮। এইভাবে, যারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তাদের সঙ্গে মেলামেশা না ক'রে ও তাদের মধ্যে শান্তিস্থাপক না হয়ে আমরা একাকী হয়ে জীবনযাপন করব, কিন্তু মেষগুলোর মত আমাদের প্রাণের সমস্ত প্রেরণা যুক্তির ঊর্ধ্বতর ইচ্ছার অধীনে বশীভূত ক'রে তাদেরই সঙ্গে জীবনযাপন করব যারা আমাদের ধারে মেষ চরায় অর্থাৎ যারা আমাদের একই মনোভাব ও একই ধারণার অধিকারী।

সেই জ্বলন্ত ঝোপ

১৯। এইভাবে শান্তিতে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়ে আমরা সতর্কতার সঙ্গে মেষপাল পালন করতে করতে, সত্য নিজের উজ্জ্বলতায় আমাদের প্রাণের চক্ষু উদ্ভাসিত করে আমাদের আলোকিত করবে (ক)। কেননা ঈশ্বর নিজেই হলেন সেই সত্য যা সেই অনির্বচনীয় ও অলৌকিক আলোকীকরণ (খ) দ্বারা সেসময় মোশির কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

[যাত্রা ৩:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

২০। এবং যে আলো নবীর প্রাণ আলোকিত করে, সেই আলো যদি কোন কাঁটাপূর্ণ ঝোপ থেকে জ্বলে ওঠে, তবে এ ব্যাপারটাও আমাদের অনুসন্ধানের জন্য অনুপযোগী নয়। কেননা যখন ঈশ্বর হলেন সত্য (ক), তখন সত্য হল আলো, এবং সুসমাচার এই উৎকৃষ্ট ও ঐশ্বরিক উপাধিসমূহ সেই ঈশ্বরেরই পক্ষ্যে সাক্ষ্য দেয় যিনি আমাদের কাছে মাংসে আত্মপ্রকাশ করেছেন; এর ফলে এটা দাঁড়ায় যে, সদ্‌গুণ অভিমুখে এ যাত্রা সেই আলো-জ্ঞানের দিকে চালনা করে যা মানবস্বরূপ পর্যন্ত নিজেকে অবনত করে; এ এমন আলো যা জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে স্থিত নানা বাতির একটা বাতি দ্বারা আলোকিত নয়, যেন এমনটা মনে না করা হয় যে, সেই আলো সেখানে উপস্থিত কোনও পদার্থ থেকে আগত একটা আলো; না, বরং সেই আলো এমন যা পার্থিব ঝোপ থেকে উৎপন্ন রশ্মিমালা দিয়ে আকাশের বাতিগুলো অতিক্রম করে।

২১। এ থেকে আমরা কুমারী সংক্রান্ত রহস্যও জানতে পারি, কারণ ঈশ্বরত্বের যে আলো কুমারীর প্রসব দ্বারা সেই কুমারী থেকে মানব জীবনের কাছে উদ্ভাসিত হল, সেই

আলো সেই জ্বলন্ত ঝোপ অক্ষত অবস্থায় রক্ষা করেছে, কেননা কুমারীত্বের ফুল প্রসবের ফলে ম্লান হয়নি।

২২। এই আলো থেকে আমরা জানতে পারি, সত্যের রশ্মিমালার অভ্যন্তরে অবস্থান করার জন্য আমাদের কী করণীয়, এবং এটাও জানতে পারি যে, যেখানে সত্যের আলো সন্দর্শন করা হয়, পায়ে জুতো পরে সেই উচ্চতার দিকে ছোটা সম্ভব নয়। কেননা প্রাণের পা সেই মরা ও পার্থিব চামড়ার আবরণ (ক) থেকে মুক্ত হওয়া চাই যা তখনই, সেই আদিতেই, প্রাণের স্বরূপকে জড়িয়ে নিয়েছিল যখন ঐশ্বরিক আদেশ অমান্য করার ফলে আমাদের উলঙ্গ করে রাখা হয়েছিল। আমরা তেমনটা করতে পারলে তবে সেই সত্য-জ্ঞান অর্জন করব যা আমাদের কাছে আপনা আপনিই নিজেকে প্রকাশ করবে। কেননা সত্ত্ব-জ্ঞান হল অসত্ত্ব সংক্রান্ত যত মতবাদ থেকে পরিশুদ্ধি।

২৩। এবং আমার মতে এটাই হল সত্য বিষয়ক সংজ্ঞা, তথা: সত্ত্ব-উপলব্ধিতে ভ্রান্ত না হওয়া। কেননা ভ্রান্তি হল অসত্ত্ব সংক্রান্ত এমন কল্পনা যা আমাদের উপলব্ধি-শক্তিতে গড়ে ওঠে, কেমন যেন যা অস্তিত্বশীল নয় তা বাস্তব অস্তিত্বশীলতার অধিকারী। কিন্তু না, সত্য বরং হল, যা বাস্তবে ‘আছে’ (ক), সেবিষয়ে নিশ্চিত উপলব্ধি। তাই একজন লোক কেবল গভীর ধ্যান-অনুধ্যানে শান্তশিষ্ট ভাবে অনেক সময় অতিবাহিত করার পরেই, যা ‘আছে’ তা যে প্রকৃতপক্ষে কী, অর্থাৎ সত্ত্বের যা স্বরূপগত ভাবে অধিকারী, তা যথেষ্ট কাঠিন্য সহকারে বুঝতে পারবে; এবং অসত্ত্ব যে কী, অর্থাৎ যা কেবল বাহ্যিক চেহারায় অস্তিত্বশীল কিন্তু নিজ থেকে বাস্তবতাহীন স্বরূপের অধিকারী, তাও বুঝতে পারবে।

২৪। আমার মনে হয়, সেই মহান মোশি ঐশদর্শন (ক) দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে এটা শিখেছিলেন যে, যা কিছু স্পর্শন দ্বারা উপলব্ধ ও উপলব্ধি-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত, সেই সমস্ত কিছুর একটাও বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয়, এবং যার উপর বিশ্ব নির্ভর করে, কেবল বিশ্বের সেই সর্বোচ্চ কারণটাই বাস্তবে অস্তিত্বশীল।

২৫। কেননা যদি ভাবনা জীবদের মধ্যে অন্য কিছুও ভাবে, তবু যুক্তি কোনও জীবের মধ্যে এমন কোনও স্বনির্ভরশীলতা চিনে নেয় না, যার ফলে সেই জীবের পক্ষে সত্ত্বের সত্তার অংশী না হলেও (ক) অস্তিত্বশীল হতে পারে। কোনও ঘাটতি ও কোনও বাড়তি

ছাড়া সবসময় নিজের সমান হওয়া, আরও ভাল বা আরও মন্দতে কোনও রূপান্তরের অধীন না হওয়া (কেননা যা সবসময় নিজের সমান, তা 'আরও মন্দ' এর বহির্ভূত, ও 'আরও ভাল' বলতে তা কোনও কিছুই মানে না), আদৌ অন্য কিছুর প্রয়োজনে না হওয়া, সকলের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় ও সকলের দ্বারা অংশীভূত হওয়া ও সেইসঙ্গে কারও অংশভাগিতা দ্বারা হ্রাসীকৃত না হওয়া : এটাই সেই সত্যিকারের 'আছে' যা বাস্তবে 'আছে' ; এবং তেমনটা উপলব্ধি করাই হল সত্যজ্ঞান।

২৬। যেমন সেসময় মোশি এই বাস্তবতায় নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন, তেমনি আজ সে-ই করে যে সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পার্থিব আধার ত্যাগ করে ও ঝোপ থেকে আগত আলো লক্ষ করে অর্থাৎ সেই রশ্মি লক্ষ করে যা কাঁটায় ভরা এ মাংসের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে জ্বলে ও সুসমাচারের কথা অনুসারে তা হল সত্যকার আলো ও সত্য (ক) ; তবেই এই ব্যক্তি এমন হয়ে ওঠে যে অন্যান্যদের পরিত্রাণের জন্য (খ) নিজেই যথেষ্ট, জঘন্য ভাবে প্রভুত্ব চালায় যে স্বৈরশাসন, সে তা ধ্বংস করে, কঠোর দাসত্ব থেকে অত্যাচারিতদের মুক্তি সে আদায় করে। ডান হাতের যে পরিবর্তন হয়েছিল ও লাঠি যে সাপে রূপান্তরিত হয়েছিল, এ দু'টো কাজ হল পরবর্তী যত বিস্ময়কর কাজের সূচনা (গ)।

২৭। কেননা আমার মনে হয়, এ বিস্ময়কর কাজ দু'টো আবৃত ভাবে সেই রহস্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যা দ্বারা, প্রভুর মাংসের মধ্য দিয়ে সেই ঈশ্বরত্ব মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন যাঁ গুণে স্বৈরশাসন ধ্বংসিত হল, ও যত মানুষ সেই স্বৈরশাসন দ্বারা অত্যাচারিত ছিল তারা সবাই মুক্তিতে চালিত হল।

২৮। নবীদের ও সুসমাচারের নানা সাক্ষ্যবাণী এই ব্যাখ্যার দিকে আমাকে প্রভাবান্বিত করে। কেননা নবী বলেন, *এটা হল পরাৎপরের ডান হাতের পরিবর্তন* (ক), কারণ যা অপরিবর্তনশীল বলে গণিত, মানব স্বরূপের দুর্বলতার প্রতি করুণার খাতিরে সেই ঐশ্বরিক স্বরূপ আমাদের রূপ ও বাহ্যিক চেহারা অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করেছে।

২৯। কেননা সেসময়ে বিধানকর্তার হাত বুকে দেওয়া হলে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ রঙ ধারণ ক'রে তার পরিবর্তন হয়েছিল, ও পুনরায় বুকে দেওয়া হলে তার স্বীয় ও প্রকৃতিগত

সৌন্দর্যে ফিরে গিয়েছিল। এবং *‘সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর যিনি পিতার বুকে বিরাজমান’* [ক], তিনিই হলেন পরাৎপরের ডান হাত।

৩০। যখন তিনি সেই বুক থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন আমাদের বাহ্যিক চেহারা অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করলেন; কিন্তু আমাদের দুর্বলতাকে সুরক্ষিত স্থানে রাখবার পর যখন তিনি, তাঁর যে হাত আমাদের মাঝে ছিল ও আমাদের হাতের রঙ ধারণ করেছিল, সেই হাত পুনরায় তাঁর বুকে ফিরিয়ে আনলেন (ডান হাতের বুক হলেন স্বয়ং পিতা), তখন নিজের স্বরূপের আবেগহীনতা আবেগসাপেক্ষতায় পরিবর্তন করলেন না, কিন্তু, যা অপরিবর্তনশীল তার সঙ্গে অংশভাগিতা গুণে, যা ছিল পরিবর্তনশীল ও আবেগসাপেক্ষ, তিনি তা আবেগহীনতায় [ক] রূপান্তরিত করলেন।

৩১। সেই সাপের [ক] রূপান্তর খ্রিষ্টের বন্ধুদের কম্পিত না করুক, কেননা আমরা রহস্যের অর্থ এই জন্তুর জন্য উপযোগী করতে পারি যা আপাত দৃষ্টিতে অর্থের সঙ্গে কোন মিল রাখে না। কেননা সুসমাচারের বাণী দ্বারা স্বয়ং সত্য এই রূপক অস্বীকার করেন না, বাস্তবিকই তিনি বলেন, *এবং মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে* [খ]।

[আদি ৩:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

৩২। অর্থ স্পষ্ট। কেননা যখন পবিত্র শাস্ত্র দ্বারা সাপ পাপের পিতা বলে অভিহিত হল, ও যা কিছু সাপ থেকে সঞ্জাত তা নিঃসন্দেহে সাপ, তখন এটা দাঁড়ায় যে, পাপ তারই একই নাম বহন করে যে তাকে জন্ম দিয়েছে। কিন্তু প্রেরিতদূতের বাণী এমনটা ঘোষণা করে যে, আমাদের পাপী অবস্থা ধারণ করেছেন বিধায় প্রভু আমাদের পক্ষে পাপ হয়েছেন [ক]; তাই আবৃত প্রতীক যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রভুর বেলায় উপযোগী।

৩৩। কেননা যখন সাপই তো পাপ, ও প্রভু পাপ হলেন, তখন এসম্পর্ক যা তুলে ধরে তা সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া উচিত; কেননা প্রভু পাপ হয়ে গিয়ে সেই সাপ হলেন যা পাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়; কিন্তু তিনি আমাদের পক্ষে সাপ হন যেন মিশরীয়দের সাপগুলো তথা মন্ত্রজালিকদের বানানো সেই সাপগুলোকে গ্রাস ও বিনাশ করতে পারেন।

৩৪। তেমনটা করার পরে তিনি নিজেকে পুনরায় লাঠিতে রূপান্তরিত করেন, সেই যে লাঠি দিয়ে পাপীরা দণ্ডিত হয় কিন্তু তারা স্বস্তি পায় যারা সদ্‌গুণের খাড়া ও কঠিন যাত্রা করে, কেননা তারা বিশ্বাস-লাঠির শুভ প্রত্যাশার উপর ভর করে; কেননা '*বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার ভিত্তি*' (ক)।

৩৫। যে কেউ এসমস্ত রহস্য তন্ন তন্ন বিবেচনা করেছে, যারা সত্যের বিরোধিতা করে, যারা এই মর্ত ও অবাস্তব মায়াময় ব্যাপার অসার বিষয় বলে বিহ্বল হয়ে লক্ষ করে, সে তাদের সামনে একটা ঈশ্বর হয়। কেননা ফারাও বলে, *এ কে যে আমি তার কণ্ঠে কান দেব? আমি প্রভুকে জানি না* (ক)। যা কিছু বিচারশক্তিহীন ইন্দ্রিয়গুলোর অধীনে রয়েছে, তার মধ্যে যা জড় ও মাংসময় তা-ই মাত্র সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য।

৩৬। তাই, যদি একজনকে আলোর উজ্জ্বলতা দ্বারা বলবান করা হয়ে থাকে ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে তত শক্তি ও অধিকার গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে প্রশিক্ষকের পরিচালনায় লড়াইতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত একটা প্রতিযোগীর মত এবার সাহস ও ভরসা ভরে লাঠি হাতে করে অর্থাৎ যা দিয়ে সে মিশরীয় সাপগুলোকে জয় করবে সেই বিশ্বাসের ধর্মতত্ত্ব হাতে করে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সম্মুখীন হোক।

৩৭। তার পিছনে চলবে সেই বিদেশিনী স্ত্রী (ক)। কেননা জাগতিক কৃষ্টিতেও একটা অংশ রয়েছে, সদ্‌গুণ জন্মাবার লক্ষ্যে যার সঙ্গে মিলিত হতে আমাদের অস্বীকার করতে নেই। কেননা নীতি ও প্রকৃতি বিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা ঊর্ধ্বতর জীবনের লক্ষ্যে আমাদের স্ত্রী, বন্ধু ও সঙ্গিনী হতে পারবে, যদিও এতে সতর্ক থাকা চাই যেন তার যত প্রসব দূষণের মত বিদেশী কিছুই না আনে।

৩৮। কেননা, ক্ষতিকর ও অশুচি সবকিছু যাতে বাতিল করা হয় যদি এ দূষণ পরিচ্ছেদিত করা না হয় ও সরিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে দূত এগিয়ে আসেন ও আমাদের অন্তরে মৃত্যু-আতঙ্ক সঞ্চার করেন; কিন্তু সেই স্ত্রী এটা দেখিয়ে যে, যে চিহ্ন দ্বারা একজনকে বিদেশী বলে চেনা যায়, ছেলে থেকে সেই চিহ্ন একেবারে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধায় নিজের ছেলে শুচি, তাতে সে দূতকে প্রশমিত করে।

৩৯। আমি মনে করি, যে কেউ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য রহস্যাবৃত দীক্ষা গ্রহণ করেছে, আমরা যা কিছু বলে এসেছি, তা থেকে তার কাছে সদ্‌গুণ অনুযায়ী অগ্রগতি ক্ষেত্রে অনুক্রম ও সুসঙ্গতি স্পষ্ট হবেই; এ এমন কিছু যা, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোতে নিহিত প্রতীকের সংযোজনকে বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ ক'রে আলোচনাটা প্রমাণিত করে। কেননা তত্ত্ববিদ্যা জনিত শিক্ষায় মাংসময় ও অপরিচ্ছেদিত এমন কিছু রয়েছে যা একবার সরানো হলে তবে বাকি সবকিছু সম্পূর্ণরূপে শুচিতম ইস্রায়েলীয় জাতি বলে প্রকাশ পায়।

৪০। উদাহরণ স্বরূপ, জাগতিক তত্ত্ববিদ্যাও প্রাণকে অমর বলে ঘোষণা করে, এবং এটা ভাল প্রসূত সন্তানই বটে; কিন্তু প্রাণকে এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তর করা ও সেই প্রাণকে বিচারশক্তিসম্পন্ন স্বভাব থেকে বিচারশক্তিহীন স্বভাবে রূপান্তরিত করা, তা মাংসময় ও বিদেশী অপরিচ্ছেদন বৈকি। এক্ষেত্রে এধরনের বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারত। তত্ত্ববিদ্যা ঘোষণা করে, ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁকে জড় বলে মনে করে; তত্ত্ববিদ্যা তাঁকে স্রষ্টা বলে মানে, কিন্তু এটাও বলে যে, যাতে তিনি সৃষ্টি করতে পারেন তাঁর পক্ষে মাল দরকার; তত্ত্ববিদ্যা তাঁকে মঙ্গলময় ও পরাক্রমী বলে মান্য করে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে দৈবের আবশ্যকতার অধীন করে।

৪১। এবং বিশিষ্ট নানা সমস্যা ক্ষেত্রে একজন বুঝাতে পারত কেমন করে জাগতিক তত্ত্ববিদ্যার কাছে কতগুলো যথার্থ ধর্মতত্ত্ব এমন অপ্রাসঙ্গিক সংযোজন দ্বারা দূষিত যেগুলো সরিয়ে দিলে ঈশ্বরের দূত কেমন যেন এ ধর্মতত্ত্বগুলোর প্রকৃত সন্তান নিয়ে উল্লসিত হয়ে আমাদের প্রতি প্রশমিত হন।

আরোনের সঙ্গে মোশির সাক্ষাৎকার

[যাত্রা ৪:২৭ দ্রঃ]

৪২। কিন্তু আলোচনার পরবর্তী অংশে ফিরে যাওয়া দরকার, কারণ সেই আমরা যারা মিশরীয়দের কাছাকাছি এগিয়ে যাচ্ছি, ভাইয়ের সাহায্য সেই আমাদেরও কাছে এগিয়ে আসে। কেননা আমাদের এটা মনে পড়ে যে, সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের প্রারম্ভে মোশির শত্রুময় ও মারামারি বিশিষ্ট একটা সাক্ষাৎ হয়, প্রথমে একারণে যে, একজন

মিশরীয় একজন হিব্রুকে অত্যাচার করছিল, এবং পরে একারণে যে, একজন হিব্রু স্বদেশী একজনের সঙ্গে ঝগড়া করছিল।

৪৩। অন্যদিকে, দীর্ঘকালীন মনোনিবেশ গুণে ও পর্বতচূড়ায় পাওয়া ঐশ্বরিক আলোকীকরণ গুণে যে কেউ প্রাণ-সিদ্ধীকরণে অধিক উত্তোলিত, ভাইয়ের সঙ্গে তার বন্ধুসুলভ ও শান্তিপূর্ণ সাক্ষাৎ হয়, কারণ সেই ভাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ঈশ্বর দ্বারা প্রভাবান্বিত। কেননা, যদি আমরা ঐতিহাসিক ঘটনার রূপকবিশিষ্ট ব্যাখ্যায় উত্তরণ করি, তাহলে আমরা সেই ঘটনায় কোনও কিছুই পাব না যা আমাদের লক্ষ্যের পক্ষে উপযোগী নয়।

৪৪। প্রকৃতপক্ষে, যে কেউ সদ্‌গুণে অগ্রসর হয়, তার সঙ্গে সেই সাহায্যও যোগ দেয় যা ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতিকে দান করেন, সাহায্যটা এমন যা উৎপত্তির দিক দিয়ে আমাদের পক্ষে পূর্ববর্তী, কিন্তু সেই সাহায্য তখনই মাত্র নিজেকে প্রকাশ করে ও নিজেকে জ্ঞাত করে যখন আমরা মনোনিবেশ ও নিষ্ঠতা গুণে ঊর্ধ্ব জীবনের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করে আরও কঠোর লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে উদ্যত হই।

৪৫। কিন্তু, যাতে প্রহেলিকা দ্বারা প্রহেলিকা বুঝাতে চেষ্টা না করা হয়, আমি এ পদের অর্থ আরও স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপন করব। পিতৃগণ থেকে আগত একটা বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরা (ক) এটা বলে যে, যখন আমাদের স্বরূপ পাপে লিপ্ত হল, তখন ঈশ্বর এমনটা হতে দিলেন না, আমাদের পতন তাঁর দূরদৃষ্টির সাহায্য বিহীন থাকবে, কিন্তু এক একজনের জীবনের সাহায্যে সেই দূতদের একজনকে নিযুক্ত করলেন যাঁরা তাঁর বিধান ক্রমে অশরীরী স্বরূপের অধিকারী ছিলেন। এর বিপরীতে, আমাদের স্বরূপের সংহারক একই প্রকারে বিরোধিতাই করল, কেননা সে জঘন্য ও অমঙ্গলকারী একটা অপদূত দ্বারা মানুষের জীবন নষ্ট করতে বসল।

৪৬। সেই দু'টোর মধ্যে স্থিত যে মানুষ, সে নিজের সম্মতি ক্রমে সেই দু'জনের একজনেরই প্রকল্পকে জয়ী করে, সেই যে দু'জন একের প্রকল্প দ্বারা অন্যের প্রকল্পের বিরোধিতা করার জন্য মানুষকে অবিরতই অনুসরণ করে থাকে; তাই মঙ্গলকর সঙ্গী যুক্তি দ্বারা মানুষকে সদ্‌গুণের সেই মঙ্গল বিষয়গুলো দেখান যা ন্যায়বানেরা প্রত্যাশায় দর্শন করে, একই সময় অপরজন সেই সমস্ত জড় আমোদপ্রমোদ দেখায় যেখানে

মঙ্গলকর কোনও প্রত্যাশা নেই, এমনকি বর্তমান যে আমোদপ্রমোদ মানুষ ভোগ করে ও স্বচক্ষে দেখতে পায়, তা মূর্খ মানুষদের ইন্দ্রিয়গুলোকে বন্দি করে তোলে।

৪৭। তখন, যে যে আমোদপ্রমোদ আমাদের লোভ দেখায়, মানুষ যদি যুক্তি সহকারে যা শ্রেয় তার দিকে ফিরে সেই আমোদপ্রমোদ থেকে দূরে সরে যায়, অর্থাৎ, বলতে গেলে, মানুষ যদি রিপুকে পিঠ দেখিয়ে নিজের প্রাণ আয়নার মতই যেন এমনভাবে সম্মুখে রাখে যাতে প্রাণ মঙ্গলময় প্রত্যাশার দিকে ফিরে তাকায় যাতে করে সে নিজের প্রাণের শুচিতায় ঈশ্বরের দেখানো সদ্‌গুণের সমস্ত প্রতিমূর্তি ও প্রতিবিম্ব খোদাই করতে পারে, তবেই ভাইয়ের সাহায্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এগিয়ে আসে ও তার সহায়তা করে। কেননা, যে দূত, যিনি (যেমন বলা হয়েছে) সেসময় আবির্ভূত হন ও আমরা ফারাওর কাছে এগিয়ে যেতে যেতে আমাদের সাহায্য করেন, সেই দূতকে, একপ্রকারে, যুক্তিসঙ্গত ও আধ্যাত্মিক অর্থে, মানুষের প্রাণের ভাই বলে গণ্য করা যেতে পারে।

৪৮। যাই হোক না কেন, কেউই যেন না ভাবে যে, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর বিবরণী ধারণার এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অনুক্রমের সঙ্গে এমন সূক্ষ্ম মিল রাখে, যার ফলে সে যখন দেখে, বিবৃত ঘটনাগুলোর কয়েকটা এই ব্যাখ্যা থেকে বাদ পড়ে, তখন এই ভিত্তিতে সে ব্যাখ্যাটা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। বরং, যে লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আমরা এসমস্ত বিষয় ব্যক্ত করছি, সে সবসময় আমাদের আলোচনার সেই লক্ষ্য মনে রাখুক; ইতিমধ্যে আমরা আগে থেকেই, সেই মুখবন্ধেই, এটা বলেছিলাম যে, উৎকৃষ্ট মানুষদের জীবনী পরবর্তীকালের মানুষদের জন্য সদ্‌গুণের দৃষ্টান্ত বলে উপস্থাপিত হয়েছে।

৪৯। সুতরাং, যারা তাঁদের কর্মকীর্তির অনুকরণ করতে ইচ্ছুক, যেহেতু তাদের পক্ষে ঘটনাবলির একই অরণ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়—কেননা কেমন করে সেই জনগণকে পুনরায় পাওয়া যেতে পারে যারা মিশরে স্থানান্তরের ফলে বৃদ্ধি পায়? কেমন করে সেই স্বৈরশাসককে পাওয়া যেতে পারে যে তাদের অত্যাচারী ও পুত্রসন্তানদের বিরোধী, কিন্তু একাধারে এমনটা দেয় যেন যে লিঙ্গ বেশি দুর্বল ও নম্র সেই লিঙ্গ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়? এবং বিবরণীতে যত ঘটনা অন্তর্ভুক্ত তত ঘটনাগুলোর জন্য একই

কথা প্রয়োজ্য—সুতরাং, খোদ ঘটনাগুলোর ভিত্তিতে যেহেতু দেখা গেল, সেই সুখী মানুষদের আশ্চর্য কর্মকীর্তি অনুকরণ করা সম্ভব নয়, সেজন্য, যে যে ঘটনাগুলো উপযোগী, কেবল সেগুলোকেই বাহ্যিক শ্রেণি থেকে নৈতিক শিক্ষায় স্থানান্তর করা দরকার, কেননা যারা সদ্‌গুণের অন্বেষণ করে, এধরনের জীবনের জন্য কেবল সেই ঘটনাগুলো থেকেই তাদের কাছে সাহায্য আসতে পারে।

৫০। কিন্তু এমনটা অনিবার্য হলে যে, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর কয়েকটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অনুক্রম ও সঙ্গতির বাইরে পড়ে, তাহলে আমরা সেগুলো আমাদের বক্তব্যের লক্ষ্যের পক্ষে অনুপযোগী ও মূল্যহীন বলে বাতিল করব, এবং এইভাবে আমাদের পক্ষে অন্যান্য ঘটনাগুলোতে সদ্‌গুণ সংক্রান্ত বর্ণনা বন্ধ না করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

৫১। আমি আরোন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা লক্ষ করেই এ প্রাথমিক নিয়মগুলো ব্যক্ত করছি যাতে পরবর্তী একটা ঘটনা বিষয়ক একটা অভিযোগ আগে থেকে সমাধান করতে পারি। কেননা সেই দূত যে অশরীরী ও আত্মিক দিক দিয়ে প্রাণের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক রাখেন, অথবা, সেই দূতের উৎপত্তি যে আমাদের সৃষ্টির পূর্বকালীন, অথবা, যারা বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে, সেই দূত যে তাদের সহায়তা করেন, এসমস্ত বিষয়ে একজন বলতে পারে যে, এসবকিছু মেনে নিতে সে সম্মত। কিন্তু, ব্যাখ্যা যে এসমস্ত কিছুর প্রতীক হিসাবে আরোনকে বেছে নেবে, তাতে সে অসম্মত, কেননা আরোন ইস্রায়েলীয়দের প্রতিমাপুজায় চালিত করেছিলেন।

৫২। যে ব্যক্তি এই অভিযোগ তোলে আমরা বিবরণীর অনুক্রম আগে থেকে উপস্থাপন ক'রে যা ইতিমধ্যে বলেছি তাতে উত্তর দেব, যথা, যা আমাদের লক্ষ্যের বাইরে তা সেটার পক্ষে অন্যান্য ঘটনাগুলোর সঙ্গতি অস্থির করতে নেই, এবং যদিও এক ও একই নাম ভাইকে ও দূতকে নির্দেশ করে, তবু সেই নামগুলোর প্রত্যেকটা নামের জন্য পরস্পর বিরোধী অর্থ উপযোগী করা হয়।

৫৩। কেননা কেবল ঈশ্বরের শুধু নয়, শয়তানেরও দূত উল্লিখিত [ক], এবং যে ভাল তাকে শুধু নয়, যে মন্দ তাকেও আমরা ভাই বলি। বাস্তবিকই শাস্ত্র ভাল ভাইদের সম্পর্কে বলে, *দুর্দশার দিনে ভাইয়েরা তোমার উপযোগী হতে পারে* [খ], ও মন্দ ভাইদের সম্পর্কে বলে, *প্রত্যেক ভাই পায়ের গোড়ালিতে চক্রান্ত করবে* [গ]।

মুক্তি সংবাদ

[যাত্রা ৪:২৯ দ্রঃ]

৫৪। আলোচনার অনুক্রম সংক্রান্ত এ প্রাথমিক নিয়মগুলো ব্যক্ত করার পর, এবং এ বিষয়ের গভীরতর পরীক্ষা যথাস্থানে স্থগিত করার পর, এসো, যে বিষয় আমাদের হাতে রয়েছে, এখন সেটা নিয়ে ব্যস্ত হই। তাঁর কাছে আবির্ভূত আলো দ্বারা পরাক্রমী হয়ে উঠে ও এই ভাইকে মিত্র ও সহায়ক বলে গ্রহণ করে মোশি জনগণের কাছে সাহসের সঙ্গে মুক্তির কথা বলেন, পিতৃগণের বংশমর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেন, ও কাদামাটি ও ইটের পিড়ন থেকে কেমন করে রেহাই পেতে হবে সেবিষয়ে পরামর্শ দেন।

৫৫। কিন্তু এসমস্ত বিষয় দিয়ে বিবরণী আমাদের কী শিক্ষা দেয়? শিক্ষা এ, জনগণের মধ্যে কথা বলার জন্য যে কেউ উপযোগী শিক্ষা দ্বারা নিজের কথা বলা ক্ষেত্রে নিজেকে প্রস্তুত করেনি, তার পক্ষে প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য হাজির হওয়া উচিত নয়। কেননা তুমি কি এটা দেখতে পার না যে মোশি এপর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতায় বেড়ে ওঠার আগে যখন যুবক ছিলেন, তখন, যে দু'জন ঝগড়া করছিল, তারা তাঁকে অগ্রাহ্য শান্তিস্থাপক বলে গণ্য করেছিল? কিন্তু এখন তিনি হাজার হাজার লোকদের সামনে ্ একভাবেই কথা বলেন, কেমন যেন বিবরণী স্পষ্টতার সঙ্গে শুধু এটাই বলত যে, তুমি যদি অধিক মনোনিবেশ দ্বারা এক্ষেত্রে অধিকার অর্জন করে না থাক তবে শ্রোতাদের শিক্ষা ও পরামর্শ দেবার দুঃসাহস করো না।

৫৬। কিন্তু আরও বেশি উপযোগী বাণী উচ্চারণ করার পর, মুক্তি দেখাবার পর, ও সেই মুক্তি বাসনা করার জন্য শ্রোতাদের উৎসাহিত করার পর, শুধু তখনই শত্রু জ্বলে ওঠে, ও যারা মোশির কথা শুনছিল তাদের কষ্ট বৃদ্ধি করে। এই বিষয়ও আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত নয়।

কেননা যারা স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির আহ্বান গ্রহণ করে ও সেই বাণীকে আঁকড়িয়ে ধরে, তারা অনেকেই এখনও বিরোধীর দ্বারা প্রলোভনের আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন।

৫৭। তাদের মধ্যে অনেকে, বিশেষভাবে তারা যারা উৎপিড়কদের আক্রমণের ফলে যথেষ্ট শক্ত হয়েছে, বিশ্বাসে নিজেদের অধিক দৃঢ় ও সক্ষম দেখায়; অন্যদিকে, দুর্বলদের মধ্যে কয়েকজন সেই আক্রমণে হার মানে, তারা সেই আক্রমণের সামনে এটা ঘোষণা

করে যে, এই উদ্দেশ্যে তেমন কষ্টের অধীন হওয়ার চেয়ে তাদের পক্ষে মুক্তি সংবাদে বধির থাকা বেশি উপযোগী।

৫৮। দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে দিতে যারা ইস্রায়েলীয়দের আহ্বান করছিল, যারা তাদের অভিযুক্ত করেছিল, সেই ইস্রায়েলীয়দের অল্প সাহসের জন্য তা সেসময়ও ঘটেছিল। কিন্তু এজন্য যে তাদের বাণী মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করা বন্ধ করবে তা নয়, যদিও যে কেউ এখনও শিশুতুল্য, অনভিজ্ঞ ও মনে অপক্ক, সে অনভিজ্ঞতার জন্য প্রলোভনের সামনে ভয় পায়।

৫৯। কেননা সেই অনিষ্টকারী ও ধ্বংসকারী দিয়াবল মানুষদের বিরুদ্ধে ব্যস্ত থাকে, যারা পরাধীন তারা যেন স্বর্গের দিকে না তাকায় কিন্তু মাটির দিকে, নিচেই, অবনত থাকে ও কাদামাটি দিয়ে ইট তৈরি করে। কেননা সকলের কাছে এটা স্পষ্ট যে, পেটুকতা ও ভোজনবিলাসই একজনের কাম্য হোক, ধন-ঐশ্বর্যই একজনের লক্ষ্য হোক, যা কিছু জাগতিক তৃপ্তির বিষয়, তা সবই মাটি ও জল থেকে আগত।

৬০। সেই মাটি ও জলের মিশ্রণে যা হয়, তা কাদামাটি, ও কাদামাটি নামে অভিহিত; এবং যত মানুষ পার্থিব আমোদপ্রমোদের অন্বেষণে তাতে নিজেদের পূর্ণ করে, তাদের মধ্যে যে স্থান সেই আমোদপ্রমোদ গ্রহণ করে তারা সবাই সেই উদার স্থান কখনও পূর্ণ করে রাখতে পারে না, কিন্তু অবিরতই পূর্ণ করা হয়েও স্থানটা, সেখানে যা নতুন করে ঢুকতে থাকে তা গ্রহণ করার জন্য পুনরায় খালি হয়ে যায়। কেননা ইট-প্রস্তুতকারক যেমন সেই ছাঁচের মধ্যে সবসময় কাদামাটি ফেলে যে ছাঁচ অবিরতই খালি হয়, তেমনি, আমি মনে করি, সেই মানুষ হয় যে প্রাণের অভিলাষী অংশের দিকে তাকায়, এবং এতে এ অস্পষ্ট প্রতীকের অর্থ সহজে স্পষ্ট হয়।

৬১। কেননা যে কেউ নিজের অন্বেষার বস্তু দিয়ে নিজের বাসনা পূরণ করে, তারপর যখন বাসনা অন্য বস্তুর দিকে ফেরে, তখন সেই বাসনা ক্ষেত্রে সে নিজেকে আবার শূন্যই পায়; এবং আমাদের মধ্যে এ প্রক্রিয়া কখনও থামে না যতক্ষণ না আমরা বস্তুগত জীবন থেকে নিজেদের মুক্ত করে দিই।

৬২। এবং যে খড়কুটো তা থেকে উৎপন্ন হয় সেই ক্ষেত্রে, ও যে কেউ স্বৈরশাসকের আদেশের অধীন হয়ে তা ইটের সঙ্গে মেশাতে বাধ্য, সেই খড়কুটো আমরা ঐশ্বরিক

সুসমাচারের ও প্রেরিতদূতের গভীর বাণীর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করি (ক), কারণ উভয়ই একই ভাবে খড়কুটোটা আগুনের ইন্ধন বলে ব্যাখ্যা করে।

দশ আঘাত

[যাত্রা ৭:১০-১২ দ্রঃ]

৬৩। সুতরাং, যে কেউ সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট, যারা ভ্রান্তির বশে নিজেদের বশীভূত করেছে, সে যখন প্রজ্ঞাময় ও মুক্ত জীবনে তাদের আকর্ষণ করতে ইচ্ছা করে, তখন, প্রেরিতদূতের কথামত (ক), নানা ছলচাতুরি নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করে, সে ঐশবিধানের জায়গায় চালাকির ফন্দি-ফিকির উপস্থাপন করতে জানে। আমি মিশরীয়দের সাপগুলো অর্থাৎ মোশির লাঠি দ্বারা নিঃশেষিত সেই ফন্দি-ফিকিরের বিবিধ চালাকির কথা বিবেচনা করেই একথা বলছি, এবং যতখানি সমুচিত ছিল, আমরা সেই অনুসারে এবিষয়ে যথেষ্ট মন্তব্য উপস্থাপন করে এসেছি।

৬৪। সেজন্য, যে কেউ সদ্‌গুণের অপরাজেয় এই লাঠির অধিকারী যা সমস্ত মিথ্যা লাঠি ধ্বংস করে, সে সেই পথ দিয়ে রীতিমত এগিয়ে চলে যা মহত্তর বিস্ময়কর কাজে চালনা করে। কিন্তু যারা দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত, তাদের আশ্চর্যান্বিত করার জন্যই যে সে সেই কাজগুলো সম্পাদন করে তা নয়, কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাবে তাদেরই উপকারিতা লক্ষ করেই সে সেই সবই করে, কেননা সদ্‌গুণের বিস্ময়কর কাজ দ্বারা, যা শত্রুময় সে তা দূর করে দেয় ও যা কিছু তার নিজের বংশগত, সে তা সাহায্য করে।

৬৫। সুতরাং, এসো, আধ্যাত্মিক অর্থ লক্ষ ক'রে সর্বপ্রথমে প্রতিটি বিস্ময়কর কাজের সাধারণ লক্ষ্য শিখে নিই, তবেই ধারণাটা ধারাবাহিক ভাবে এক একটা বিস্ময়কর কাজের জন্যও উপযোগী করে তুলতে পারব। কেননা যারা ঐশ্বরিক বাণীকে গ্রহণ করে নেয়, সত্য সংক্রান্ত শিক্ষা তাদের মনোনিবেশ অনুযায়ী বিবিধ ধরনের ফল ফলায়। কেননা যদিও সেই শিক্ষা, যা মঙ্গল ও যা মন্দ, তা সকলের কাছে একইভাবে প্রমাণ করে, তবু যার মনোনিবেশ সেই প্রমাণের প্রতি উন্মুক্ত, সে মনে আলোকিত হয়; অপরদিকে, যে বিপরীত ধরনের মনোনিবেশের অধিকারী ও প্রাণ দিয়ে সত্যের রশ্মির দিকে তাকাতে অস্বীকার করে, সে ভ্রান্তির অন্ধকারে থেকে যায়। এবিষয়ে আমাদের এ

সাধারণ ধরনের যুক্তি সঠিক হলে, তবে যখন বাকি বিস্ময়কর কাজগুলো একটার পর একটা বিবেচনা করব তখন অবশ্যই একই সঠিক ফলাফল পাব, কারণ এক একটা উপবিষয়ের বিশ্লেষণ সাধারণ প্রমাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

[যাত্রা ৭:২০ দ্রঃ]

৬৬। এজন্য, যে সমস্ত অমঙ্গল মিশরীয়দের আঘাত করছিল, বিজাতীয়দের মাঝে বাস করা সত্ত্বেও হিব্রু যে সেই সমস্ত অমঙ্গল থেকে অক্ষত হয়ে থেকেছিল তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ দেখা যেতে পারে যে আজও ঠিক তাই ঘটে। কেননা বড় বড় শহরে নাগরিকেরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মতত্ত্ব পালন ক'রে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত: বিশ্বাসের উৎস থেকে উৎসারিত জল কয়েকজনের কাছে পান করার যোগ্য ও স্বচ্ছ, এবং তারা ঐশশিক্ষা দ্বারা সেই জল তুলে আনে; অপরদিকে অন্য কেউ আছে যারা ভ্রান্তমতের কারণে মিশরীয়দের মত ব্যবহার করে, ও এদের জন্য জল দূষিত রক্ত হয়।

৬৭। এমনকি, ভ্রান্তির দূষণ দ্বারা চালাকির জাদু প্রায়ই হিব্রুদের পানীয়কে রক্তে পরিণত করতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ আমাদেরও কাছে সেই জাদু এমনটা দেখাতে চায় যে, আমাদের ধর্মতত্ত্ব যা, তা আসলে তা নয়; কিন্তু চালাকি হাতিয়ার করে সেই জাদু যদিও জলের উপরিভাগ লাল করে, তবু সমস্ত জল অব্যবহার্য করতে পারে না। কেননা, সেই জল বিষয়ে বিরোধীরা এমন অপবাদ রটিয়ে বেড়ায় যা অনেকের মন জয় করতে পারে, তবু হিব্রু মানুষ চালাকির বাহ্যিক চেহারায় মনোযোগ না দিয়ে সত্যকার জল খেতে থাকে।

[যাত্রা ৮:২ দ্রঃ]

৬৮। একই কথা সেই বেঙের বেলায়ও প্রযোজ্য, সেই যে বেঙ-জাত ঘৃণ্য ও উচ্চরবকর, যার জীবনধারণ উভয়চর, যার হাঁটাফেরা লম্ফমান, যা দেখতে শুধু বিশ্রী নয় কিন্তু চামড়ার জন্য ঘ্রাণেও দুর্গন্ধময়, যা মিশরীয়দের বাসায়, খাটে ও ভাণ্ডারঘরে অনুপ্রবিষ্ট হয় কিন্তু হিব্রুদের জীবনধারণ আক্রমণ করে না।

৬৯। কেননা সত্যিই, অনিষ্টের ফল বেঙ-জাতের ফলের মত, তা মানুষদের জঘন্য অন্তর থেকে অথৈ জলাশয় থেকেই যেন জন্ম নেয়। এ বেঙগুলো তাদেরই ঘরে বাস করে যারা মিশরীয়দের মত জীবনযাপন করতে বেছে নিয়েছে। এ বেঙগুলো খাবার টেবিলেও

দেখা দেয়, খাটকেও রেহাই দেয় না ও সেই ভাণ্ডারঘরেও অনুপ্রবেশ করে যেখানে মূল্যবান বিষয় সংরক্ষিত।

৭০। তাই তুমি সেই জঘন্য ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারণ লক্ষ কর যা প্রকৃত কাদা ও প্রকৃত পঙ্ক থেকে জনিত, যা যুক্তিবিরুদ্ধ জীবনধারণের অনুরূপ হবার জন্য স্বভাব দু'টোর একটায়ও অবিচল থাকে না যেহেতু স্বভাবে মানবীয় কিন্তু ভাবাবেগের কারণে পশুময়, ও এজন্যই সেই উভয়চর ও দ্বিবিধ জীবনধারণ প্রকাশ করে: তবে তুমি তার মধ্যে এই রোগের চিহ্ন খাটে শুধু নয়, কিন্তু খাবার টেবিলের উপরে ও ভাণ্ডারঘরেও এমনকি বাড়ির বাকি সবকিছুতেই পাবে।

৭১। কেননা যে কেউ সেইভাবে জীবনযাপন করে সে সবকিছুতেই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করে, যার ফলে যেকোন একজন বাড়ির সাজসজ্জা থেকেও উচ্ছৃঙ্খল ও শুচি মানুষের জীবনধারণ সহজে চিনে নিতে পারে। কেননা প্রথমজনের ঘরে দেওয়ালের লেপনে এমন শিল্পিসুলভ চিত্র দেখা যায় যেগুলো উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগপূর্ণ লালসা উত্তেজিত করে ও সেই রোগের প্রকৃতি মনে করিয়ে দেয়, কারণ তেমন ভাবাবেগ সেই লজ্জাকর ছবি দর্শনের মধ্য দিয়ে প্রাণে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু সুবিবেচক মানুষের ঘরে সমস্ত সতর্কতা ও যত্ন বিরাজ করে যাতে উচ্ছৃঙ্খল চিত্র থেকে চোখ শুদ্ধ করা যেতে পারে।

৭২। আমরা সুবিবেচক মানুষের খাবার টেবিলকেও সেইমত শুচি পবিত্র পাই, কিন্তু কাদাময় জীবনে যে গড়াগড়ি করে, তার খাবার টেবিল বহু খাদ্যে পরিপূর্ণ ও বেঙের মত জঘন্য। এবং যদি তুমি ভাণ্ডারঘরগুলো অর্থাৎ জীবনের অন্তরঙ্গতা ও রহস্যাদি লক্ষ করবে, তাহলে এধরনের মানুষদের মধ্যে বেঙের জঘন্যতা আরও বেশি পাবে।

ফারাওর কঠিন হৃদয় ও মানুষের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা

[যাত্রা ৯:১২ দ্রঃ]

৭৩। বিবরণী যখন এটা বলে যে সদ্‌গুণের লাঠি মিশরীয়দের বিরুদ্ধে এ বিস্ময়কর কাজগুলোও সাধন করল, তখন সেই বিবরণের বিষয়ে যেন বিহ্বল না হই। কেননা বিবরণী এটা বলে যে, সেই স্বৈরশাসক ঈশ্বরের কর্মফলেই কঠিন হল। সুতরাং, যাকে

ঊর্ধ্ব থেকে আসা বাধ্যবাধকতার জোরে কঠিন ও বিরোধী করা হয়েছে, তাকে কেমন করে অপরাধী বলে গণ্য করা যায়? ঐশ প্রেরিতদূতও এক স্থানে একই কথা বলেন, '*আর যেহেতু তারা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি, সেজন্য ঈশ্বর লজ্জাকর ভাবাবেগে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন*' [ক], এবং তিনি সমকামীদের কথা উল্লেখ করেন ও তাদেরও কথা উল্লেখ করেন যারা লজ্জাকর ও অকথনীয় উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য শালীনতার বিরুদ্ধে আচরণ করে।

৭৪। তবু যদিও ঐশশাস্ত্র একথা বলে, ও যে কেউ লজ্জাকর ভাবাবেগের প্রতি তাড়িত ঈশ্বর তাকে সেই ভাবাবেগের হাতে তুলে দেন, তবু ফারাও যে ঐশ ইচ্ছা দ্বারা কঠিন হয় তা নয়, বেঙের জীবনের মত জঘন্য জীবনও সদ্‌গুণ দ্বারা প্রদত্ত নয়। কেননা যদি ঈশ্বর তেমনটা ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাঁর এ সিদ্ধান্ত একেবারে সকলের উপরেই একই শক্তি বিস্তার করত যার ফলে জীবনধারণ ক্ষেত্রে সদ্‌গুণ ও রিপুর মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখা যেতে পারত না। কিন্তু যেহেতু মানুষেরা কেউ কেউ এইভাবে কেউ কেউ সেইভাবে জীবনযাপন করে, কেউ কেউ সদ্‌গুণ দ্বারা চালিত হয়ে ও কেউ কেউ রিপুতে নিমজ্জিত হয়ে জীবনধারণ করে, সেজন্য কেউই যুক্তিসঙ্গত ভাবে ঐশ ইচ্ছা ক্রমে নির্ধারিত অবশ্যম্ভাবী অনিবার্যতার উপরে জীবনের নানা পার্থক্য আরোপ করতে পারবে না, কেননা জীবনের সেই নানা পার্থক্য এক একজনের বেছে নেওয়া দ্বারা নির্ধারিত।

৭৫। তাই, কাকে যে সেই লজ্জাকর ভাবাবেগে ছেড়ে দেওয়া হয়, তা প্রেরিতদূত থেকে স্পষ্টভাবে শিখতে পারি [ক]: যে কেউ ঈশ্বরকে জানতে চায়নি, তিনি তার দ্বারা জ্ঞাত হননি বিধায় ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেন না ও ভাবাবেগের হাতে ছেড়ে দেন। কিন্তু ঈশ্বরকে জানায় ব্যর্থ হওয়ার কারণে সেই ব্যক্তি লজ্জাকর ও ভাবাবেগে বশীভূত জীবনে চালিত হয়।

৭৬। কেননা, যদি একজন বলে, অমুক সূর্যের দিকে তাকায়নি বলে সূর্য তাকে গর্তে পড়তে দিয়েছে, তাহলে আমরা এমনটা ভাবব না যে, সূর্যের দিকে যে তাকাতে চায়নি সেই জ্যোতিষ্ক ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে গর্তে ফেলে দিল, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত ভাবে এটা বুঝব যে, যে কেউ আলোর দিকে তাকায় না, আলোর দিকে না তাকানোটাই হল তার গর্তে পড়ে যাওয়ার কারণ। এটা স্পষ্ট যে, প্রেরিতদূতের বাণীও ঠিক এভাবে তখনই বোঝা উচিত

যখন তিনি এমনটা বলেন যে, ঈশ্বরকে যে জানে না, তাকে লজ্জাকর ভাবাবেগে ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং মিশরীয়দের স্বৈরশাসককে ঈশ্বর দ্বারা কঠিন করা হয়েছে; অর্থাৎ এই অর্থে নয় যে, ঐশ ইচ্ছা ফারাওর প্রাণে বিরোধিতার আত্মা জাগিয়ে তুলেছে, কিন্তু এই অর্থে যে, ফারাও অনিষ্টের প্রতি প্রবণ ছিল বিধায়, যে বাণী তার বিরোধিতা নরম করতে পারত সে নিজের স্বাধীন বেছে নেওয়াটার ফলে সেই বাণী গ্রহণ করে নেয়নি।

৭৭। একই প্রকারে, মিশরীয়দের মাঝে আবির্ভূত সেই সদ্‌গুণের লাঠিও হিব্রুকে বেঙের জঘন্য জীবনধারণ থেকে শুচি করে ও এটা দেখায় যে, মিশরীয়েরা এই রোগে ভোগে।

[যাত্রা ৮:৯ দ্রঃ]

৭৮। কিন্তু সেই সময় এল যখন মোশি মিশরীয়দের উপরেও হাত বাড়ান ও বেঙগুলো ধ্বংসিত হয়। এ এমন কিছু যা আমরা আজও দেখতে পাই। কেননা যারা বিধানকর্তার হাত বাড়ানোটা বিচার-বিবেচনা করে থাকবে (এবং তুমি অবশ্যই ভাল মত জান রহস্যময় প্রতীকটা তোমাকে কী বলে যাতে করে বিধানকর্তা বলতে সত্যকার বিধানকর্তাকে বোঝ ও হাত বাড়ানো বলতে তাঁকে বোঝ যিনি ক্রুশে হাত বাড়ান), সুতরাং এরা যদিও কিছুক্ষণ আগে জঘন্য ও কাদাময় জীবন যাপন করছিল, তবু যিনি আমাদের জন্য হাত বাড়িয়েছেন তারা যদি তাঁর দিকে তাকায় তবে তারা এ অনিষ্টকর সহবাস থেকে মুক্তি পায়, কারণ ভাবাবেগ মারা গেছে ও পচে গেছে।

৭৯। বাস্তবিক পক্ষে, এ রোগ থেকে যাদের মুক্ত করা হয়েছে, পশুতুল্য যত তাড়নার মৃত্যুর পরে তাদের পক্ষে অতীত জীবনের স্মৃতি অশালীন ও অরুচিকর লাগে, কেননা তেমন জীবনের প্রতি প্রাণ লজ্জায় ঘৃণা বোধ করে; প্রেরিতদূতও তাদেরই কাছে একই কথা বলেন যারা রিপু থেকে সরে যায় ও সদ্‌গুণের অন্বেষণ করে; তিনি বলেন, *তাতে তোমরা কী ফল পেতে? এমন ফল যার কথা ভেবে এখন তোমরা লজ্জাবোধ করছ* (ক)।

[যাত্রা ১০:২২-২৩ দ্রঃ]

৮০। চিন্তা-ভাবনার একই ধারা অনুসরণ করে তুমি সেই হাওয়াও ব্যাখ্যা কর যা লাঠির প্রভাবে মিশরীয়দের চোখে কালো হয় কিন্তু হিব্রুদের চোখে সূর্যে পরিপূর্ণ হয়ে

উজ্জ্বল হয়। আমি যে ব্যাখ্যার অর্থ উপস্থাপন করেছি, তার শক্তি বিশেষভাবে এখান থেকেই আসে, তথা, একটা পরাক্রম যে এমনটা করে যাতে এক দল ঘোর অন্ধকারে থাকবে ও আর এক দল আলোতে থাকবে, তা যে ঊর্ধ্ব থেকে আগত একটা অনিবার্য পরাক্রম তা নয়। কিন্তু মানুষ এই আমরা সেই আলো ও সেই অন্ধকারের কারণসমূহ আমাদের অন্তরে, আমাদের স্বরূপে ও আমাদের স্বাধীন বেছে নেওয়াতেই রাখি, ও আমরা যে অবস্থা ইচ্ছা করি সেই অবস্থায়ই রয়েছি।

৮১। কেননা, বিবরণী অনুসারে, মিশরীয়দের চোখ যে অন্ধকারে ছিল, এর কারণ এই নয় যে মাঝখানে এমন প্রাচীর বা পর্বত দাঁড়াচ্ছিল যা চোখ ও রশ্মি ছায়ায় আটকিয়ে রাখছিল; কিন্তু সূর্য নিজের রশ্মি সমান ভাবে সবকিছুর উপরে ছড়িয়ে দিতে দিতে হিব্রুরা আলো উপভোগ করছিল কিন্তু মিশরীয়েরা এ উপকারের অভাব ভোগ করছিল। সেই অনুসারে, আলোতে যাপিত জীবন সমান ভাবে সকলের কাছে সম্ভাব্য বলে উপস্থাপিত, তবু নিজের কু-আচরণের রিপুর অন্ধকারের দিকে তাড়িত হয়ে কেউ অন্ধকারে হাঁটে, কিন্তু অন্য কেউ সদ্‌গুণের আলো দ্বারা আলোকিত হয়।

৮২। অন্ধকারে তিন দিন কষ্টভোগ করার পর মিশরীয়েরাও যে পুনরায় আলো ভোগ করতে পারে, এবিষয়ে হয় তো একজন এ ঘটনা থেকে সূত্র পেয়ে সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার (ক) কথা ভাবতে অনুপ্রাণিত হবে যা এসমস্ত কিছুর পরে সেই সকলের জন্য স্বর্গরাজ্যের প্রতীক্ষায় রয়েছে যারা জাহান্নামে দণ্ডিত হয়েছে (খ)। কেননা বিবরণী অনুসারে, বাক্যে ও ধারণায়, সেই স্পর্শনসাধ্য অন্ধকার বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। এবং উভয় অন্ধকার তখনই মিলিয়ে যায় যখন মোশি (যেইভাবে আমরা তাঁর বিষয়ে উপরে ব্যাখ্যা করেছি) অন্ধকার-নিবাসীদের জন্য হাত বাড়ান।

৮৩। একই প্রকারে, সেই চুল্লি জনিত ছাই যা মিশরীয়দের গায়ে ক্ষতযুক্ত ঘা ওঠায় (ক), চুল্লি শব্দের প্রতীকতার খাতিরে তাও উপযোগী ভাবে জাহান্নামের আগুন বিশিষ্ট সেই দণ্ড বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যা বিষয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল ও কেবলমাত্র তাদেরই আঘাত করে যারা মিশরীয়দের মত জীবনযাপন করে।

৮৪। কিন্তু একজন যদি সত্যিকারে ইস্রায়েলীয় ও আব্রাহামের সন্তান, ও নিজের জীবনাচরণে তাঁকে এমন ভাবে লক্ষ করে যার ফলে নিজের স্বাধীন বেছে নেওয়াটা দ্বারা

মনোনীতদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বংশ-সম্পর্ক দেখায়, তাহলে সেইজন সেই কষ্টদায়ী চুল্লি জনিত কোনও ক্ষতি ভোগ করে না। এদের বেলায়ও সেই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হতে পারে যা মোশির দু' হাত বাড়ানো বিষয়ে কষ্টনিবারণ ও দণ্ডমুক্তি অর্থে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

৮৫। সেই যে চিক্কণ মশা অদৃশ্য কামড় দিয়ে মিশরীয়দের আঘাত করে, সেই যে ডাঁশ কামড় দিয়ে কষ্টকর ভাবে দেহগুলোর গায়ে লেগে থাকে, সেই যে পঙ্গপাল সমস্ত চাষ ধ্বংস করে, সেই যে ঝড় শিলাবৃষ্টি সহ উপর থেকে প্রবলভাবে নেমে পড়ে, এসমস্ত বিষয়ে, ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা ঘটনাগুলো ক্ষেত্রে পালন করা পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে কারও পক্ষে প্রতিটি আঘাত ক্ষেত্রে উপযোগী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা শ্রমদায়ী ব্যাপার হওয়ার কথা নয়;

৮৬। এই অর্থে যে, সমস্ত কিছুর কারণ প্রধানত হল মিশরীয়দের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, এবং নিরপেক্ষ ঐশ ন্যায্যতা তাদের প্রতিটি বেছে নেওয়াটা স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে পালন ক'রে সেটার সিদ্ধি স্থির করে। কেননা এসব কিছুতে আমাদের পক্ষে বিবরণীর প্রত্যক্ষ আক্ষরিক অর্থ পালন করা উচিত নয় ও এমনটাও ভাবা উচিত নয় যে, ঈশ্বর থেকে অমঙ্গল তাদেরই উপরে বর্ষিত যারা সেটার যোগ্য; বরং এটাই ভাবা উচিত যে, এক একজন নিজ নিজ আঘাতের সাধক হয় যেহেতু নিজের স্বাধীন বেছে নেওয়াটা দ্বারা যত দুঃখ-কষ্ট জমাচ্ছে, যেইভাবে প্রেরিতদূত নিজেও তেমন মানুষকে উদ্দেশ করে বলেন, *তোমার জেদ ও মনপরিবর্তন-বিহীন হৃদয়কে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি ক্রোধের দিনের জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশেরই সেই দিনের জন্য নিজের উপরে ক্রোধ জমিয়ে তুলছ: তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন* (ক)।

৮৭। কেননা, যখন বিশৃঙ্খল জীবনধারণের ফলে পাকস্থলিতে ক্ষতিকর রস জন্ম নেয় ও চিকিৎসক নিজের নৈপুণ্য দ্বারা সেগুলো বের করে দেয় যার ফলে বমি হয়, তখন চিকিৎসকই যে দেহে সেই রস গঠনের জন্য দায়ী তা নয়, কিন্তু সেই বিশৃঙ্খল জীবনধারণই সেসব কিছুই ঘটিয়েছে, এবং চিকিৎসকের নৈপুণ্য সেগুলো আলোতে আনা ছাড়া কিছুই করেনি। তেমনি ভাবে, যদিও আমরা এটা বলি যে, যারা খারাপ কিছু বেছে নিয়েছে, তাদের কষ্টদায়ী প্রতিফল ঈশ্বর থেকে এসে উপস্থিত হয়, তবু সেই সমস্ত কষ্টের সূচনা ও কারণ যে আমরা নিজেরা, তা ভাবা যুক্তিসঙ্গত।

৮৮। কেননা, পাপ ছাড়া যে জীবনযাপন করে, তার জন্য কোন অন্ধকার নেই, কীটও নেই, জাহান্নামও নেই, আগুনও নেই, তেমন নামক অন্য কিছুও নেই ও ভয়ঙ্কর কিছুও নেই, যেইভাবে বিবরণীও বলে থাকে: হ্যাঁ, হিব্রুরা মিশরীয়দের কোন অমঙ্গলে আঘাতগ্রস্ত হয়নি। সুতরাং, যখন একই স্থানে একজন অমঙ্গলে আঘাতগ্রস্ত ও অন্য একজন আঘাতগ্রস্ত নয়, এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন বেছে নেওয়াটা এক একজনের অনুরূপ পার্থক্য ব্যক্ত করে, তখন এটা স্পষ্ট হবে যে, আমরা নিজেরা অমঙ্গল বেছে না নিলে কোনও অমঙ্গল দেখা দিতে পারে না।

প্রথমজাতদের মৃত্যু

৮৯। কিন্তু এসো, যা যা পরীক্ষা করে এসেছি, তা থেকে এটা ভাল করে বুঝে যে, মোশি ও তাঁর আদর্শমত যে কেউ সদ্‌গুণ দ্বারা নিজেকে উত্তোলন করেন, কঠোর ও উন্নত জীবনধারণে দৈনিক মনোনিবেশ দ্বারা ও ঊর্ধ্ব থেকে আসা ঐশ্বরিক আলোকীকরণ দ্বারা নিজেদের প্রাণ বলিষ্ঠ করে তোলার পর তাঁরা বিমুক্ত জীবনের উদ্দেশে স্বদেশীদের চালনা না করাটা নিজেদের ক্ষতি বলে গণ্য করেন।

[যাত্রা ১১:২৯ দ্রঃ]

৯০। এজন্য, যারা উপরোল্লিখিত অমঙ্গলের চেয়ে আরও বেশি গুরুতর অমঙ্গল দেখায়, তাঁর সেই স্বদেশীদের কাছে গিয়ে মোশি তাদের অন্তরে মুক্তির বাসনা দৃঢ়তর করে তোলেন। এবং যখন তিনি নিজের জনগণকে অমঙ্গল থেকে মুক্ত করে দিতে উদ্যত হচ্ছেন, তখন মিশরীয়দের সকল প্রথমজাতদের মৃত্যু ঘটান, এবং এ কর্মকাণ্ড দ্বারা আমাদের শেখান যে, রিপু যখন প্রথমে মাথা ওঠায় তখনই তা ধ্বংস করা দরকার, কেননা মিশরীয়দের জীবনধারণ এড়ানো অন্য ভাবে সম্ভব নয়।

৯১। এ ধারণা আরও তন্ন তন্ন করে দর্শন না ক'রে তা থেকে বিদায় নেওয়া আমার মতে সমুচিত নয়। কেননা বিবরণীর কেবল আক্ষরিক অর্থ ধরলে তবে কেমন করে বর্ণিত ঘটনাগুলোর জন্য ঈশ্বরের যোগ্য ব্যাখ্যা সমর্থন করা যেতে পারবে? মিশরীয় অন্যায় করে ও তার স্থানে সবেমাত্র সঞ্জাত সেই ছেলেকেই শাস্তি দেওয়া হয় যে তার অপরিপক্ক বয়স হেতু মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে জানে না ও যার জীবন কু-ভাবাবেগ

থেকে মুক্ত। কেননা শিশুকাল কোনও ভাবাবেগ মানে না, ডান ও বাঁ হাতের মধ্যকার পার্থক্য জানে না, কেবল স্তনই বাসনা করে, কষ্টের একমাত্র চিহ্ন হিসাবে তার শুধু কান্নাই আছে, ও তার প্রকৃতি যা কামনা করে তা যদি তার ভাগ্যে আসে তাহলে হাসি দিয়ে দেখায় সে খুশি। তবে কি, ছেলেই পিতার দুষ্টতার ঋণ শোধ করবে? তবে ন্যায্যতা কোথায়? ভক্তি কোথায়? পুণ্য কোথায়? কোথায় সেই এজেকিয়েল? তিনি তো চিৎকার করে বলেন, *‘যে প্রাণ পাপ করে, তাকেই মরতে হবে’*, আরও, *‘পুত্র পিতার অপরাধের জন্য দায়ী হবে না’* (ক)।

৯২। কিন্তু, কেমন করে বিবরণী যুক্তির বিরোধিতা করবে? তবে, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিকে তাকিয়ে এটা কি আরও যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, বিবরণীর প্রতীকমূলক কিছু থাকলে আমরা অনুসন্ধান করব, সেই বিধানকর্তা, যা কিছু বর্ণিত, সেটার মাধ্যমে আমাদের একটা শিক্ষা দিয়েছেন কিনা? শিক্ষা হল এ: যখন সদ্‌গুণের খাতিরে আমরা কোন না কোন রিপুর সম্মুখীন হই, তখন সেই অমঙ্গল যেইমাত্র মাথা উচ্চ করে তা ধ্বংস করা দরকার।

৯৩। কেননা সূত্রপাত ধ্বংস করলে সেটার সঙ্গে আমরা তাও ধ্বংস করব যা পরে আসে; সেইভাবে, যেভাবে প্রভু সুসমাচারে শিক্ষা দিয়ে প্রায় এই একই ভাষা ব্যবহার করে আদেশ করেন যেন মিশরীয়দের রিপুর প্রথমজাতকে হত্যা করা হয়, এবং এইভাবে তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, অভিলাষ ও ক্রোধ একবার বশীভূত করা হলে তখন আমাদের পক্ষে চরম অন্যায় সেই ব্যভিচার ও নরহত্যার দাগ আর ভয় পেতে হবে না (ক)। কেননা ব্যভিচার হোক বা নরহত্যা হোক এ পাপ দু'টো নিজে থেকে জন্মায় না যদি না ক্রোধ নরহত্যাকে ও অভিলাষ ব্যভিচারকে সিদ্ধ করে।

৯৪। সুতরাং, যেহেতু যে কেউ অমঙ্গলের জন্য প্রসব করে সে ব্যভিচারের আগে অভিলাষ প্রসব করে ও নরহত্যার আগে ক্রোধ জন্মায়, সেজন্য প্রথমজাতকে যে ধ্বংস করে থাকে, প্রথমজাতের পরে যে বংশধরেরা আসবে, সে সেই প্রথমজাতের সঙ্গে বাকি অংশ সেই বংশধরদেরও ধ্বংস করেছে। ঠিক যেমন তখনই ঘটে যখন যে সাপের মাথা আঘাত করে, সাপ পিছনে যা টানে, সে সাপের সঙ্গে পশ্চাদ্ভাগী সেই সবকিছুও হত্যা করে।

[যাত্রা ১১:২২-২৩ দ্রঃ]

৯৫। কিন্তু এসমস্ত কিছু হতে পারে না যদি আমাদের প্রবেশদ্বারে সেই রক্ত পাতিত না হয়ে থাকে যা সংহারককে দূরে রাখে। এবং আমাদের আলোচনায় যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা যদি তন্ন তন্ন করে বুঝতে ইচ্ছা করি, তাহলে বিবরণী সেই দু'টো ঘটনা থেকে তথা প্রথমজাতদের হত্যা থেকে ও রক্ত দ্বারা প্রবেশদ্বার রক্ষণ থেকে এ শিক্ষা অর্জন করতে দেয়: কেননা সেখানে অমঙ্গলের প্রথম ধাক্কা ধ্বংস করা হয়, এখানে আমাদের অন্তরে রিপুর প্রথম প্রবেশ সত্যকার মেষশাবক [ক] দ্বারা দূর করে রাখা হয়। কেননা যদি সংহারক ভিতরে এসে থাকে, তাহলে তাকে এমনি করে তাড়াতে পারি না, বরং বিধান দ্বারা পাহারা দিই যেন সে আমাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করতে শুরু না করে। পাহারা ও নিরাপত্তা বলতে প্রবেশদ্বারের কপালি ও দুই বাজুকে মেষশাবকের রক্তে চিহ্নিত করা বোঝায়।

৯৬। ঐশ্বরিক বাণী প্রাণ সম্পর্কে প্রতীকমূলক ভাবে এ শিক্ষা বুঝিয়ে দিতে দিতে, জাগতিক বিদ্যাও সেদিকে এতেই অঙুলি নির্দেশ করেছে যখন প্রাণকে যুক্তিবিশিষ্ট, অভিলাষবিশিষ্ট ও রোষবিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছে। সেই জাগতিক বিদ্যা এবিষয়ে বলে যে, সেই ভাগ তিনটের মধ্যে রোষ ও অভিলাষ নিম্নপদস্থ, ও সেই নিম্নস্থান দু'টো থেকে প্রাণের যুক্তিবিশিষ্ট অংশটা ভর করে থাকে; এবং এই যুক্তিবিশিষ্ট অংশটা বাকি দু'টোকে লাগামের দড়ি দিয়ে ধরে রেখে সেই অংশ দু'টোকে একসাথে রাখে ও সেগুলো দ্বারা ভর পায়, তথা, রোষ দ্বারা সাহস ক্ষেত্রে দৃঢ়ীকৃত হয় ও অভিলাষ দ্বারা মঙ্গলের অংশভাগিতায় উন্নীত হয়।

৯৭। যতক্ষণ প্রাণ এ অনুক্রম দ্বারা নিরাপদ অবস্থায় সুরক্ষিত হয়ে থাকে অর্থাৎ সদ্‌গুণ বিশিষ্ট চিন্তাধারা দ্বারা পেরেকই দ্বারা যেন দৃঢ়ীকৃত হয়ে থাকে, ততক্ষণ ধরে সকল অংশ মঙ্গলের উদ্দেশে একে অন্যের সহযোগিতা করে, কারণ যুক্তিবিশিষ্ট অংশটা নিজে থেকে নিম্নপদস্থ অংশ দু'টোকে নিরাপত্তা প্রদান করে, ও সে নিজেও সেগুলো থেকে একই উপকার গ্রহণ করে।

৯৮। কিন্তু অনুক্রমটা যখন বিপরীত হয়, ও যা উপরে ছিল তা নিচে স্থান পায় যার ফলে যুক্তি পদদলিত নিম্নস্থানে প'ড়ে রোষবিশিষ্ট ও অভিলাষবিশিষ্ট অংশগুলো উপরে

উঠিয়ে দেয়, তখন সেই সংহারকও ভিতরে অনুপ্রবেশ করে, কারণ রক্তের দূরীকরণ-শক্তি তার অনুপ্রবেশে আর বিরোধিতা করে না; এর মানে, সংহারক অনুপ্রবেশ করতে পারে কারণ, যারা তেমন মনের অবস্থায় রয়েছে, খ্রিষ্টে বিশ্বাস তাদের আর সাহায্য করে না।

৯৯। বাস্তবিকই মোশি আগে আদেশ করেন যেন প্রথমে উপরে স্থিত কপালিতে রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তারপরেই যেন দুই বাজুতে একই কাজ করার জন্য এগিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু একজন কেমন করে প্রথমে উপরে স্থিত অংশ মাখাতে পারে যদি অংশটা উপরে না থাকে?

১০০। এবং সেই ঘটনা দু'টো তথা প্রথমজাতদের হত্যা ও রক্তসিঞ্চন যে ইস্রায়েলীয়দের বেলায় ঘটে না, এবিষয়ে আদৌ বিস্মিত হয়ো না এবং একারণে রিপু ধ্বংস বিষয়ে আমাদের দেওয়া ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান ক'রো না কেমন যেন আমাদের সেই ব্যাখ্যা সত্যের বাইরে কল্পিত হয়ে থাকত। কেননা ইস্রায়েলীয় ও মিশরীয় নাম দু'টোর মধ্যকার পার্থক্যের মাধ্যমে আমরা এখন সদ্‌গুণ ও রিপুর মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পেরেছি। তাই, যদি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমাদের এমনটা বুঝিয়ে দেয় যেন আমরা ইস্রায়েলীয় শব্দের দ্বারা তাই বুঝি যা সদ্‌গুণবিশিষ্ট, তাহলে সদ্‌গুণের প্রথমফল ধ্বংস করতে চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত হত না, বরং যাদের লালন-পালন করার চেয়ে বেশি সুবিধাজনক, তাদেরই বিনাশ করা যুক্তিসঙ্গত হত।

১০১। সুতরাং, সেই অনুসারে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, মিশরীয় বংশের প্রথমজাতদের বিনাশ করা দরকার, যাতে প্রথমজাতদের বিনাশের সঙ্গে সমস্ত অমঙ্গলও ধ্বংসিত হয়। এবং এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে মিল রাখে, কেননা ইস্রায়েলীয়দের ছেলেরা রক্তসিঞ্চন দ্বারা সুরক্ষিত হয় যেন যা মঙ্গলকর তা সিদ্ধি লাভ করে; কিন্তু যা কিছু পরিপক্ক হতে হতে মিশরীয় জনগণকে গঠন করত, তা অমঙ্গলে সিদ্ধি লাভ করার আগে ধ্বংসিত হয়।

মিশর থেকে প্রস্থান

[যাত্রা ১২:৮-১১]

১০২। পরবর্তী একথা আলোচনার অর্থের সঙ্গে মিল রেখে আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরও বেশি যথার্থ বলে প্রমাণিত করবে; কেননা আমাদের আলোচনা এমনটা দাবি করে, যে দেহ থেকে সেই রক্ত ক্ষরিত হল যা প্রবেশদ্বারের উপরে দৃশ্যগত হয়ে মিশরীয়দের প্রথমজাতদের সেই সংহারককে দূরে রাখল, সেই দেহ যেন আমাদের খাদ্য হয়।

১০৩। এবং যারা এ খাদ্য গ্রহণ করে, তাদের সাজসজ্জা শালীন ও তাদেরই উপযুক্ত যারা পথে নামবার জন্য ব্যস্ত; সুতরাং সেইমত নয় যা অনুসারে আমরা তাদেরই ভোজসভায় দেখতে পাই যারা আমোদপ্রমোদের মধ্যে জীবনযাপন করে, যাদের হাত শিথিল, যারা বন্ধনী-ছাড়া পোশাক পরে থাকে ও যাদের পা যাত্রা উপযোগী পাদুকা দ্বারা গন্ডিবদ্ধ নয়। না, এখানে বরং সবকিছুই বিপরীত: পা পাদুকায় গন্ডিবদ্ধ, বন্ধনী জামার বাড়তি অংশ কোমরে আটকে রাখে, কুকুরদের দূরে রাখার জন্য তাদের হাতে আছে লাঠি।

১০৪। তেমন সাজসজ্জায় পরিবৃত হয়ে তাদের কাছে মশলা ছাড়া বরং আগুনে ঝলসে নেওয়া খাদ্য অর্থাৎ এমন খাদ্য যা কোন রকমে যে যার দ্বারা প্রস্তুত করা খাদ্য উপস্থাপন করা হয়; এবং ভোজে নিমন্ত্রিত যারা তারা অতি শীঘ্রই তা এমন ভাবে গ্রাস করে নেয় যে তারা পশুর গোটা দেহ খেয়ে ফেলে। তারা সেটার হাড়ের গায়ের সংলগ্ন যা রয়েছে তা খায়, কিন্তু অন্ত্ররাজি স্পর্শ করে না। কেননা এ পশুর হাড় ভাঙা নিষেধ আছে, ও খাবারের যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

১০৫। এসব কিছু থেকে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, পাঠ্যের অক্ষর ঊর্ধ্বতর ধরনের অর্থের দিকে লক্ষ করে, কেননা বিধান খাবার কায়দার নিয়ম নির্ধারণ করে না (এক্ষেত্রে বিধানকর্তা হিসাবে সেই প্রকৃতিই যথেষ্ট যা আমাদের অন্তরে খাবার বাসনা জাগায়), কিন্তু ব্যবহৃত বাণী দ্বারা সেই বিধান অন্য কিছু নির্দেশ করে। বাস্তবিকই, খাবার এভাবে বা সেভাবে গ্রহণ করলে সদ্‌গুণের বা রিপুর কী লাভ হত? খোলা বা বাঁধা কোমর-বন্ধনী, পাদুকা সহ বা পাদুকা ছাড়া পা, হাতে লাঠি বা লাঠি নেই, তাতে পার্থক্য কী?

১০৬। কিন্তু যা কিছু যাত্রার জন্য সাজসজ্জার প্রস্তুতি প্রতীকাকারে নির্দেশ করে তা সুস্পষ্ট। কেননা সেই প্রস্তুতি-বর্ণনা আমাদের স্পষ্টভাবে আহ্বান করে যেন আমরা এটা স্বীকার করি যে, এ বর্তমান জীবনে আমরা এমন যাযাবর পথিক যেনই জীবনযাপন করি যারা জন্মলগ্ন থেকে সবকিছুর খোদ শক্তি দ্বারা প্রস্থানের দিকে তাড়িত, এবং নিরাপদে যাত্রা করার লক্ষ্যে সেই প্রস্থানের জন্য পা, হাত ও বাকি সবকিছু দিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে হয় ["প্রস্থান" হল যাত্রাপুস্তকের প্রকৃত নাম]।

১০৭। কেননা, আমাদের খালি ও অরক্ষিত পা যেন এজীবনের কাঁটায় বিদ্ধ না হয় (ক) (এ কাঁটা পাপকর্মই নির্দেশ করতে পারবে), সেজন্য আমরা পায়ে মজবুত পাদুকা দিই। এর অর্থ হল, কঠোর ও মিতাচারী এমন জীবন যা নিজে থেকে কাঁটার মাথা ভাঙে ও ছিন্ন করে এবং পাপকে বাধা দেয় যেন সেই পাপ চিক্কণ ও অদৃশ্য সুত্রপাত দিয়ে আমাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ না করে।

১০৮। যারা এ যাত্রাপথের জন্য ব্যস্ত, যে লম্বা জামা পা পর্যন্ত নামে ও পা ঘিরে রাখে, তা তাদের জন্য বিঘ্নই ঘটাত। ব্যাখ্যা অনুক্রম অনুসারে, জামা বলতে আমরা এজীবনের সেই কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রীতিকর প্রশ্রয় বুঝতে পারি যা প্রজ্ঞাময় মন, পথিকের কোমর-বন্ধনীর মত, যথাসম্ভব আঁট করে ফেলে। কোমর-বন্ধনী বলতে যে প্রজ্ঞাবান হওয়া বোঝায়, তা দেহের সেই অঙ্গ দ্বারা প্রমাণিত যার চারপাশে বন্ধনী নিজের ভূমিকা সার্থক করে। জন্তুদের দূরে রাখে সেই লাঠি সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, তা সেই প্রত্যাশা যা দ্বারা আমরা প্রাণের শ্রান্তি বহন করি ও আপত্তিকর যত ঘেউ ঘেউ দূরে রাখি।

১০৯। যে খাদ্য আগুন থেকে নেওয়াই যেন উপস্থাপিত, আমি তা আমাদের এই জ্বলন্ত ও অগ্নিময় বিশ্বাস বলে উপস্থাপন করি যা আমরা তত চিন্তা না করে গ্রহণ করি ও যা থেকে ততখানি খাই যতখানি তারই জন্য দ্রুত ও সহজ হজম হয় যে তা খায়, কিন্তু বিনা পরীক্ষা ও নিশ্চিন্তে যার সেই ধর্মতত্ত্ব বাদ দিই যা কঠিন ও সহজে অনুধাবনযোগ্য নয় ধারণাসমূহে আবৃত: ও তেমন খাদ্য আমরা আগুনের উপরে দিই।

১১০। এসমস্ত ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতীক স্পষ্ট করার জন্য আমরা এটা বলি যে, ঐশপ্রকাশ ক্ষেত্রে যা কিছু প্রত্যক্ষ উপলব্ধির যোগ্য, সেবিষয়ে আমাদের নিজেদের নিবিষ্ট করতে হবে অলসভাবেও নয়, বাধ্য হয়েও নয়, কিন্তু আমাদের সামনে যা রয়েছে তাতে

বাসনা দ্বারা তাড়িত এমন ক্ষুধার্ত মানুষের মত নিজেদের তৃপ্ত করতে হয়, যাতে এ খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যবান করে রাখার জন্য আমাদের পুষ্ট করে। কিন্তু যে সমস্ত ধারণা নিগূঢ় হয়ে থাকে, যেমন, ঈশ্বরের সত্তা কেমন, সৃষ্টির আগে কী কী ছিল, জাগতিক বাস্তবতার অতীতে যে কি রয়েছে, কোন্ আবশ্যকতা সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এধরনের যত ব্যাপার কৌতূহলী স্বভাবের মানুষ অনুসন্ধান করে, এসমস্ত বিষয় ক্ষেত্রে এমনটা হতে দিতে হয় যাতে কেবল সেই পবিত্র আত্মা তা জানেন যিনি, প্রেরিতদূতের বাণী মত, *'ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয় তলিয়ে দেখেন'* [ক]।

১১১। শাস্ত্র যে [পবিত্র] আত্মার স্থানে প্রায়ই আগুনের কথা স্মরণ করে ও উল্লেখ করে, যে কেউ এবিষয়ে দক্ষ সে তা না জানবার ভান করতে পারে না। প্রজ্ঞার আদেশও এধরনের ব্যাখ্যার দিকে আমাদের চালিত করে, *'তোমার ক্ষমতার অতীত কোন ব্যাপার অনুসন্ধান করো না'* [ক], অর্থাৎ, ধর্মতত্ত্বের হাড় ভেঙে ফেলো না, কেননা যা গুপ্ত তাতে তোমার কোন প্রয়োজন হয় না।

মিশরের ধন-ঐশ্বর্য

[যাত্রা ১২:৩৫-৩৬ দ্রঃ]

১১২। এইভাবে মোশি জনগণকে মিশর থেকে চালনা করেন, এবং যে কেউ মোশির পদাঙ্ক এইভাবে অনুসরণ করে, সে, তার নিজের বাণী যাদের পৌঁছয়, তাদের সকলকে মিশরের স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করে দেয়। কিন্তু আমি মনে করি, যে ব্যক্তি সদ্গুণের দিকে চালনা করে, যারা তাকে অনুসরণ করে, তারা যে মিশরীয়দের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে তা হওয়া উচিত নয়, বিদেশী ধনবিহীনও তাদের হতে হবে না, কিন্তু তাদের শত্রুরা যা কিছুর অধিকারী, তাদের সেই সবকিছুই নিতে হবে যাতে তারা তা নিজেদের ব্যবহারে রাখতে পারে। মোশি জনগণকে ঠিক তাই করতে আদেশ করেন।

১১৩। কিন্তু, বিবরণীর আক্ষরিক অর্থের উপর ভিত্তি ক'রে কেউই যেন এমনটা না ধরে নেয় যে তখনই এটা ছিল মোশির অভিপ্রায় যখন তিনি মালিকদের তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে আদেশ দেন ও অনিষ্ট সাধনে দিশারী হন; একই প্রকারে,

বিধানকর্তা যে সত্যিকারে তেমন আদেশ দিয়েছিলেন, একথাও কেউই বলতে পারে না, বিশেষ ভাবে সে যখন পরবর্তীকালে দেওয়া সেই বিধিনিয়ম লক্ষ করে যা নিজের প্রতিবেশীর অনিষ্ট করতে সর্বত্রই নিষেধ করে, যদিও ইস্রায়েলীয়েরা যে এই চালাকির মধ্য দিয়ে মিশরীয়দের কাছ থেকে নিজেদের শ্রমের প্রতিদান আদায় করতে পারে, তা কারও কারও কাছে ন্যায্য মনে হয়।

১১৪। কেননা তেমন আদেশ তবুও মিথ্যা ও চালাকি-মুক্ত না হওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হবে। কেননা যে কেউ ব্যবহারের জন্য কোন কিছু নেয় ও সেটা তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয় না, সেই বস্তু পরের সম্পদ হলে, তবে লোকটা এজন্যই অন্যায় করে যেহেতু সে প্রকৃত মালিককে তার নিজের বস্তু থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু লোকটা যদি নিজের যা তাই নেয়, তাসত্ত্বেও সে চালাক বলে অভিহিত, কারণ বস্তুটা যে ব্যবহার করছিল, লাভের আশায় সে তার সঙ্গে চালাকি করেছে।

১১৫। এজন্য, আক্ষরিক ব্যাখ্যার তুলনায় সেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই আরও বেশি উপযোগী, কারণ যারা সদ্‌গুণ সহ বিমুক্ত জীবনের অন্বেষণ করে, সেই ব্যাখ্যা জাগতিক বিদ্যার ঐশ্বর্যও যোগাড় করতে তাদের আহ্বান করে, যদিও যারা আমাদের বিশ্বাসের কাছে বিদেশী বলে গণ্য, তারা সেটার প্রতি ঘৃণা ভান করে। কেননা নীতিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, যুক্তি ও যত বিষয় পৌত্তলিকেরা যত্ন সহকারে পালন করে, যিনি সদ্‌গুণ অভিমুখে আমাদের দিশারী, তিনি, মিশরে যারা অপর্যাপ্ত মাত্রায় সেগুলোর অধিকারী, তাদের কাছ থেকে সেগুলোকে নিতে ও ব্যবহার করতে আহ্বান করেন, কারণ সময়মত সেগুলো উপকারে আসবেই যখন রহস্যের ঐশমন্দিরকে উপলব্ধি-শক্তির ঐশ্বর্যে ভূষিত করতে হয়।

১১৬। কেননা যারা নিজেদের জন্য এ ঐশ্বর্য গেঁথে রেখেছিল, যখন মোশি সাক্ষ্য-তাঁবু নির্মাণ করছিলেন তখন তারা তা তাঁর সামনে উপস্থাপন করল, ও তেমনটা করে তারা এক একজন পবিত্র বস্তুগুলো প্রস্তুত করার সময়ে নিজ নিজ দক্ষতা দিয়ে নিজ নিজ অবদান রেখেছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজও তাই ঘটে, কারণ এমন কয়েকজন রয়েছে যারা জাগতিক কৃষ্টিকে উপহার রূপে ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নিবেদন করে। তাদের মধ্যে সেই মহান বাসিল ছিলেন যিনি যৌবনকালে মিশরীয়দের ঐশ্বর্য নিয়ে বুদ্ধি সহকারে

ব্যবসা করে তা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, ও সেই ঐশ্বর্য দিয়ে মণ্ডলীর সত্যকার তাঁবু ভূষিত করেছিলেন।

সেই মেঘস্তম্ভ

১১৭। কিন্তু এবার সেই বিষয়ে ফিরে যেতে হবে যা থেকে আমরা সরে গেছিলাম, কারণ যারা ইতিমধ্যে সদ্‌গুণ লক্ষ করে ও জীবনধারণে বিধানকর্তার অনুসরণ করে, তারা যখন মিশরীয়দের প্রভুত্বের সীমানা ছেড়ে চলে যায়, তখন, বলতে গেলে, প্রলোভনের আক্রমণ তাদের অনুসরণ করে যা কষ্ট, ভয়, ও শেষ ফলাফল সংক্রান্ত বিপদ ঘটায়। এসব কিছু দ্বারা ভীত হয়ে বিশ্বাসে প্রাথমিক পর্যায়ের মানুষদের মন প্রত্যাশিত মঙ্গলদান পাবার বিষয়ে একেবারে নিরাশায় পড়ে। কিন্তু জনগণের নেতা হিসাবে যদি মোশি বা তাঁর মত একজন থাকেন, তাহলে তিনিই ভয়ের বিরুদ্ধে সুমন্ত্রণা দাঁড় করাবেন ও ঐশসহায়তায় প্রত্যাশা দিয়ে বিহ্বল মনকে পুনরায় উৎসাহিত করবেন। তবু তেমনটা হতে পারবে না যদি না নেতার হৃদয় ঈশ্বরের সঙ্গে কথা না বলে।

[যাত্রা ১৪:১৩-১৫ দ্রঃ]

১১৮। কেননা, তেমন পদে নিযুক্ত অনেক লোক এতেই শুধু চিন্তিত যে, যা বাইরে প্রকাশ্য তা ভাল ভাবে ব্যবস্থা করা হোক, কিন্তু কেবল ঈশ্বর যা দেখেন, সেই গুপ্ত বিষয়সমূহ তারা অবহেলা করে। মোশির বেলায় সেভাবে হয়নি: যখন তিনি ইস্রায়েলীয়দের সাহস ধরতে প্রেরণা দিতেন, তখন দৃশ্যগত ভাবে ঈশ্বরের কাছে কোনও কথা উচ্চারণ করতেন না, কিন্তু ঈশ্বর নিজে তাঁর কাছে তাঁর চিৎকারের সাক্ষী ছিলেন। সেই অনুসারে, আমি মনে করি, বিবরণী আমাদের এটা শিখিয়ে দেয় যে, যে প্রার্থনা স্বরবিশিষ্ট ও ঈশ্বরের কান পর্যন্ত গিয়ে ওঠে, তা উত্তেজিত কোলাহল নয়, কিন্তু শুচি বিবেক-নিঃসৃত মন।

১১৯। যে কেউ সেই অবস্থায় রয়েছে, সেই যে ভাই মহত্তর সংগ্রামের জন্য সহায়তা স্বরূপ, তার কাছে সেই ভাই এখন বেশ ছোট মনে হয়, যদিও মোশি মিশরে নেমে যাবার সময়ে সেই ভাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রমেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়েছিলেন ও বিবরণীতে দূত ভূমিকায় উন্নীত হয়েছিলেন। কেননা সেসময়ই সেই অনতিক্রমণীয়

স্বরূপের প্রকাশ ঘটে যা সেই সীমায় নিজেকে প্রকাশ করে যে সীমায় তাকে উপলব্ধি করতে পারে যে সেই প্রকাশের পাত্র। সেসময় যে তেমনটাই হয়েছিল, তা আমরা বিবরণী থেকে জানতে পারি, এবং তা যে সবসময়ই সেভাবে ঘটে, তা আমরা সেই ব্যাখ্যা থেকে শিখি যা বিবরণী ক্ষেত্রে ব্যবহার করে এসেছি।

[যাত্রা ১৩:২১ দ্রঃ]

১২০। যে কেউ মিশরীয়ের কাছ থেকে পালাবার সময়ে ও নিজেকে নিজের সীমানার বাইরে পাবার সময়ে প্রলোভনের আক্রমণের জন্য ভয় পায়, তখন ঊর্ধ্ব থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে পথদিশারী সেই ক্ষণেই পরিত্রাণ দেখান যেক্ষণে শত্রু যাদের ধাওয়া করছিল নিজের সেনাদল দিয়ে তাদের চারদিকে ঘিরে একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হিসাবে সাগর-পারই ছাড়া আর কিছু রাখে না। এই পর্যায়ে, যে মেঘ তাদের পথ দেখায়, সেই মেঘ তাদের চালনা করে।

[যাত্রা ১৪:২৬-৩০ দ্রঃ]

১২১। কেননা এটাই সেই পথদিশারীর নাম যাঁকে আমাদের পূর্বসূরীরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহকে আরোপ করেছেন। যারা যোগ্য, তিনিই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে পথ দেখান, এবং যে তাঁর অনুসরণ করে সে জল পার হয় ও সেইসঙ্গে সেই পথদিশারী তার কাছে মুক্তি নিশ্চিত করে তার জন্য সেইখানে পথ স্থির করেন যেখানে তাকে নিজের দাস করার লক্ষ্যে যে শত্রু তাকে ধাওয়া করছিল, সেই শত্রু জলের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

লোহিত সাগর পার

যে কেউ এ বর্ণনা শোনে, সে [বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত] সেই জল-রহস্য (ক) চিনে না নিয়ে পারে না যেখানে একজন গোটা শত্রুদল সহ নামে ও যেখান থেকে একাই ওঠে কারণ শত্রুদল জল দ্বারা নিমজ্জিত হয়েছে।

১২২। কেননা এমন কেইবা একথা জানে না যে, মিশরীয় সেনাদল বলতে প্রাণের সেই সমস্ত ভাবাবেগ বোঝায় যা দ্বারা মানুষ দাস হয়? প্রাণের ভাবাবেগ হল সেই ঘোড়া, সেই রথ ও সেই অশ্বারোহী: তীরন্দাজ, ফিঙেধারী, পদাতিক, ও যুদ্ধের জন্য বিন্যস্ত

শত্রুদলের বাকি ভিড়। কেননা কোন্ বিষয়েই না একজন একথা বলতে পারে যে, রোষ-অনুভূতি বা সুখভোগের প্রতি, দুঃখের প্রতি, ও লোভের প্রতি আকর্ষণ উপরোল্লিখিত শত্রুদল থেকে ভিন্ন? ফিঙের ছোড়া পাথর হল অপবাদ, ও যে ডাঁটা ডগা নাড়ায় তা হল রোষের তাড়না; যে ভাবাবেগ আমোদপ্রমোদের দিকে ঠেলা দেয় তা সেই ঘোড়াদের সঙ্গে তুলনীয় যেগুলো অপ্রতিরোধ্য দৌড়ে রথ টেনে নেয়।

১২৩। রথে তিনজন মানুষ রয়েছে যাদের বিষয়ে বিবরণী গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত করে: এই যে তিনজন রথ দ্বারা একেবারে টানা, তুমি এই তিনজনকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করবে, যেহেতু ইতিমধ্যে তুমি কপালি ও দুই বাজু সংক্রান্ত রহস্যে প্রাণের ত্রিবিধ সন্নিবেশ জানতে পেরেছ ও মনে মনে সেই যুক্তিবিশিষ্ট, অভিলাষবিশিষ্ট ও রোষবিশিষ্ট গুণাবলির কথা ভাববে।

১২৪। এসমস্ত বিষয় ও এগুলোর সদৃশ যত বিষয় জঘন্য আক্রমণের প্রবর্তক সহ ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে জলে ছুটে যায়; এবং যেহেতু বিশ্বাসের লাঠি ও আলোদানকারী সেই মেঘ [ক] পথদিশারী হিসাবে চালনা করে সেজন্য সেই জল, যারা তার আশ্রয় নেয় তাদের জীবন দান করে, ও যারা তাদের ধাওয়া করে তাদের ধ্বংস করে।

১২৫। অন্য ব্যাখ্যা অনুসারে, এঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে বিবরণী আমাদের শেখায়, যারা জল পেরিয়ে যায় তাদের কেমন হওয়া উচিত, এবং এটাও শেখায় যে, জল থেকে ওঠার পর তারা যেন শত্রুদলের কোনও কিছুই সঙ্গে করে না নেয়। কেননা যদি শত্রু তাদের একজনের সঙ্গে জল থেকে উঠত, সেই ব্যক্তি জলের সেই অভিজ্ঞতার পরেও তার দাস হয়ে থাকত, যেহেতু সে সেই জীবিত স্বৈরশাসককেও নিজের সঙ্গে করে টেনে নিয়েছে যে জলের গভীরে মরতে পারেনি। এবং আমরা যদি প্রতীকটা তার স্পষ্টতর অর্থে স্পষ্ট করতে ইচ্ছা করি, তবে সেই অর্থ এ, যারা বাপ্তিস্মে রহস্যাবৃত [অর্থাৎ সাক্রামেন্তীয়] জল পার হয়, তাদের পক্ষে সেই জলে গোটা রিপু-দলকেও হত্যা করা উচিত তথা, লোভ, অসুচি বাসনা, অপহরণ-ভাব, অহঙ্কার ও স্পর্ধার প্রতি প্রবণতা, ক্রোধের যত টান, রোষ, অভিমান, ঈর্ষা ও হিংসা; এবং যেহেতু সেই ধরনের যত ভাবাবেগ মানব স্বভাবে নিহিত, সেজন্য সবগুলোকেই অর্থাৎ মনের সমস্ত কু-প্রবণতা ও সেটার সমস্ত কার্যফলও জলে মেরে ফেলতে হবে।

[যাত্রা ১৪:২৮ দ্রঃ]

১২৬। এবং যেমন পাস্কা-রহস্যে ঘটে (কেননা এটাই সেই বলির নাম যার রক্ত রক্তলেপনকারী থেকে মৃত্যু দূরে রাখে), যেমন সেখানে বিধান এটা জারি করে যে, পাস্কার সঙ্গে খামিরবিহীন রুটি (ক) খেতে হয় (খামিরবিহীন বলতে বিকৃত খামিরের সঙ্গে মিশ্রিত নয় এমন রুটি বোঝায় (খ)) এতে সেই বিধান আমাদের বোঝাতে চায় যে রিপুর কোনও অবশিষ্টাংশ পরবর্তী জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে নেই, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার পর, মঙ্গলের দিকে মনপরিবর্তনের মাধ্যমে রিপুর নিরবচ্ছিন্ন শেকল ছিন্ন করার পর, একেবারে শুরু থেকেই জীবনযাপন করা শুরু করতে হবে, তেমনি এখানেও বিধান এমনটা দাবি করে, পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্ম দ্বারা, অতল গহ্বরেই যেন, যা কিছু মিশরীয়ের মত দেখায় সেই সবকিছু অর্থাৎ পাপের সমস্ত দিক শ্বাসরুদ্ধ করার পর আমরা বিদেশী জীবনধারণের কোনও কিছুই সঙ্গে করে টেনে না নিয়ে জল থেকে একাই উঠব। কেননা এটাই হল বিবরণী থেকে আসা শিক্ষা: বাস্তবিকই বিবরণী এটা বলে যে, শত্রু ও বন্ধু দু'জনকেই একই জলে মৃত্যু ও জীবন দ্বারা পৃথক করা হয়েছে, কারণ শত্রুকে ধ্বংস করা হল ও বন্ধুকে জীবন দেওয়া হল।

১২৭। অপরদিকে, সেই অনেকে যারা রহস্যাবৃত [অর্থাৎ সাক্রামেন্তীয়] বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তারা বিধানের বিধিনিয়ম বিষয়ে অজ্ঞতাবশত রিপুর পুরাতন-হওয়া খামিরকে বাপ্তিস্মের পরবর্তী জীবনধারণের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ও তাদের জীবনধারণের ফলে সেই মিশরীয় সেনাদলকে সঙ্গে করে টেনে আনে যারা জল পার হওয়ার পরেও এখনও জীবিত।

১২৮। কেননা, বাপ্তিস্ম-দানের আগেকার জীবনযাপনে যে কেউ হিংসা ও চালাকি দিয়ে ঐশ্বর্যবান হয়েছিল, অথবা মিথ্যা শপথ দিয়ে যে কেউ কোন একটা সম্পদ কিনে নিয়েছিল, অথবা যে কেউ ব্যভিচার মতে একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করছিল, অথবা নিষিদ্ধ যত কর্মের কোনও একটা কর্ম শুরু করেছিল, সে এমনটা মনে না করুক যে, সে যা কিছু অন্যায় ভাবে কিনে নিয়েছিল তা প্রক্ষালনের পরেও তা ভোগ করে চললেও তাকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছে, যেহেতু অনুভব না করলেও তবু সে মন্দ প্রভুদের বস্তু হয়ে থেকেছে।

১২৯। কেননা উচ্ছৃঙ্খলা এমন হিংস্র ও মেজাজী স্বৈরশাসক যে আমোদপ্রমোদ দিয়ে চাবুক দিয়েই যেন দাসত্বে রাখা মনকে উৎপীড়ন করে। একই ধরনের আর এক স্বৈরশাসক হল লোভ: যে লোভের দাস, সেই স্বৈরশাসক তাকে বিরাম দেয় না, কিন্তু লোকটা স্বৈরশাসকের আদেশে বাধ্যতা দেখিয়েও যথেষ্ট শ্রম করে থাকলেও ও নিজের মনোবাঞ্ছার চেয়ে আরও বেশি লাভ করে থাকলেও সে আরও বেশি করতে সবসময় তাড়িত হয়। রিপুর তাড়নায় সাধিত অন্য যত কর্ম হল স্বৈরশাসক ও মালিকদের একটা ধারাস্বরূপ: মানুষ তাদের দাস অবস্থায় থেকে যায়, কারণ জলের মধ্য দিয়ে পার হলেও সে, আমার মতে, রহস্যাবৃত [অর্থাৎ সাক্রামেন্তীয়] সেই জল অবশ্যই স্পর্শ করেনি যার কার্যফল হল মন্দ স্বৈরশাসকদের ধ্বংস করা।

মরুপ্রান্তরে প্রথম বিশ্রাম স্থানগুলো

১৩০। কিন্তু এসো, বিবরণীর পরবর্তী অংশে ফিরে যাই। বাস্তবিকই, আমাদের দেওয়া ব্যাখ্যা অনুসারে যে সাগর পার হয়েছে এবং এ মিশরীয়েরা যার প্রতীক তা নিজেতে মরতে দেখেছে, সে সদ্‌গুণ অভিমুখে পথদিশারী বলে শুধু মোশিকে আর লক্ষ করে না, কিন্তু বিবরণীর কথা অনুসারে সে প্রধানত ঈশ্বরেই বিশ্বাস করে ও তাঁর দাস মোশিতে ভরসা রাখে। এ এমন কিছু যা আমরা আজও তাদের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করছে বলে দেখতে পাই যারা জল সত্যিকারে পার হয়েছে ও ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উৎসর্গ ক'রে তাদেরও উপর ভরসা রাখে ও তাদেরও অধীনস্থ থাকে যারা, প্রেরিতদূতের বাণী মত (ক), যাজকত্ব (খ) দিয়ে ঈশ্বরত্বের সেবা করে।

[যাত্রা ১৫:২২-২৫ দ্রঃ]

১৩১। সাগর পারের পর তারা তিন দিনের যাত্রাপথের সম্মুখীন হয়: সেই যাত্রাপথে তারা কোন এক জায়গায় শিবির বসিয়ে এমন জল পেল যা লবণাক্ত স্বাদের জন্য শুরুতে পান করার মত মনে হল না, কিন্তু যার মধ্যে ফেলানো মোশির লাঠি পিপাসিতের কাছে মোনরম করে তুলল।

১৩২। আজকালেও যা ঘটে, বিবরণী তার সঙ্গে মিল রাখে, কেননা, সাগর পার হওয়ার আগে যে মিশরের যত সুখভোগের দাস ছিল ও এখন সেই সমস্ত কিছু ছেড়ে

দিয়েছে, সে শুরুতে জীবনকে সুখবিহীন, অমোনরম ও মেনে নেওয়াতে কঠিন অনুভব করে। কিন্তু জলে কাঠ ফেলে দিলে অর্থাৎ মানুষ যদি পুনরুত্থানের সেই রহস্য গ্রহণ করে নেয় যা কাঠ থেকে শুরু হয়েছিল (কাঠ শব্দটা শুনে তুমি অবশ্যই ক্রুশের কথা বুঝেছ), তাহলে ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশা দ্বারা মিষ্ট করা সেই সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন, রুচি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোকে আকর্ষিত করে এমন মাধুর্যের চেয়ে মধুর ও অধিক গ্রহণীয় হয়।

[যাত্রা ১৫:২৭ দ্রঃ]

১৩৩। যাত্রার পরবর্তী ধাপ খেজুরগাছগুচ্ছ ও জলের উৎসধারা দ্বারা আনন্দিত হয়ে পথিকদের শ্রম থেকে স্বস্তি দেয়। শুচি ও মিষ্ট জলের উৎস সংখ্যায় বারো, ও মহৎ ও উচ্চ খেজুরগাছ সংখ্যায় সত্তর, কারণ বয়স সেগুলোকে উচ্চতা বৃদ্ধি করেছিল। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর যুক্তিযুক্ত ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে আমরা এক্ষেত্রে কী পাব? যা দ্বারা সদ্‌গুণের জল পিপাসিতদের কাছে পান করার মত জল হয়, সেই কাঠ-রহস্য আমাদের সেই বারোটা উৎস ও সত্তরটা খেজুরগাছে অর্থাৎ সুসমাচারের শিক্ষায়ই চালনা করে (ক)।

১৩৪। এখানে সেই বারোটা উৎসধারা হলেন সেই বারো প্রেরিতদূত, কেননা এ উপকার বিস্তার করার জন্য প্রভু বারোজনকেই বেছে নিয়েছিলেন, ও তাঁদের মধ্য দিয়ে ঐশ্বরিক বাণী উৎসারিত করেছিলেন, যেইভাবে নবীদের একজনও প্রেরিতদূত-দানের ঐশ্বর্য এই বলে পূর্বঘোষণা করেছিলেন, *জনসমাবেশে তোমরা ঈশ্বরকে বল ধন্য, ইস্রায়েলের উৎসধারা থেকে প্রভুকে বল ধন্য* (ক)। সেই সত্তরটা খেজুরগাছ সেই প্রেরিতদূতেরা হতে পারে যাঁরা সেই বারো প্রেরিতদূতের বাইরে মনোনীত হয়েছিলেন গোটা পৃথিবী জুড়ে যাবার জন্য; তাঁরা বিবরণীর খেজুরগাছের মত সংখ্যায় সত্তরজন।

[যাত্রা ১৭:১-৭ দ্রঃ]

১৩৫। কিন্তু আমি মনে করি, দর্শনে প্রীতজনদের জন্য অন্যান্য ধাপের ব্যাখ্যা এ স্বল্প মন্তব্য দিয়ে সহজ ক'রে আমাদের পক্ষে বিবরণীর মধ্য দিয়ে যাত্রাটা ত্বরান্বিত করা উচিত। ধাপগুলো সেই নানা সদ্‌গুণ নির্দেশ করতে পারে যেখানে যে কেউ অনুক্রম অনুযায়ী এগিয়ে চলে অর্থাৎ সেই মেঘস্তম্ভ অনুসরণ করে সে শিবির বসায় ও স্বস্তি পায়। মধ্যবর্তী ধাপগুলোর কথা উল্লেখ না করে আমি সেই শৈল সংক্রান্ত বিস্ময়কর কাজ স্মরণ

করিয়ে দেব যার কঠিন ও স্থিতিশীল প্রকৃতি পিপাসিতদের জন্য পানীয় হয়েছিল, কারণ কাঠিন্য নরম জলের প্রকৃতিতে গলে গেছিল।

১৩৬। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার জন্য বিবরণীর ধারাবাহিকতা উপযোগী করা শ্রমসাদ্ধ ব্যাপার নয়। কেননা যে কেউ সেই মিশরীয়কে মৃত অবস্থায় ত্যাগ করেছে, যে কেউ সেই কাঠ দ্বারা মিষ্ট হয়েছে, যে কেউ প্রৈরিতিক উৎসধারার জলে পুলকিত হয়েছে ও খেজুরগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করেছে, সেই এখন ঈশ্বরকে গ্রহণ করে নিতে সক্ষম। কেননা প্রেরিতদূতের বাণী মত, সেই শৈল হলেন খ্রিষ্ট (ক) যিনি অবিশ্বাসীদের কাছে শুষ্ক ও স্থিতিশীল, কিন্তু যে কেউ বিশ্বাসের লাঠি বহন করে তিনি পিপাসিতের জন্য পানীয় হয়ে ওঠেন ও যারা তাঁকে গ্রহণ করে নেয় তাদের অভ্যন্তরে নিজেকে প্রসারিত করেন। কেননা তিনি বলেন, *আমি এবং পিতা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* (খ)।

সেই মান্না খাদ্য (যাত্রা ১৬:২, ১৪ ইত্যাদি দ্রঃ)

১৩৭। তবু এই আরেকটা বিষয়ও ব্যাখ্যা ছাড়া ফেলে রাখার যোগ্য নয়: সাগর পার হওয়ার পর ও জল সদ্‌গুণের পথিকদের জন্য মিষ্ট হওয়ার পর, জলের উৎসধারা ও খেজুরগাছগুচ্ছের ধারে মধুর বিশ্রামের পর ও শৈলের জল পান করার পর মিশরীয়দের খাদ্যভাণ্ডার একেবারে ফুরিয়ে যায়। যার ফলে, তারা মিশর থেকে যত খাদ্য-সামগ্রী যুগিয়ে নিয়েছিল, তাদের কাছে সেই বিদেশী খাদ্যের অবশিষ্ট কিছুই না থাকায় ঊর্ধ্ব থেকে সেই খাদ্য নেমে আসে যা একাধারে একক ও বহুবিধ (ক)। কেননা দেখতে সেটার একক রূপ ছিল, কিন্তু সেটার গুণ ছিল বহুবিধ, যার জন্য খাদ্যকে এক একজনের রুচির প্রকৃতি অনুসারে পরিমিত করা হত।

১৩৮। এতে আমরা কী শিক্ষা পাই? শিক্ষা এরূপ: এক একজনের পক্ষে কোন্‌ শুদ্ধিকরণ দ্বারা মিশরীয় ও বিদেশী জীবনধারণ থেকে নিজেকে শুচি করা উচিত যাতে নিজের প্রাণের থলি মিশরীয়দের প্রস্তুত করা মন্দ খাদ্য থেকে খালি করি এবং এর ফলে আমরা যেন আমাদের শুচীকৃত প্রাণে ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা সেই খাদ্য গ্রহণ করে নিতে

পারি যা আমাদের জন্য চাষ দ্বারা বীজ বৃদ্ধি করে না কিন্তু যা বীজ ছাড়া ও চাষ ছাড়া এমন প্রস্তুত রুটি যা উর্ধ্ব থেকে নেমে এসে এমর্তে পাওয়া যায়।

১৩৯। বিবরণীর প্রতীক-পদ্ধতি অনুসারে এই যে রুটি হল সত্যকার রুটি, এক্ষেত্রে তুমি তো অবশ্যই উপলব্ধি কর যে, স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটি [ক] বিদেহী বাস্তবতা নয়। কেননা, যা বিদেহী তা কেমন করে দেহের পুষ্টিসাধন করতে পারবে? এবং যা বিদেহী নয় তা অবশ্যই দেহ। এরুটির দেহকে বীজও গড়েনি, চাষও তা তৈরি করেনি, কিন্তু মাটি মাটি হয়ে থেকে নিজেকে এ ঐশ্বরিক খাদ্যে পরিপূর্ণ পায় যার অংশী তারা যারা ক্ষুধার্ত অর্থাৎ যারা এ বিস্ময়কর কাজ গুণে আগে থেকে কুমারীর রহস্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

১৪০। সেজন্য চাষ না করা এ রুটি এমন ঐশ্বরিক বাণীও যা, যারা তা খায়, তার বহুবিধ গুণ দ্বারা তাদের ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী নিজের কার্যকারিতা পরিণত করে [ক]। কেননা ঐশ্বরিক বাণী শুধু রুটি হতে জানে না, কিন্তু দুধ, মাংস, শাক, ও সেইসব কিছু হয় যা তারই কাছে উপযোগী ও মোনরম যে তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে, যেইভাবে ঐশপ্রেরিতদূত সেই পল আমাদের শিক্ষা দেন যিনি নিজের শিষ্যদের জন্য তেমন ভোজনপাট ব্যবস্থা করেন: তিনি নিজের বাণীকে অধিক সিদ্ধতাপ্রাপ্তদের জন্য শক্ত ও মাংসময় খাদ্য, দুর্বলদের জন্য শাক, প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে যারা তাদের জন্য দুধ করে তোলেন [খ]।

১৪১। বিবরণী এখাদ্য সম্পর্কে যত বিস্ময়কর কাজ বর্ণনা করে, সেগুলো সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের জন্য শিক্ষা। কেননা বিবরণী বলে, সকলেরই সেই খাদ্যের উপরে সমান অধিকার ছিল, নানা প্রয়োজন অনুসারে অংশগ্রহণকারীদের শক্তির ভিন্নতা অনুযায়ী বেশিও হত না, কমও হত না। আমার মতে, এতে আমাদের কাছে সাধারণ ধরনের পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়, অর্থাৎ, যারা জীবনের নানা দাবি এ জড় খাদ্য দ্বারা পূরণ করে, তারা যেন প্রয়োজনের মাত্রা অতিক্রম না করে, কিন্তু তারা যেন ভালই জানে যে খাদ্যের একমাত্র সাধারণ মাত্রা এক একজনের জন্য দিনের দাবি পূরণ দ্বারা নির্ধারিত।

১৪২। সুতরাং, যদিও একজন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি যোগাড় করে, তবু পাকস্থলী নিজের স্বভাবের জোরে নিজের মাত্রা অতিক্রম করতে পারে না, প্রস্তুত করা

খাদ্যের আতিশয্যের জন্যও নিজেকে প্রসারিত করতে পারে না। কিন্তু, বিবরণীর কথা অনুসারে, যে কেউ বেশি কুড়িয়ে নিত সেও অপর্যাপ্ত মাত্রায় পেত না (ফলত, অপর্যাপ্ত অংশ রাখা তার দরকার ছিল না), যে কেউ কম কুড়িয়ে নিত তারও কমতি পড়ত না (কেননা যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যেত, প্রয়োজনীয়তা সেই অনুপাতে কমে যেত)।

১৪৩। এবং যারা অতিরিক্ত খাদ্য বাঁচিয়ে রাখত, তাদের জন্য অপর্যাপ্ত অংশটা কীট উৎপন্ন করে বিকৃত হত; এতে ঐশ্বরিক বাণী কোন রকমে লোভীদের বোঝাতে চায় যে, তাদের জমাবার আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজনের বেশি যা কিছু যোগাড় করে, তা পর দিনে অর্থাৎ ভাবী জীবনে তারই জন্য কীট হবে যে তা বাঁচিয়ে রেখেছে। এমনটা শুনে তুমি তো ভালই বোঝ যে তেমন শব্দ দ্বারা লোভজনিত সেই কীটকে নির্দেশ করা হচ্ছে যার অন্ত নেই [ক]।

১৪৪। এবং সাব্বাৎ দিনের জন্য যা বাঁচিয়ে রাখা হত, তা যে ক্ষয় না হয়ে বরং থেকে যেত, একথা এ বিধিকে ধারণ করে: এমন ক্ষণও রয়েছে যখন জমাবার প্রবণতা ব্যবহার করা দরকার, সেইখানে যেখানে যা বাঁচিয়ে রাখা হয় তা ক্ষয় হয় না ও তখনই আমাদের উপকারে আসবে যখন এজীবনের প্রস্তুতিকাল অতিবাহিত হলে পর আমরা কাজকর্ম করার সেই অসাধ্যতায় থাকব যা মৃত্যুর পর হয়। বাস্তবিকই, সাব্বাতের আগের দিন হল '*পারাস্কেবে*' অর্থাৎ প্রস্তুতি-দিবস ও তাই বলে অভিহিত [ক]।

১৪৫। দিনটা এজীবনকে নির্দেশ করে যে জীবন ধরে আমরা সেই ভাবী জীবনের জন্য মঙ্গল যোগাড় করি যেখানে সেই সমস্ত কাজকর্মের একটা কর্মও সম্পাদন করতে পারি না যা এখন সম্পাদন করতে আমাদের পক্ষে সম্ভব যেমন, চাষ, বাণিজ্য, সামরিক পেশা, বা সে ধরনের কাজকর্মের অন্য একটা; কিন্তু তেমন কিছুর কোন কিছুই সম্পাদন না করে আমরা সেই বীজের ফসল সংগ্রহ করি যা এজীবনকালে বুনিয়েছি: সেই ফসল হবে অক্ষয়শীল, যদি বোনা বীজ ভালো ছিল; হবে ক্ষয়শীল ও মরণশীল, যদি এজীবনের চাষ সে বীজগুলো উৎপন্ন করে থাকে। কেননা, শাস্ত্র যেমনটা বলে, *আত্মায় যে বোনে, সে আত্মা থেকে পাবে অনন্ত জীবনের ফসল; নিজ মাংসে যে বোনে, সে মাংস থেকে ক্ষয়ের ফসল পাবে* [ক]।

১৪৬। এজন্য শ্রেয় বিষয়মুখী যে প্রস্তুতি, তা ন্যায়সঙ্গত ভাবে 'পারাস্কেবে' [তথা প্রস্তুতি] বলে ও তা বলে বিধান দ্বারা গণিত, কারণ তা যা জমিয়ে রাখে তা হল অক্ষয়শীলতা। বিপরীত অর্থে যা আমরা কল্পনা করি, তা প্রস্তুতি নয়, প্রস্তুতি বলেও গণিত নয়, কেননা মঙ্গল-অভাব উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুতি বলে চিহ্নিত করা উচিত নয়, কিন্তু প্রস্তুতি-অভাব বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত। এজন্য বিবরণী মানুষদের কাছে শুধু শ্রেয় বিষয়মুখী প্রস্তুতি বাধ্যতামূলক বলে বিধি দেয়, ও নিজের নীরবতা দিয়ে বুদ্ধিমানদের ভাবতে দেয় সেটার বিপরীত কী।

আমালেকের সঙ্গে যুদ্ধ

১৪৭। সৈন্যজীবনে ভর্তিকালে যেমন সেনাপতি আগে মজুরি দেন ও পরে বিলম্ব না করে যুদ্ধের সঙ্কেত দেন, তেমনি সদ্‌গুণের সৈন্যেরাও রহস্যাবৃত মজুরি গ্রহণ করার পর অবিলম্বে বিদেশীদের আক্রমণ করে, কেননা তাদের সেনাপতি হলেন সেই যিশু [অর্থাৎ যোশুয়া] (ক) যিনি মোশির উত্তরসূরী।

১৪৮। বিবরণী যে কেমন মিল রেখে এগোচ্ছে তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ? যতদিন মানুষ হিংস্র স্বৈরশাসন দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে অতিরিক্ত দুর্বল হয়, ততদিন সে শত্রুকে একাই প্রতিরোধ করে না, কেননা তেমনটা করা তার সেই শক্তি নেই। কিন্তু দুর্বলদের জন্য সংগ্রাম করার জন্য আর একজন আছে যে আঘাতের পর আঘাতে শত্রুকে আঘাত করে। কিন্তু মানুষ, যারা তাকে অত্যাচার করছিল, যখন তাদের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে দেয়, যখন সেই কাঠের দ্বারা মাধুর্য আস্বাদ করে, খেজুরগাছের সেই ধাপে শ্রান্তি থেকে বিশ্রাম পেয়ে থাকে, শৈল সংক্রান্ত রহস্য জানে ও স্বর্গীয় খাদ্যে অংশ নেয়, তখন পরের হাত দ্বারা আর শত্রুকে তাড়িয়ে দেয় না, কিন্তু, কেমন যেন শিশুকাল থেকে একবার বের হয়ে ও যৌবনকালের পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছে সে নিজে থেকেই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধায়: সেসময় সেনাপতি হিসাবে ঈশ্বরের দাস মোশি আর নয়, কিন্তু সেই স্বয়ং ঈশ্বরকে হাতিয়ার করে, সেই মোশি যাঁর দাস ছিলেন (ক)। কেননা শুরু থেকে যা ভাবী বিষয়গুলোর প্রতীক ও ছায়া হিসাবে দেওয়া সেই বিধান (খ) প্রকৃত যুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম নয়, এবং সেনাপতির ভূমিকা তিনিই নেন যিনি বিধানের পূর্ণতার সাধন

করেন ও মোশির উত্তরসূরী, যাঁর কথা আগে থেকে ঘোষিত হয়েছে যেহেতু তাঁর নাম তাঁরই একই নাম যিনি সেসময় সেনাপতি ছিলেন।

[যাত্রা ১৭:১১-১২ দ্রঃ]

১৪৯। উপরন্তু, সেনাদল যখন দেখে, বিধানকর্তা হাত উচ্চ করে রাখেন, তখন সেনাদল শত্রুর উপরে জয়ী হয়, কিন্তু যখন দেখে, সেই হাত দু'টো নামানো অবস্থায় রয়েছে, তখন পরাজিত হয়। হাত উচ্চ করে রাখেন সেই মোশির অঙ্গভঙ্গিটা বিধান সংক্রান্ত ঊর্ধ্বতর ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নির্দেশ করে, কিন্তু মাটির দিকে হাত নামানোটা বিধান সংক্রান্ত অক্ষর অনুযায়ী নম্র ও নিচক ব্যাখ্যা ও পালন নির্দেশ করে (ক)।

১৫০। আত্মীয় একজনের সাহায্যে [আরোন] যাজক মোশির ভারী-হওয়া হাত উচ্চ করে ধরে রাখেন; এবং এ বিষয়ও ব্যাখ্যার সুসঙ্গত অনুক্রম থেকে বাইরে নয়। কেননা সত্যকার যাজকত্ব, তার সঙ্গে মিলিত ঈশ্বরের বাণীর গুণে, সেই বিধানের কার্যকারিতা পুনরায় উচ্চ করে তোলে যা ইহুদী ব্যাখ্যার নিচতার কারণে মাটিতে পতিত হয়েছিল, এবং মাটিতে শায়িত বিধানকে পাথরের গায়ে রাখে, যার ফলে বিধান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, যে তার দিকে তাকায় তাকে তার নিজের লক্ষ্য নির্দেশ করে যা প্রসারিত হাতে সিদ্ধি লাভ করে।

১৫১। কেননা এটা সত্য যে, যারা দেখতে সক্ষম, তারা বিধানের মধ্যে বিশেষভাবে ক্রুশ-রহস্যকেই চিনে নেয় (ক); এদের বিষয়ে সুসমাচার এটা বলে যে, বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না (খ), এবং একথা দ্বারা যিশু সেই আড়াআড়ি ও সেই উল্লম্ব লাইন নির্দেশ করেন যা অনুসারে সেই ক্রুশের চিহ্ন আঁকা হয়, সেই যে চিহ্ন সেসময়ও সেই মোশিতে উচ্চ হতে দেখা দিচ্ছিল যাঁকে আমরা বিধানের প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করি: হ্যাঁ, সেই ক্রুশের চিহ্ন যা তাদেরই জন্য ছিল বিজয়-চিহ্ন ও বিজয়ের কারণ যারা তার দিকে দৃষ্টি ফেরাত।

ঐশ্বরিক জ্ঞানের পর্বত

১৫২। বিবরণী পথদিশারী হয়ে হাত ধরে পুনরায় আমাদের ব্যাখ্যাকে ধারাবাহিক ও সুসঙ্গত আরোহণে সদ্‌গুণের শীর্ষস্থানের দিকে চালনা করে (ক)। কেননা যে কেউ সেই

খাদ্যে বলবান হয়ে উঠেছে ও শত্রুদের বিরুদ্ধ লড়াই করে নিজের শক্তি দেখিয়েছে ও বিরোধীদের উপর জয়ী হয়েছে, সে এখন অনির্বচনীয় ঈশ্বরজ্ঞানের নিকটে এগিয়ে আসে। একথা দ্বারা বিবরণী আমাদের শেখায়, ধারণা দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞানের পর্বতের নিকটে এগিয়ে যাবার, তুরিধ্বনির কণ্ঠ সহ্য করার, ঈশ্বর যেখানে রয়েছেন সেই ঘোর তমসায় প্রবেশ করার, ও সেই পাথরফলক দু'টোতে ঐশ্বরিক অক্ষর খোদাই করার সাহস পাবার জন্য আমাদের পক্ষে জীবনকালে কোন্ কর্ম ও কেমন কর্ম উচিত-পরিণতি পর্যন্ত সম্পন্ন করা দরকার আছে; এবং যদি সেই ফলক দু'টো কোন পাপের কারণে ভেঙে গিয়ে থাকে তবে ঈশ্বরের কাছে মানুষের হাতে কাটা ফলক পুনরায় উপস্থাপন করা ও ঈশ্বরের আঙুল দিয়ে সেই অক্ষর খোদাই করা দরকার আছে যা আগেকার ফলকে ফলহীন হয়ে থেকেছিল।

১৫৩। কিন্তু, ধারণাটা বিবরণীর সুসঙ্গতি ও অনুক্রম অনুসারে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় উপযোগী করা অধিক বাঞ্ছনীয়। কেননা সদ্‌গুণ-অন্বেষীদের পথদিশারী যারা, যে কেউ সেই মোশিকে ও সেই মেঘ লক্ষ করে (এক্ষেত্রে মোশি বিধানের আজ্ঞাগুলোর প্রতীক ব'লে, ও মেঘটা বিধানের সেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রতীক ব'লে গণ্য হতে পারে যা আমাদের জন্য পথদিশারী ভূমিকা পালন করে); জল-পার দ্বারা শোধিত মন দ্বারা, যা বিদেশী ছিল তা হত্যা করার পর ও তা নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর যে কেউ সেই মেরার জল তথা সুখভোগ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনের সেই জল স্বাদ করে থাকে, সেই যে জল স্বাদ করে যারা তাদের কাছে শুরুতে তা তেতো ও অরুচিকর মনে হয় কিন্তু পরে, যারা সেই কাঠ গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদের কাছে মিষ্ট অনুভূতি নিবেদন করে; যে কেউ সেই খেজুগাছগুলোর ও সুসমাচারের সেই জলের উৎসধারার সৌন্দর্যে তৃপ্তি পেয়েছে, যে কেউ সেই জীবনময় জল খেয়ে (ক) তথা সেই শৈল দিয়ে নিজের পিপাসা মিটিয়ে দিয়েছে, যে কেউ স্বর্গীয় রুটি (খ) গ্রহণ করে তা নিজেতে স্থান দিয়েছে ও শত্রুদের বিরুদ্ধে এমন বলবান যোদ্ধা বলে লড়াই করেছে যার পক্ষে বিজয়ের কারণ হল সেই বিধানকর্তার প্রসারিত হাত যা ক্রুশ-রহস্যকে পূর্বঘোষণা করে, তবে তেমন ব্যক্তিই অনতিক্রমণীয় স্বরূপ সন্দর্শনে চালিত হয়।

১৫৪। তেমন ব্যক্তির জন্য এ জ্ঞান অভিমুখে পথ হল সেই আত্মশুদ্ধি যেখানে শুচিতা-দানকারী নানা প্রক্ষালন দ্বারা কেবল দেহকেই শোধন করা হয় তা নয়, কিন্তু পোশাকও জল দিয়ে যত কালিমা থেকে ধৌত করা হয়। এর অর্থ হল, যে কেউ উপলব্ধ বিষয়গুলো সন্দর্শন অভিমুখে এগিয়ে যেতে উদ্যত হচ্ছে তাকে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে শুচীকৃত করতে হয় যেন সে আত্মায় ও দেহে শুচি ও কালিমামুক্ত হয় যেহেতু সে দেহ ও আত্মা দু'টোরই মলিনতা উপযুক্ত ভাবে ধৌত করেছে। তবেই, আমাদের মধ্যে যা কিছু গুপ্ত, যিনি তা লক্ষ করেন (ক), তাঁর কাছে আমরা শুচি বলে প্রতীয়মান হব, এবং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা প্রাণের আন্তর মনোভাবের সঙ্গে মিল রাখবে।

[যাত্রা ১৯:১০ দ্রঃ]

১৫৫। এজন্য, ঈশ্বরের আদেশ ক্রমে পর্বতে আরোহণ করার আগে মোশি নিজের পোশাক ধুয়ে নেন: এখানে পোশাকের প্রতীক জীবনের বাহ্যিক শালীনতা নির্দেশ করে (ক)। কেননা এমন কেউই নেই যে এমনটা বলবে না, যারা ঈশ্বরের দিকে নিজেদের উত্তোলন করে পোশাকের এই বাহ্যিক মলিনতা আরোহণের ব্যাপারে তাদের বাধা দেয়; কিন্তু আমি মনে করি, পোশাকের কথার মধ্য দিয়ে আমাদের সেই বাহ্যিক আচরণ সমুচিত ভাবে নির্দেশিত হচ্ছে যা এজীবনে আমরা ধারণ করি।

[যাত্রা ১৯:১৩ দ্রঃ]

১৫৬। এসমস্ত কিছু সিদ্ধ করার পর ও পর্বত থেকে যত দূর সম্ভব বিচারশক্তিহীন পশুপাল দূর করে দেওয়ার পর তখনই মোশি সবচেয়ে উচ্চ উপলব্ধ বিষয়গুলো অভিমুখে আরোহণটা শুরু করেন। বিচারশক্তিহীন কোন জীবকে যে নিজেকে পর্বতের উপরে দৃশ্য করতে বাধা দেওয়া হয়, তা আমার মতে এটা নির্দেশ করে যে, উপলব্ধ বিষয় সন্দর্শনে ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ জ্ঞান অতিক্রম করা হয়। কেননা, নিজের আচরণ, বুদ্ধি ছাড়া, কেবল ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষতার ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রণ করা, তা বিচারশক্তিহীন জীবদের সহজাত স্বভাব; বস্তুতপক্ষে, ইন্দ্রিয়গুলোর পথদিশারী হল দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রায়ই কাজ করার তাড়না নিয়ন্ত্রণ করে, এবং যা দ্বারা ইন্দ্রিয়চেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠে, পশুদের জীবনে সেই সবকিছু অনেক ভূমিকা রাখে।

১৫৭। কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর বিষয়গুলোতে সাধিত নয়, সাধারণ ধারণাগুলোর একটা দ্বারাও উপলব্ধ নয়। কেননা *চোখও দেখেনি, কানও শোনেনি* (ক), এবং মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা সাধারণত ভেসে ওঠে, দর্শনটা সেগুলোর মধ্যেও উপস্থিত নয়। কিন্তু যে কেউ উচ্চতর বিষয়গুলো সন্দর্শন অভিমুখে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, তাকে নিজের আচরণকে যত ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ ও বিচারশক্তিহীন তাড়না থেকে শোধন করতে হবে, মনকে চিত্তের পূর্বকল্পনা-জনিত যত অভিমত থেকে ধৌত করতে হবে, ও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে, অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত ও সেটার সঙ্গে কোন ভাবে সহবাসকারী ইন্দ্রিয়চেতনার সঙ্গে তার গতানুগতিক সম্পর্ক থেকেও তাকে বিরত হতে হবে। তেমন আত্মশুদ্ধিও সমাধা করার পর, অবশেষে মোশি পর্বত-আরোহণের সম্মুখীন হতে পারেন।

[যাত্রা ১৯:১৯ দ্রঃ]

১৫৮। সত্যিকারে খাড়া ও দুর্গম পর্বত ঐশতত্ত্বকে নির্দেশ করে; সেই পর্বতের পাদতল পৌঁছোনো সাধারণ লোকদের পক্ষে কঠিন লাগে। কিন্তু যে কেউ মোশির মত, সে দীর্ঘ পথ ধরে আরোহণ করতে পারে, ও আরোহণ করতে করতে সে শ্রবণশক্তি দিয়ে সেই তুরির কণ্ঠ ধারণ করতে পারে যেগুলো আরোহণ যত ঊর্ধ্বতর হয় তত তীব্রতর হয়ে ওঠে: এ এমন বিষয় যা বিবরণী অনুযায়ী। কেননা ঐশস্বরূপ বিষয়ক সংবাদ সত্যি এমন তুরি যা কানকে আঘাত করে: কণ্ঠটা শুরুতেও তীব্র, ও আরোহণ শেষে মহত্তর গুণে অনেক বেশি তীব্রতম (ক)।

[যাত্রা ১৯:১৯ দ্রঃ]

১৫৯। বিধান ও নবীরা নিজ নিজ তুরি দিয়ে মনুষ্যত্ব-ধারণ রহস্য সংক্রান্ত ঐশ ব্যবস্থা ঘোষণা করলেন, কিন্তু প্রথম কণ্ঠগুলো অবাধ্য কানে পৌঁছোবার জন্য বেশি দুর্বল ছিল। এজন্য কানে খাটো সেই ইহুদীরা তুরিগুলোর কণ্ঠ গ্রহণ করে নেয়নি। বিবরণীর কথা অনুসারে, মোশি এগিয়ে যেতে যেতে তুরিগুলো আরও তীব্রতর হয়ে উঠছিল। বাস্তবিকই শেষ কণ্ঠগুলো তথা সুসমাচার-নিঃসৃত কণ্ঠ জোর করে কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোল, কেননা এ যন্ত্রগুলোর মধ্য দিয়ে [পবিত্র] আত্মা তাদের জন্য আরও স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হলেন যারা পরবর্তীকালে এসেছিল; এবং তিনি ধ্বনিটা আরও বেশি তীব্র

করলেন। [পবিত্র] আত্মার দ্বারা যে যে যন্ত্র কণ্ঠগুলো ধ্বনিত করে, সেগুলো হলেন সেই নবীরা ও প্রেরিতদূতেরা যাঁদের বিষয়ে শাস্ত্র বলে, *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল তাদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাদের বচন* (ক)।

[যাত্রা ১৯:২৩-২৪ দ্রঃ]

১৬০। এবং যে কণ্ঠ মোশিকে কেবল অনির্বচনীয় রহস্যগুলো শিখতে ও স্বর্গ থেকে পাওয়া শিক্ষার বিষয়গুলো জনগণকে শেখাতে দায়িত্ব দিয়েছিল (ক), লোকের ভিড় যদি ঊর্ধ্ব থেকে আগত সেই কণ্ঠ গ্রহণ করে নিতে সক্ষম না হয়, তবে এটাও মণ্ডলীতে ব্যবহৃত পদ্ধতির মধ্যে একটা পদ্ধতি: কেননা রহস্যগুলো জানবার জন্য সবাই যে এগিয়ে যায় তা নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে ঐশশিক্ষা উপলব্ধি করতে সক্ষম একজনকে বেছে নিয়ে, সুবুদ্ধি ক্রমে তারই কাছে শ্রবণটা ন্যস্ত করা হয়, কেননা ঐশরহস্যাদি ক্ষেত্রে রহস্যাবৃত দীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে যা শোনা হয়, তা বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

১৬১। শাস্ত্রে বলে, *কেননা সবাই যে প্রেরিতদূত বা সবাই নবী তা নয়* (ক)। কিন্তু আজকালে অনেক মণ্ডলীগুলোতে এ প্রথা পালিত নয়। কেননা অনেকে যারা কৃত কর্মের বিষয়ে এখনও নিজেদের শোধন করেনি, এমনকি নিজেদের বাহ্যিক জীবনাচরণ দ্বারা দূষিত ও কলঙ্কিত, তারা বিচারশক্তিহীন ইন্দ্রিয়চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে ঈশ্বর অভিমুখে আরোহণটা করার ব্যাপারে দুঃসাহস দেখায়, যার জন্য তাদের নিজেদের সেই চিন্তা-ভাবনাই তাদের পাথর ছুড়ে মারে, কেননা ভ্রান্ত অভিমত সত্যিকারে পাথরস্বরূপ যা জঘন্য ধর্মতত্ত্বের প্রণেতাকেই অত্যাচার করে।

সেই ঘোর তমসা (যাত্রা ২০:২১ দ্রঃ)

১৬২। মোশি ঘোর তমসায় প্রবেশ করেছেন ও সেখানে ঈশ্বরকে দেখেছেন, এর অর্থ কি? কেননা এমনটা মনে হচ্ছে, এখানে বিবৃত ঘটনা কোন প্রকারে প্রথম ঐশদর্শনের বিরোধিতা করে, যেহেতু সেসময়ে ঈশ্বরত্ব আলোতে দেখা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন ঘোর তমসায় দেখা দেন। কিন্তু আমাদের এমন ভাবতে নেই যে এটা আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সুসঙ্গতির বিরোধিতা করে। কেননা এটা দ্বারা বিবরণী আমাদের এশিক্ষা দেয় যে, ধর্মভক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান যে জানতে বসেছে, তা তার কাছে শুরুতে

আলো; এজন্য আমরা মনে করি, যা কিছু ধর্মভক্তি বিরুদ্ধ তা অন্ধকার এবং তখনই আমরা অন্ধকার থেকে দূরে সরে যাই যখন আলোর অংশী হই। কিন্তু সত্যকার বিষয়গুলো সংক্রান্ত ধর্মতত্ত্ব-জ্ঞান অভিমুখে উত্তরোত্তর নিবিষ্ট ও পূর্ণতর মনোযোগে এগিয়ে যেতে যেতে ও সেইখানে গিয়ে পৌঁছে মন যতখানি সেই জ্ঞানের নিকটবর্তী হয় ততখানি ঐশস্বরূপের অদর্শনীয়তা অনুভব করে।

১৬৩। কেননা যা কিছু বাহ্যিক চেহারা মাত্র তা ছেড়ে দেওয়ার পর, ইন্দ্রিয়চেতনা যা বোঝে তা শুধু নয়, কিন্তু উপলব্ধি-শক্তি যা বিষয়ে মনে করে সে দর্শন পাচ্ছে তাও উত্তরোত্তর গভীরতর ভাবে এগিয়ে চলে যতক্ষণ উপলব্ধি-শক্তির আগ্রহী অনুসন্ধানের দ্বারা সেইখানে প্রবেশ করে যা অদৃশ্য ও দুর্জ্ঞেয়, এবং এইখানে সে ঈশ্বরকে দেখে। কেননা আমরা যা অনুসন্ধান করি, সেটার সত্যকার জ্ঞান এইখানে অর্থাৎ এই না-দেখায়-ই দেখাটায় রয়েছে, কারণ আমরা যা সন্ধান করি তা সমস্ত জ্ঞান অতিক্রম করে যেহেতু তা সবদিক দিয়ে দুর্জ্ঞেয়তা দ্বারা ঘোর তমসা দ্বারাই যেন পরিবেষ্টিত। এজন্য, যিনি একসময় এ আলোময় ঘোর তমসায় হয়েছিলেন, গভীর মনা সেই যোহনও এটা বলেন, *'ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি'* (ক); এবং এবাণী দ্বারা তিনি বলতে চাইলেন, ঐশসত্তা-জ্ঞান মানুষদের পক্ষে শুধু নয়, যেকোন চেতনাবিশিষ্ট প্রকৃতির পক্ষেও অপ্রাপণীয়।

১৬৪। এজন্য মোশি জ্ঞান দ্বারা মহত্তর হয়ে উঠে ঘোষণা করেন, তিনি ঈশ্বরকে ঘোর তমসায়ই জানেন, অর্থাৎ, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, স্বরূপে ঈশ্বরত্ব তা-ই যা সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত উপলব্ধি অতিক্রম করে। কেননা বিবরণী বলে, *মোশি সেই ঘোর তমসায় প্রবেশ করলেন যেখানে ঈশ্বর ছিলেন* (ক)। কোন্ ঈশ্বর? যিনি *অন্ধকারকে করলেন নিজেকে লুকনোর স্থান* (খ), তিনি; ঠিক তাই বলেন সেই দাউদ যিনি সেই একই গুপ্ত পুণ্যস্থানে অনির্বচনীয় রহস্যাদি উপলব্ধি করতে রহস্যাবৃত দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন।

১৬৫। সেখানে গিয়ে পৌঁছে মোশি পুনরায় ঐশ্বরিক বাণী থেকে তাই জ্ঞাত হন যা আগে ঘোর তমসার মধ্য দিয়ে জ্ঞাত হয়েছিলেন যাতে করে, আমি মনে করি, এবিষয়ক শিক্ষা ঐশকণ্ঠ দ্বারা সত্যায়িত হয়ে আমাদের জন্য আরও দৃঢ় হয়। কেননা সর্বপ্রথমে

ঐশ্বরিক বাণী এমনটা নিষেধ করে যে, মানুষ যা জ্ঞাত হয়েছে, সেইসব কিছুর একটা বিষয়ের সঙ্গেও ঈশ্বরত্বকে সদৃশ না করে, কারণ অনুমান বা কল্পনা জনিত বোধগম্য দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ঐশস্বরূপ বিষয়ে উপস্থাপিত যেকোন ধারণা ঈশ্বর বিষয়ে মিথ্যা ছবি দেয় ও ঈশ্বরকে ঘোষণা করে না।

১৬৬। সুতরাং, যেহেতু ধর্মভক্তিতে স্থাপিত সদ্‌গুণ দুই ভাগে বিভক্ত তথা ঈশ্বর বিষয়ক ধর্মতত্ত্ব ও আচরণ-সংস্কার (কেননা জীবনধারণ শোধন করাও ধর্মভক্তির একটা অংশ), সেজন্য মোশি তাই জ্ঞাত হন যা ঈশ্বরকে জানবার জন্য দরকার, অর্থাৎ, তাঁকে জানা বলতে মানবীয় উপলব্ধি অনুযায়ী পাওয়া কোনও জ্ঞানের অধিকারী না হওয়া বোঝায়; পরে তিনি সদ্‌গুণের দ্বিতীয় দিক জ্ঞাত হন তথা তিনি শেখেন, সদ্‌গুণ বিশিষ্ট জীবনকে কোন্ আচরণ দ্বারা শুভ লক্ষ্যের দিকে চালিত করা হয়।

১৬৭। এই অভিজ্ঞতার পর মোশি মানুষের হাতে তৈরী নয় সেই তাঁবুতে গিয়ে পোঁছোন। যখন তিনি এসমস্ত বিষয়ের মধ্য দিয়ে চলেন ও মনে তত উচ্চ উচ্চতায় নিজেকে উত্তোলিত করেন, তখন কে তাঁর অনুসরণ করবে? তিনি কেমন যেন চূড়া থেকে চূড়ায় পার হয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে চলতে চলতে নিজের চেয়ে উচ্চ হন। আগে, আরোহণ করার জন্য যারা বেশি দুর্বল ছিল তাদের থেকে নিজেকে পৃথক করায় তিনি পর্বতের পাদতল ছেড়ে যান; পরে উচ্চ থেকে আরও উচ্চতর স্থানে আরোহণ করে তিনি তুরির কণ্ঠ কানে গ্রহণ করে নেন। পরে ঐশজ্ঞানের অদৃশ্য পুণ্যালয়ে প্রবেশ করেন, কিন্তু এখানেও থেমে না গিয়ে সেই তাঁবুতে পার হন যা মানুষের হাতে তৈরী নয় (ক); প্রকৃতপক্ষে, যে কেউ এসমস্ত আরোহণ দ্বারা নিজেকে উত্তোলিত করেছে, সে শুধু এই ক্ষণেই সীমায় পোঁছোয়।

১৬৮। অন্যদিকে আমি মনে করি, যে বোঝে, স্বর্গীয় তুরি তাকে অন্যভাবেও মানুষের হাতে তৈরী নয় এমন বিষয়গুলোতে পোঁছোবার উত্তরণ-পথ শেখায়। কেননা স্বর্গীয় বিস্ময়কর বিষয়গুলোর সমষ্টি সেই প্রজ্ঞাকে ঘোষণা করে যা বিশ্বে নিজের উজ্জ্বলতা ছড়ায় ও দৃশ্য বিষয়ের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহৎ গৌরব বর্ণনা করে, যেমনটা লেখা আছে, *স্বর্গ বর্ণনা করে ঈশ্বরের গৌরব* (ক)। নিজের সুস্পষ্ট ও সুললিত শিক্ষা দ্বারা

সেই গৌরব উদাত্ত কণ্ঠের সেই তুরি হয়ে ওঠে, যেভাবে নবীদের একজন বলেন, ‘*ঊর্ধ্ব থেকে স্বর্গ তুরি বাজাল*’ (খ)।

১৬৯। কিন্তু যে কেউ হৃদয়ের শ্রবণশক্তি পরিশুদ্ধ ও সচেতন করেছে, সে এই শব্দ শোনার পর (আমি তাই বলছি যা ঈশ্বরের পরাক্রম জ্ঞাত করার জন্য বিশ্ব-জ্ঞান থেকে আসে) এই শব্দ দ্বারা পরিচালিত হয় যতক্ষণ না মনে সেইখানে প্রবেশ করে যেখানে ঈশ্বর আছেন। যেমন আগে বলেছি, দুর্জ্ঞেয়তা ও অদর্শনীয়তা নির্দেশ করার জন্য এ স্থান শাস্ত্র দ্বারা ঘোর তমসা বলে অভিহিত, এবং সেই ঘোর তমসায় গিয়ে পৌঁছে মোশি মানুষের হাতে তৈরী নয় সেই তাঁবু দেখেন, সেই যে তাঁবুর কথা তিনি মানবীয় নকশার মধ্য দিয়ে নিম্নস্থিত লোকদের জ্ঞাত করবেন।

সেই স্বর্গীয় তাঁবু

১৭০। তাই, কেমন ছিল মানুষের হাতে তৈরী নয় সেই তাঁবু যা পর্বতে মোশিকে দেখানো হয়েছিল, ও যার অনুকরণে, নমুনা হিসাবে, তাঁকে মানুষের হাতে তৈরী কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের হাতে তৈরী নয় সেই বিস্ময়কর কাজ জানাবার আদেশ দেওয়া হয়? বস্তুত তাঁকে বলা হয়, ‘*লক্ষ রাখ, এই সবগুলোর যে নমুনা তোমাকে পর্বতে দেখানো হয়েছে, এই সবকিছু তুমি যেন সেই অনুসারে কর*’ (ক)। সোনার স্তম্ভগুলো রুপোর চুঙির উপরে বসানো ছিল ও মাথলায় আবার রুপোতে মোড়া ছিল। পরে আরও কতগুলো স্তম্ভ যেগুলোর চুঙি ও মাথলা ছিল ব্রঞ্জের, ও মধ্যবর্তী অংশ রুপোর ছিল। সবগুলোর অপচনশীল কাঠের অভ্যন্তরীণ একটা অবলম্বন ছিল, ও বাইরে সেগুলোর চারপাশে এসমস্ত ধাতুর উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ত।

১৭১। একই উজ্জ্বলতায় খাঁটি সোনার একটা মঞ্জুষাও উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল, ও সোনার যে অবলম্বন তাও অপচনশীল কাঠেরই ছিল। তাছাড়া একটা দীপাধার ছিল: চুঙিতে তা একটা মাত্র, কিন্তু উপরি ভাগে তা সাতটা শাখায় বিভক্ত ছিল ও সেটার এক একটা শাখায় সাতটা প্রদীপ ধারণ করে রাখত (ক)। দীপাধার সোনার ছিল, ভিতরে ফাঁপা ছিল না, কাঠ দ্বারাও ধারণ করে রাখা নয়। তাছাড়া, বেদি, প্রায়শ্চিত্তাসন ও সেই খেরুব দু'টো যেগুলোর পাখা মঞ্জুষাকে ঢেকে রাখত (খ): সেগুলোও সোনার ছিল, ও বাহ্যিক

উজ্জ্বলতা ও রঙ শুধু দেখাচ্ছিল না কিন্তু সবকিছু আস্ত সোনারই ছিল ও অভ্যন্তরের সবচেয়ে অভ্যন্তরীণ স্থান পর্যন্তই প্রসারিত ছিল।

১৭২। উপরন্তু, নানা রঙের পরদা ছিল যা নিপুণ কারুশিল্পীর বুনানিতে বোনা, বিবিধ ফুলও ছিল যা বুনানিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য মালার মত শেকলে বিজড়িত ছিল। এগুলো তাঁবুতে সেই দৃশ্যগত অংশ বিভক্ত করত যা গুপ্ত ও অপ্রেবেশ্য স্থান থেকে কয়েকজন যাজকের পক্ষে প্রবেশযোগ্য ছিল। পূর্ববর্তী অংশের নাম ছিল 'পবিত্রস্থান', গুপ্ত অংশের নাম ছিল 'পরম পবিত্রস্থান'। আরও, সেই নানা প্রক্ষালনপাত্র, অঙ্গারধানী, পরদার বাইরের অংশের কাপড়, ছাগলোমের কাপড় ও রক্তলাল চামড়াও ছিল; এবং নিজের কথা দিয়ে মোশি যে আর কত না কিছু ব্যবস্থা করলেন, কার্ মন তা সূক্ষ্ম রূপে ধারণা করতে পারবে?

১৭৩। কিন্তু, এসমস্ত বস্তু মানুষের হাতে তৈরী নয় এমন কোন্ বিষয়ের অনুকরণ ছিল? এবং মোশি দ্বারা যা দৃষ্ট হয়েছিল, সেটার মানবীয় অনুকরণ যারা দেখে, তা তাদের কী উপকারিতা দেবে? আমার দিক দিয়ে, আমি এক্ষেত্রে যথাযথ উত্তর তাদেরই কাছে রাখা উপযোগী মনে করি যারা [পবিত্র] আত্মার পরাক্রমে ঈশ্বরের গভীরতা তলিয়ে দেখতে সক্ষম [ক], অবশ্যই, যদি এমন কেউ থাকে যে, প্রেরিতদূতের কথামত, [পবিত্র] আত্মা দ্বারা রহস্যগুলো প্রকাশ করতে পারে [খ]। আমরা, এবিষয়ে কয়েকটা আন্দাজ ও আনুমানিক উত্তর উপস্থাপন ক'রে, গ্রহণযোগ্য বা অস্বীকার্য বলে এগুলো মূল্যায়ন করার ভার পাঠকদের কাছে রাখি, তারই অভিমত অনুসারে যে বিচার করতে বিচক্ষণ।

১৭৪। সুতরাং, যেহেতু পল এ রহস্য আংশিক ভাবে প্রকাশ করেন, সেজন্য, যা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে তা থেকে সামান্য সূত্র ধরে আমরা এটা বলি যে, যে তাঁবু বিশ্বকে ঘিরে রাখে, প্রতীকের খাতিরে মোশি আগে থেকে সেই তাঁবু সংক্রান্ত রহস্য জানলেন। তাঁবুটা হলেন সেই খ্রিষ্ট যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা [ক], সেই যে তাঁবু স্ব-স্বরূপে মানুষের হাতে তৈরী না হওয়ায় তখনই বিশ্বের বশীভূত হবেন বলে মেনে নিলেন যখন এ তাঁবুকে আমাদের মাঝে স্থাপিত হতে হল, যার ফলে এই তাঁবু একপ্রকারে অসৃষ্ট

ও সৃষ্ট: পূর্বাস্তিত্বশীল বলে অসৃষ্ট এ তাঁবু জড় বস্তুগত অবকাঠামোর কারণে সৃষ্ট হয়ে গেল।

আমি মনে করি, যারা আমাদের বিশ্বাসের রহস্য যথার্থ ভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, আমি যা বলছি, তা তাদের কাছে অস্পষ্ট হবে না।

১৭৫। কেননা সবকিছুর মধ্যে একটামাত্রই রয়েছে যা কালের পূর্বে অস্তিত্বশীল ছিল ও অন্তিমকালে সৃষ্ট হয়েছে (ক) যদিও কালের সীমায় সৃষ্ট হওয়া তার পক্ষে আদৌ দরকার ছিল না। কেননা যা কাল ও যুগগুলোর পূর্বে অস্তিত্বশীল ছিল, তার পক্ষে কালের অধীন জন্ম কেমন দরকার হতে পারত? আমরা যারা নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজেদের অস্তিত্বে দূষিত হয়েছিলাম, আমাদের খাতিরে তা আমাদের মত সৃষ্ট হতে সম্মত হয়েছিল যাতে, যা অস্তিত্বের বাইরে ছিল তা পুনরায় অস্তিত্বে ফিরিয়ে আনতে পারে। এটি হলেন সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর যিনি নিজেতে বিশ্বকে ধারণ করে রাখেন কিন্তু নিজের তাঁবু আমাদের মাঝে স্থাপনও করেছেন (খ)।

১৭৬। তেমন মঙ্গলদান তাঁবু বলে সংজ্ঞায়িত হতে শুনে খ্রিষ্টের বন্ধু কম্পিত না হোক, কেমন যেন এ শব্দের অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপের মহত্ত্ব হ্রাসীকৃত করে। কেননা এ স্বরূপ নির্দেশিত করার জন্য অন্য কোন নাম যোগ্য নয়, বরং সবগুলো সমানভাবে উপযোগী সংজ্ঞা দিতে অসমর্থ, নামগুলো সেগুলো হোক যা আমরা কম গুরুত্বের অধিকারী বলে মনে করি, বা সেগুলো হোক যেগুলোতে আমরা ধারণার কোন মহত্ত্ব দেখি বলে মনে করি।

১৭৭। কিন্তু সেই অন্যান্য নামের বেলায় যেমন, যেগুলো এক একটা নিজ নিজ বিশিষ্ট অর্থ সহ ঈশ্বরের পরাক্রম নির্দেশ করার জন্য যথার্থ মনোভাবে উচ্চারিত হয়—যেমন চিকিৎসক, পালক, রক্ষাকর্তা, রুটি, আঙুরলতা, পথ, দরজা, আবাস, জল, শৈল, উৎস ও তাঁর বিষয়ে যত নাম উচ্চারিত হয়—তেমনি ঈশ্বরের যোগ্য অর্থ অনুযায়ী তাঁকে তাঁবু নাম দ্বারাও নির্দেশ করা হয়। কেননা যে পরাক্রম সেই বিশ্বকে ধারণ করে থাকে যেখানে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা বসবাস করে (ক), সবকিছুর সাধারণ যে রক্ষা নিজেতে সবকিছু ধারণ করে থাকে, তা যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাঁবু বলে নির্দেশিত।

১৭৮। দর্শনটা যে এনামের সঙ্গে মিল রাখে তা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু দৃশ্য অন্যান্য সমস্ত কিছু ঈশ্বরের যোগ্য ধারণার দর্শনে চালনা করে। যেহেতু সেই মহান প্রেরিতদূত এটা বলেন যে, নিম্ন তাঁবুর পরদা হল মাংস এই কারণে যে তা সেই বৈচিত্র্যময় সুতো দিয়ে গঠিত যেগুলো, আমার মতে, সেই চার পদার্থ নির্দেশ করে (এমনটা হতে পারে, তিনিও সেই স্বর্গীয় পুণ্যালয়ে স্থিত তাঁবুর দর্শন পেয়েছিলেন (ক) যেখানে [পবিত্র] আত্মা তাঁকে পরমদেশের রহস্যগুলো প্রকাশ করলেন (খ)), সেজন্য এই আংশিক ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে তাঁবুর সমস্ত ব্যাখ্যা উপযোগী করা বাঞ্ছনীয় হবে।

১৭৯। তবেই, এবারও প্রেরিতদূতের বাণী গুণে, তাঁবু সংক্রান্ত প্রতীক আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কেননা যাঁর বিষয়ে আমরা শিখেছি তিনি তাঁবু দ্বারা নির্দেশিত, সেই একমাত্র জনিতজন সম্পর্কে তিনি এক স্থানে বলেন, '*দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে— যত সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব—সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে*' (ক)। সেজন্য রুপোয় উজ্জ্বল ও সোনায় মোড়া স্তম্ভগুলো, এবং সমস্ত অবলম্বন, কড়া ও সেই খেরুব দু'টো যেগুলো নিজেদের পাখায় মঞ্জুষা গুপ্ত রাখত, ও বাকি সমস্ত বস্তু যা তাঁবু-নির্মাণ বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত, যদি একজন ঊর্ধ্বতর বিষয়গুলোকে লক্ষ করে, তবে সেই সমস্ত কিছু হল সেই স্বর্গীয় বিষয়গুলো যা তাঁবুতে দৃষ্ট ও ঐশইচ্ছা ক্রমে বিশ্বকে ধারণ করে রাখে।

১৮০। কেননা সেইখানে রয়েছে আমাদের সত্যকার অবলম্বন, সেই যে অবলম্বনগুলো তাদেরই সেবায় প্রেরিত যারা উত্তরাধিকার রূপে পরিত্রাণ পাবে (ক), সেই যে অবলম্বনগুলো আমাদের প্রাণের সঙ্গে অর্থাৎ যারা পরিত্রাণ পায় তাদেরই সঙ্গে কড়া যেনই সংযুক্ত হয়ে নিজে থেকে সদ্‌গুণের উচ্চতায় তাদের উচ্চ করে যারা মাটিতে শায়িত। পরে, যে দুই খেরুব পাখা দিয়ে সাক্ষ্য-তাঁবুতে সংরক্ষিত গুপ্ত বস্তুগুলো লুক্কায়িত রাখে (খ), সেই দুই খেরুব সম্পর্কে কথা বলে বর্ণনা তাঁবু বিষয়ে আমাদের দেওয়া ব্যাখ্যা সত্য বলে প্রমাণিত করতে পারে। কেননা আমরা জানতে পেরেছি যে, এটা সেই পরাক্রমগুলোর নাম, সেই যে পরাক্রমগুলোকে ঐশ স্বরূপের চারপাশে দেখা যায় ও যা ইশাইয়া ও এজেকিয়েল কোন রকমে দর্শন করতে পেরেছিলেন (গ)।

১৮১। এবং সন্ধি-তাঁবুটা যে সেই পাখা দ্বারা লুক্কায়িত রয়েছে, তা শ্রোতাকে বিহ্বল না করুক, কারণ সেই পাখা দু'টো বিষয়ে আমরা ইশাইয়া থেকে একই ধারণা জ্ঞাত হতে

পারি যা নবী দ্বারা প্রতীকাকারে ব্যক্ত (ক)। কেননা সেই ধারণা এখানে সন্ধি-তাঁবু বলে নির্দেশিত, সেখানে এমন মুখমণ্ডল বলে নির্দেশিত যা দুই পাখা দ্বারা আবৃত। যা এখানে মঞ্জুষা ও ওখানে মুখমণ্ডল নির্দেশিত, যেহেতু পদ দু'টোতে তা একই ধারণা বহন করে, সেজন্য আমার মতে তা প্রতীকাকারে এটা নির্দেশ করে যে, অনির্বচনীয় বিষয়গুলো সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনীয় নয়। এবং তুমি যখন সেই বিবিধ প্রদীপের কথা শোন যেগুলোর একটামাত্র অবলম্বন হল সেই দীপাধার যাতে করে চারদিকে সর্বত্রই অপর্যাপ্ত ও আশ্চর্যময় আলো ছড়িয়ে দিতে পারে, তখন ইশাইয়া যেমন [পবিত্র] আত্মার আলো সাতটা প্রদীপে পৃথক পৃথক করেন (খ), তেমনি তুমি যদি এমনটা ভাব, এ তাঁবুতে পবিত্র আত্মার বহুবিধ রশ্মিমালা বিভাসিত (গ), তাহলে ভুল করবে না।

১৮২। আমি মনে করি, প্রায়শ্চিত্তাসন বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দরকার হয় না, কেননা প্রেরিতদূত রহস্যটা অনাবৃত করে বলেন, '*তাঁকেই ঈশ্বর প্রায়শ্চিত্তাসন রূপে স্থাপন করেছেন*' (ক)। এবং বেদি ও ধূপদানির কথা শুনে আমি সেই উপাসনার কথা ভাবি যা স্বর্গীয় প্রাণীরা এ তাঁবুর প্রতি অবিরতই অর্পণ করেন। কেননা তিনি বলেন, মর্তের ও ভূগর্ভের প্রাণীদের জিহ্বা শুধু নয়, কিন্তু স্বর্গীয় প্রাণীদেরও জিহ্বা তাঁরই প্রতি প্রশংসা উত্তোলন করেন যিনি সমস্ত কিছুর আদি (খ)। এটাই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় যজ্ঞ, ও প্রেরিতদূতের কথামত, ওষ্ঠের ফল ও প্রার্থনার সৌরভ (গ)।

১৮৩। এবং যখন এসমস্ত বস্তুর মধ্যে রক্তলাল রঙে রঞ্জিত চামড়া ও বোনা ছাগলোম দেখ, তখন এভাবে যে ব্যাখ্যার সুসঙ্গতি শেষ হয় তাও নয়। কেননা যে কেউ নবীয় চোখ দিয়ে ঐশ বিষয়গুলো সন্দর্শনে মগ্ন, সে সেই পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগও পূর্বনিরূপিত বলে দেখতে পাবে যা উভয় বস্তু দ্বারা নির্দেশিত, কেননা রক্তলাল রঙ হল রক্তের প্রতীক, ও ছাগলোম হল মৃত্যুর প্রতীক। দেহে স্থিত ছাগলোমের কোন অনুভূতি নেই, সেইজন্য তা উপযোগীভাবে হল মৃত্যুর প্রতীক।

সেই পার্থিব তাঁবু

১৮৪। যখন নবী উপরি তাঁবু লক্ষ করেন, তখন তিনি এ সমস্ত প্রতীকের ভিত্তিতেই তা গণ্য করেন। এবং পরে যখন নিম্ন তাঁবুর দিকে দৃষ্টি ফেরান, তখন, যেহেতু পল

একাধিকবার মণ্ডলীকে খ্রিষ্ট নাম আরোপ করেন [ক], তখন তিনি উপযুক্ত ভাবেই এটা ভাববেন যে, এ নামগুলো ঐশ রহস্যের সেই সকল ব্যাখ্যাতাকে নির্দেশ করে ঐশ্বরিক বাণী যাঁদের মণ্ডলীর স্তম্ভ, প্রেরিতদূত, শিক্ষাগুরু ও নবী [খ] বলেও অভিহিত করে। কেননা কেবল পিতর, যাকোব ও যোহন যে মণ্ডলীর স্তম্ভ তা নয়, কেবল বাপ্তিস্মদাতা যোহনও যে জ্বলন্ত প্রদীপ তা নয়; কিন্তু যারা নিজেদের বলে মণ্ডলীকে ধারণ করে রাখে ও নিজেদের কর্মকাণ্ডে তাকে আলোকিত করে, তারা সবাই স্তম্ভ ও জ্যোতিষ্ক [গ] বলে অভিহিত। প্রভু প্রেরিতদূতদের উদ্দেশ করে বলেন, '*তোমরা জগতের আলো*' [ঘ], এবং '*সুস্থির হও, অটল হয়ে থাক*' [ঙ] ব'লে ঐশ প্রেরিতদূত অন্যান্যদেরও স্তম্ভ হতে আহ্বান করেন, এবং তিমথিকে সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি ক'রে [চ] সুন্দর স্তম্ভ করে তুলেছিলেন।

১৮৫। এই তাঁবুতে সকাল ও সন্ধ্যায় অবিরতই স্তুতি-যজ্ঞ ও প্রার্থনার ধূপ দেখা যেতে পারে; সেই মহান দাউদ এসমস্তও আমাদের দেখতে দেন যখন ঈশ্বরের কাছে সুরভিত প্রার্থনার ধূপ নিবেদন করেন ও উত্তোলিত হাতে [ক] যজ্ঞরীতি সম্পাদন করেন। এবং যে কেউ প্রক্ষালনপাত্রের কথা শোনে, সে অবশ্যই তাদের কথা ভাববে যারা রহস্যাবৃত [অর্থাৎ সাক্রামেন্তীয়] জল দ্বারা পাপের কালিমা থেকে নিজেদের ধৌত করে। প্রক্ষালনপাত্র ছিলেন সেই যোহন যিনি যর্দনে মনপরিবর্তনের বাপ্তিস্ম দিয়ে লোকদের শুচীকৃত করতেন [খ]; প্রক্ষালনপাত্র ছিলেন সেই পিতর যিনি একভাবেই তিন হাজার মানুষকে বাপ্তিস্মে চালিত করলেন [গ]; কান্দারের প্রক্ষালনপাত্র ছিলেন সেই ফিলিপ [ঘ] এবং সেই অনুসারে যাঁরা অনুগ্রহ-কর্ম অনুশীলন করেন, তাঁরা সবাই তাদেরই জন্য প্রক্ষালনপাত্র হলেন যারা ঐশ্বরিক দানের অংশী হয়।

১৮৬। সেই যে কাপড়গুলো নিজেদের মধ্যে একত্র হয়ে তাঁবুকে ঘিরে রাখে, কেউই সেগুলোর যথার্থ অর্থ ভুল করবে না যখন সেগুলোকে ভালবাসায় ও শান্তিতে বিশ্বাসীদের মিল বলে ব্যাখ্যা করে; দাউদ ঠিক সেই অনুসারে ব্যাখ্যা করে বলেন, '*তিনি নিজের সীমানা হিসাবে শান্তি স্থাপন করেছেন*' [ক]।

১৮৭। রক্তলাল রঙে রঞ্জিত যে চামড়া ও ছাগলোমের যে কাপড় তাঁবুর অলঙ্কারে সহযোগিতা দান করে, সেগুলো এক একটা হল পাপী মাংসের মৃত্যুকরণ [ক] যার প্রতীক হল রক্তলাল চামড়া, ও সংযম অনুযায়ী কঠোর জীবনধারণ যা দ্বারা বিশেষভাবে মণ্ডলীর

তাঁবুই ভূষিত করা হয়। কেননা প্রকৃতি অনুসারে যে চামড়া নিজে থেকে জীবনের সাধ্যের অধিকারী নয়, সেই চামড়া রক্তলাল রঙের ফলে হয়ে ওঠে উজ্জ্বল লাল বিশিষ্ট, তাতে আমরা শিখি যে, অনুগ্রহ [পবিত্র] আত্মা দ্বারা কেবল তাদেরই মধ্যে পুষ্পিত হয় যারা পাপের কাছে নিজেদের মৃত করেছে। এবং বিবরণী যে রক্তলাল রঙ দিয়ে আত্মসংযম ও শালীনতা নির্দেশ করতে পারে, আমার মতে, যারা ইচ্ছা করে তারা তা বিচার করুক। যে বোনা ছাগলোম বুনানিকে শক্ত ও কড়া করে, তা এ কঠিন আত্মসংযমের প্রতীক হয় যা আমাদের পরিচিত ভাবাবেগ ধ্বংস করে। চিরকৌমার্য অনুযায়ী যে জীবন মৃত্যুকরণ দ্বারা চিরকৌমার্য-পালনকারীদের মাংসকে কষ্ট দেয় [খ], তা এসমস্ত কিছু নিজেতেই দেখায়।

১৮৮। পরম পবিত্রস্থান বলে অভিহিত তাঁবুর অভ্যন্তরীণ অংশ যে অধিকাংশ লোকদের পক্ষে অপ্রবেশ্য হয়, তাও আমরা ব্যাখ্যার সুসঙ্গতির বিরোধী বলে গণ্য করব না; কেননা সত্ত্ব বিষয়ক সত্য সত্যিই পবিত্র বিষয় ও পবিত্র বিষয়গুলোর মধ্যে পবিত্র, এবং তা অধিকাংশ লোকদের পক্ষে ধারণার অতীত ও অপ্রবেশ্য। যেহেতু সেই সত্য রহস্য-তাঁবুর সবচেয়ে অভ্যন্তরীণ ও গুপ্ত স্থানগুলোতে স্থিত, সেজন্য যা কিছু আমাদের উপলব্ধি-ক্ষমতা অতিক্রম করে, সেই বিষয়ে জ্ঞান-অর্জন আমাদের পক্ষে অনুপযোগী প্রচেষ্টা, বরং এটা বিশ্বাস করি যে, যা অনুসন্ধান করি তা আছে, তবু তা সকলের চোখে প্রদর্শিত নয়, কিন্তু তা চিন্তা-ভাবনার গুপ্ত স্থানে অনির্বচনীয় ভাবে বিরাজ করে।

যাজকীয় পোশাক (যাত্রা ২৮:১ ইত্যাদি দ্রঃ)

১৮৯। মোশির প্রাণের শুচীকৃত চোখ এবিষয়ে ও সদৃশ অন্যান্য বিষয়ে তাঁবুর দর্শন দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে ও তেমন দৃশ্য দ্বারা উত্তোলিত হয়ে, যাজকীয় পোশাক বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়ে অন্যান্য ধারণার চূড়ায় পুনরায় আরোহণ করে। এ পোশাকগুলোর মধ্যে রয়েছে জামা, এফোদ, ও মূল্যবান পাথরের বৈচিত্র্যময় উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান সেই বিখ্যাত বুকপাটা, মাথা-ঘিরে সেই ফিতা ও সেটার উপরে স্থিত পাত, জাঙাল, ডালিম, কিঙ্কিণি, পরে, সবকিছুর উপরে, সেই উক্তি ও সেই বিচার ও সেই সত্য যা উক্তি ও

বিচারের দ্বারা পরিচিত হয়, এবং দু’ পাশে যুক্ত করা সেই স্কন্ধপটি যাতে খোদাই করা ছিল পিতৃকুলপতিদের নাম।

১৯০। সাজসজ্জার নানা অংশের নামগুলো নিজে থেকেই এক একটা বিষয়ের পুরো ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন করে, কেননা বিচার, উক্তি ও সত্য নামত্রয়ের মত নাম কোন্ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর জন্য উপযোগী হতে পারে? নামত্রয় নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট ভাবে দেখায় যে, বিবরণী সেই নামত্রয়ের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা উপলব্ধ একটা পোশাক বিবৃত করে না, বরং প্রাণেরই এমন ভূষণ নির্দেশ করে যা সদ্‌গুণ অনুযায়ী সাধিত কর্মে বোনা।

১৯১। নীল হল পায়ে পর্যন্ত লম্বা জামার রঙ। আমাদের পূর্বসূরী কোন না কোন ব্যাখ্যাতা এমনটা সমর্থন করে যে, এ রঙ দ্বারা বিবরণী হাওয়া নির্দেশ করতে চায়। আমার দিক দিয়ে, আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না এই উজ্জ্বল রঙ হাওয়ার রঙের সঙ্গে কোন মিল রাখে কিনা। তবু আমি সেই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করি না, কারণ যে ব্যাখ্যা সদ্‌গুণ লক্ষ করে, ধারণাটা সেই ব্যাখ্যার উপযোগী। কেননা যে কেউ ঈশ্বরের কাছে নিজেকে পবিত্রীকৃত করতে ও নিজের দেহকে যজ্ঞের জন্য উৎসর্গ করতে ও জীবন্ত যজ্ঞে ও যুক্তিসঙ্গত উপাসনায় মৃত নয় এমন বলি নিজেই হতে ইচ্ছা করে (ক), ধারণাটা এমন দাবি রাখে সে যেন জাগতিক ও মাংসের সুখভোগে উৎসর্গীকৃত আচরণ দ্বারা নিজের প্রাণকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, কিন্তু সে যেন শুচী আচরণ দ্বারা জীবনের সমস্ত কাজকর্ম সূক্ষ্ম করে তোলে এবং এ দৈহিক প্রকৃতিকে মাকড়সার জালের মত পুনরায় বুনতে বুনতে যা হালকা, হাওয়াময় ও চিক্কণ সেটারই কাছে এগিয়ে যায়, যাতে করে, আমরা যখন শেষ তুরি শুনব, তখন, যিনি আদেশ করেন, তাঁর কণ্ঠের কাছে যেন কোন বোঝা দ্বারা মর্তে আকর্ষিত না হয়ে বরং চিক্কণ ও হালকা অবস্থায় প্রভুর সঙ্গে, ঊর্ধ্বে, বায়ুলোকে উত্তোলিত হই (খ)। কেননা সামসঙ্গীত-রচয়িতার কথা মত যে কেউ নিজের প্রাণ মাকড়সার জালের মত নিঃশেষ করেছে (গ), সে সেই হাওয়াময় জামা পরিধান করেছে যা মাথা থেকে পায়ে পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৯২। কেননা বিধান এমনটা ইচ্ছা করে না, সদ্‌গুণ কাটা হোক। ডালিমের সঙ্গে মালার মত সংযুক্ত সেই সোনার কিঙ্কিণিগুলো হল শুভকর্মের দীপ্তি। কেননা যা

সংযোগের ফলে সদ্‌গুণ হয়, সেই কাজকর্ম দু'টো হল ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস ও জীবন বিষয়ে সদ্বিবেক। মহান পল তখনই এই কিঙ্কিণি ও ডালিম তিমথির পোশাকে উপযোগী করেন যখন তাঁকে বিশ্বাস ও সদ্বিবেকের অধিকারী হতে বলেন (ক)। এজন্য পবিত্র ত্রিত্বকে ঘোষণায় বিশ্বাস শুচি ও উদাত্ত ভাবে ধ্বনিত হোক, ও জীবন ডালিম ফলের প্রকৃতি অনুকরণ করুক।

১৯৩। শক্ত ও রেখাবিশিষ্ট ছালে অন্তর্ভুক্ত সেই ডালিম ফল দেখতে অখাদ্য, কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ অংশ ফলের বৈচিত্র্যময় ও মিলবিশিষ্ট অবস্থার জন্য দেখতে মিষ্টি, এমনকি স্বাদে তা এমনভাবে আরও বেশি মিষ্টি যে, তাতে ইন্দ্রিয়ও মিষ্ট হয়। প্রজ্ঞাময় ও কঠোর জীবনধারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর কাছে অগ্রহণীয় ও অরুচিকর হয়েও তবু যখন সময়মত পুষ্পিত হয় তখন তা শুভ প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ। কেননা যিনি আমাদের চাষ করেন যখন তিনি জীবনের ডালিম খুলে দেন ও সেটার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দেখিয়ে দেন, তখন যে কেউ সেই ফল ভোগ করে তার কাছে সেই ফলের অংশী হওয়া মিষ্টি লাগে। কেননা ঐশ প্রেরিতদূতও এবিষয়ে বলেন, 'কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়' : যে কেউ ডালিম স্পর্শ করে এটা হল তার প্রথম সংস্পর্শ-জনিত ভাব, '*তবু পরে সেই শাসন এনে দেয় শান্তির ফল*' (ক) : এটা হল অভ্যন্তরীণ সেই অংশের মিষ্টতা, যা খেতে রুচিকর।

১৯৪। বিধান দাবি করে, এই জামা নানা ঝালরে অলঙ্কৃত হোক। ঝালরটা এমন গোলাকার অলঙ্কার যা উপকারিতার জন্য নয়, ভূষণ হিসাবেই পোশাকে যুক্ত করা হয়। এতে আমরা এটা শিখি যে, সদ্‌গুণ শুধু দেওয়া আজ্ঞার সঙ্গে পরিমাপ করতে নেই, কিন্তু সেই আজ্ঞার বাইরে আমরা যা করব বলে মনস্থ করি, আমাদের পক্ষ থেকে তা নিয়ে এমন কিছু খুঁজে বের করা দরকার যাতে পোশাকে অলঙ্কার হিসাবে যুক্ত করা হয়, ঠিক সেইভাবে যেইভাবে পল ব্যবহার করতেন, কেননা তিনি নিজের পক্ষ থেকে সুন্দর ঝালর আজ্ঞাগুলোতে যোগ করতেন (ক)। কেননা বিধান এটা জারি করে, যে যজ্ঞবেদিতে কাজ করে, সে বেদির ফলের ভাগী হবে ও যারা সুসমাচার প্রচার করে, সুসমাচার-প্রচারই হবে তাদের জীবিকা (খ), কিন্তু পল ক্ষুধা, পিপাসা ও বস্ত্রহীনতা ভোগ করেও

সুসমাচারকে কোন মজুরি প্রত্যাশা না করেই অর্পণ করেন (গ)। আজ্ঞাগুলোর জামা ভূষিত করার জন্য এগুলোই সেই ঝালর যা আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে যোগ করি।

১৯৫। উপর থেকে দু'টো কাপড় পোশাকের উপরে পড়ছিল যা কাঁধ থেকে বুক ও মধ্য পিঠ পর্যন্ত নামছিল ও যেগুলো এক কাঁধে দু'টো বন্ধনী দ্বারা যুক্ত ছিল। সেই দুই বন্ধনী এমন মূল্যবান মণিমুক্তা যা এক একটা ছয় পিতৃকুলপতির খোদাই করা নাম বহন করত। সেই কাপড়ের বুনানি বৈচিত্র্যময় ছিল: নীল রঙ বেগুনি রঙের সঙ্গে মেশে, রক্তলাল রঙ ক্ষোম-সুতোর সিঁদুরে-লালের সঙ্গে মিল রাখে, সোনার এক সুতো এসমস্ত রঙের সঙ্গে বোনা রয়েছে, এর ফলে সেই বুনানি থেকে একক ধরনের এমন সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ে যা এসমস্ত রঙের মিশ্রণে গঠিত।

১৯৬। এথেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা এ: পোশাকের উপরি যে অংশ ন্যায়সঙ্গত ভাবে হৃদয়ের সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা বহু ও ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গুণের মিশ্রণ থেকে আসে: নীল বেগুনির সঙ্গে মিশে যায়, এবং প্রকৃতপক্ষে শুচি জীবনের সঙ্গে রাজ যোগ্য আচরণ যোগ দেয়; রক্তলাল সিঁদুরে-লালের সঙ্গে মিশে যায়, কারণ জীবনের উজ্জ্বলতা ও শুচিতা প্রকৃতিগত ভাবে শালীনতার লাল রঙের পাশাপাশি গজিয়ে ওঠে। অবশেষে আসে সেই সোনা যা এসমস্ত রঙের মধ্যে উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে সেই ধনের প্রতীক হয় যা এ জীবনধারণে গুপ্ত। কাঁধে খোদাই করা পিতৃকুলপতিদের নামগুলো আমাদের এই অলঙ্কারে কম অবদান রাখে না, কেননা মানুষের জীবন বিশেষভাবে সেই মঙ্গলের দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজেকে ভূষিত করে যা সেই প্রতীকগুলো পূর্বঘোষণা করেছিল।

১৯৭। কাপড় দু'টো নিয়ে গঠিত অলঙ্কারের উপরে আরও একটা অলঙ্কার নেমে পড়ে তথা, সোনার এমন ছোট্ট ঢালগুলো যা স্কন্ধপটি দু'টোর উভয় পাশ থেকে নামে ও নিজেদের মধ্যে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এমন একটা সোনার বস্তু ধারণ করে রাখে যা সারি সারি ভাবে বিন্যস্ত বারো মণিমুক্তায় উজ্জ্বল; এক একটা মুক্তা তিনটে পাথর ধারণ করত, ও এগুলোর মধ্যে এমন একটাও দেখা যেতে পারত না যা অন্য একটার সদৃশ, কিন্তু এক একটা নিজ নিজ দীপ্তিতে অলঙ্কৃত ছিল। এটা সেই অলঙ্কারের রূপ।

১৯৮। কাঁধ থেকে নেমে আসা ঢালগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণা প্রতীকমূলক ভাবে এমনটা নির্দেশ করে যে, বিরোধীর বিরুদ্ধে যে বক্ষস্ত্রাণ তা দু' দিক মুখী, যার ফলে, উপরে যা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে যেহেতু নিজের জীবনধারণের বিশ্বাস ও সদ্বিবেকের জন্য সদ্‌গুণ দু' দিক মুখী, সেজন্য, ন্যায্যতার ডান ও বাঁ পাশের অস্ত্রের খাতিরে (ক) শত্রুর তীর থেকে অভেদ্য হয়ে থেকে সদ্‌গুণ সেই ঢালগুলোর রক্ষায় নিরাপদ।

১৯৯। ঢালগুলোর দু' পাশে ঝোলানো যে চতুষ্কোণ অলঙ্কার যার মণিমুক্তায় খোদাই করা রয়েছে গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলপতিদের নাম, সেই চতুষ্কোণ অলঙ্কার হল হৃদয়-রক্ষার প্রতীক, কারণ তেমন দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ণনাটা আমাদের এশিক্ষা দেয় যে, যে কেউ এ ঢাল দু'টো হাতিয়ার ক'রে জঘন্য তীরন্দাজকে ফিরিয়ে দেবে, সে নিজের প্রাণকে পিতৃকুলপতিদের সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত করবে, যেহেতু, অলঙ্কারটা সদ্‌গুণের আলোয়ানের উপরে এক একজনের জন্য নিজ নিজ উজ্জ্বলতায় দীপ্তিময় হবে। বস্তুটা যে চতুষ্কোণ, তা মঙ্গলের স্থায়িত্ব নির্দেশ করে, কেননা বস্তুটা চার পাশের সোজা লাইন বেয়ে তার চার কোণের উপর সমানভাবে বসে বিধায় বস্তুটা সহজে সরানো যায় না।

২০০। যে বন্ধনী এ অলঙ্কারগুলোকে হাতে যুক্ত করে, আমার মতে সেই চার বন্ধনী আমাদের শেখায় যে, উচ্চতর জীবন ক্ষেত্রে ধারণাগত তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে বাস্তব তত্ত্ববিদ্যা যোগ করা দরকার: সেখানে হৃদয় হল সংদর্শনের প্রতীক ও হাত হল বাস্তব কর্মের প্রতীক।

২০১। মুকুটে ভূষিত মাথা সেই মুকুট নির্দেশ করে যা তারই জন্য নিরূপিত যে ন্যায় জীবন পালন করবে; তা তাঁরই দ্বারা ভূষিত হবে যিনি সোনার ফিতায় অনির্বচনীয় অক্ষরে খোদাই করা রয়েছেন। তেমন সাজসজ্জায় যে পরিবৃত, সে পায়ে জুতো দেয় না পাছে দৌড়ে সে ভারী ও মৃত্যুময় ছাগলোমের আচ্ছাদনের কারণে চলাচল করতে ধীর হয়: কথাটা সেই ধারণা অনুযায়ী যা আমরা পর্বত-ব্যাখ্যা কালে ব্যক্ত করেছিলাম। বাস্তবিকই, প্রাথমিক রহস্যাবৃত দীক্ষা কালে, আরোহণের জন্য বাধা ছিল বিধায় যা ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেই জুতো কেমন করে পায়ের অলঙ্কার হতে পারবে?

সেই পাথরফলক দু'টো (যাত্রা ৩২:১৫-২০ দ্রঃ)

২০২। যে কেউ এইভাবে আমাদের ব্যাখ্যা করা ধারাবাহিক আরোহণের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে, সে ঈশ্বরের তৈরী সেই ফলক দু'টো হাতে বহন করে যা ঐশ বিধান ধারণ করে। কিন্তু পাপীদের কঠোর বিরোধিতার কারণে ফলক দু'টো ভেঙে যায়। পাপ ছিল প্রতিমাপূজা, কারণ সেই পৌত্তলিকেরা বাছুরের মত দেখতে একটা মূর্তি খোদাই করেছিল। কিন্তু মোশি তা ধ্বংস করার পর এমনটা করেন যাতে তা জলে সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়ে যায় ও সেই জল পাপীদের পান করান যাতে যে ধাতু মানুষকে ভক্তিহীনতার দাস করেছিল, সেই ধাতু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসিত হয়।

২০৩। সেসময় বিবরণী নবীয় ভাবে বিশেষভাবে এবিষয়গুলোরই সংবাদ দিল, যা সেই সমস্ত ঘটনা লক্ষ করে যা আজ এমনকি আমাদের মধ্যেও বাস্তব রূপ লাভ করেছে; কেননা প্রতিমাপূজা-ভ্রান্তি জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হল: তা সেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মুখ দ্বারা গিলে ফেলা হল যারা তাদের সুন্দর বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি দ্বারা নিজেদের অন্তরে ভক্তিহীনতার মাল ধ্বংস করেছে। এবং যে সমস্ত রহস্য পৌত্তলিকদের কাছে গভীরভাবে রোপিত ছিল, সেই রহস্যগুলো একেবারে অকেজো ও মূল্যহীন জল হয়েছে, সেই যে জল তাদেরই মুখ দ্বারা গিলে ফেলা হয়েছিল যারা একসময় মূর্খ ভাবে প্রতিমাপূজা করত। কেননা, যখন তুমি এটা লক্ষ কর যে, যারা একসময় তেমন অসারতার প্রতি নিজেদের নত করছিল, তারা আগে যাতে ভরসা রাখছিল এখন সেই সমস্ত প্রতিমা টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করে দেয়, তখন তোমার কি এমনটা মনে হয় না যে, বিবরণী উদাত্ত কণ্ঠে এমনটা ঘোষণা করছে, যারা ভ্রান্তি থেকে সত্যকার ধর্মভক্তিতে পার হয়েছে, একদিন প্রতিটা প্রতিমাকে তাদের মুখে দিয়ে গিলে ফেলা হবে?

২০৪। মোশি লেবীয়দের তাদের স্বদেশীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত করেন; এবং তারা শিবিরটা এক প্রান্ত দিয়ে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পার হয়ে যত মানুষকে পায় তত মানুষকে নির্বিচারেই প্রাণে মারে কেননা যাদের হত্যা করতে হবে তেমন সিদ্ধান্ত তারা খড়্গোর ডগার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। এবং তারা যাদের পায় যেহেতু তাদের এক একজনকে সমানভাবে মেরে ফেলে, সেজন্য তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে মেরে

ফেলা লোকদের মধ্যে বন্ধু থেকে শত্রুকে, পরিচিতজন থেকে বিদেশীকে, পরকীয়জন থেকে আত্মীয়কে নির্ণয় করবে; না, যে হাত যাকে পেত তার প্রতি একইভাবে কার্যকর ছিল, সেই হাতের প্রেরণা একক ছিল। এটাই এ বিবরণের উপস্থাপিত উপকারিতা।

২০৫। যেহেতু হিব্রুরা অমঙ্গল সাধনে সবাই একমত হয়েছিল, এবং জঘন্যতা ক্ষেত্রে গোটা শিবির এক মানুষ বলে ব্যবহার করেছিল, সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি নির্বিচারেই হস্তক্ষেপ করে। কেননা, অনিষ্ট সাধন করছে এমন মানুষকে যে পায় সে যেমন তাকে কশাঘাত করতে করতে তার দেহের যেকোন অঙ্গ কশা দিয়ে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে, একথা ভালই জেনে যে, সেই অঙ্গের ব্যথা গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি, কেমন যেন অনিষ্ট সাধনের জন্য যুক্ত গোটা দেহ সমানভাবে আঘাতগ্রস্ত হয়, সেই অনুসারে হিব্রুদের এক ভাগে দেওয়া সেই শাস্তি সবাইকে শাস্তি দেয়।

২০৬। এজন্য, যখন সময় সময় অনেকের মধ্যে একই অপরাধ লক্ষ করি কিন্তু এটা দেখি যে, ঐশক্রোধ সকলকে নয় কেবল কয়েকজনকেই আঘাত করে, তখন, শাস্তি যে কেমন করে সম্পাদিত, সেটার উপযোগিতা মূল্যায়ন করা উচিত, যেহেতু সবাই আঘাতগ্রস্ত হয়নি, তবু জনগণের এক অংশকে দেওয়া আঘাত গুণে সবাই শাস্তি পায় যাতে অনিষ্ট থেকে সবাই মিলে সরে যায়।

২০৭। কিন্তু এই ব্যাখ্যা এখনও বিবরণীর আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা; অপরদিকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এভাবে আমাদের জন্য উপকারিতা রাখতে পারে: যেহেতু বিধানকর্তা এক হুকুমে সবাইকে লক্ষ করেন তথা, ‘*প্রভুর পক্ষে কে? সে আমার সঙ্গে আসুক*’ (ক), সেজন্য এটা হল বিধানের সেই কণ্ঠ যা সকলকে আহ্বান করে: যে কেউ ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠতে ইচ্ছা করে, সে আমারও বন্ধু অর্থাৎ বিধানেরও বন্ধু হোক। কেননা যে কেউ বিধানের বন্ধু সে অবশ্যই ঈশ্বরেরও বন্ধু। এবং সেই হুকুমে যারা তাঁর পাশে জড় হয়েছিল, মোশি তাদের ভাই, বন্ধু ও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে খড়্গ চালাতে হুকুম দেন।

২০৮। ব্যাখ্যার সঙ্গতি লক্ষ করে আমরা বলতে চাই, যে কেউ ঈশ্বর ও বিধান লক্ষ করে, সে, যে অনিষ্ট তার আত্মীয় হয়েছিল, তা হত্যা করায় নিজেকে শুচি করে। কেননা শাস্ত্র যেকোন ভাই, বন্ধু ও প্রতিবেশীকে যে ইতিবাচক অর্থেই উল্লেখ করে তা নয়। কিন্তু

এমন ভাই আছে যে পর-ও, এমন বন্ধু আছে যে শত্রুও, এমন প্রতিবেশী আছে যে বিরোধীও। আমরা তাদের সকলকে আমাদের অন্তরতম সেই চিন্তা-ভাবনা বলে ব্যাখ্যা করছি যেগুলোর জীবন হল আমাদের মৃত্যু ও যেগুলোর মৃত্যু আমাদের জীবন দান করে।

২০৯। এই ধারণা সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে মিল রাখে যা আমরা আগে আরোন ক্ষেত্রে উপস্থাপন করেছিলাম যখন মোশির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ বিষয়ে আমরা তাঁকে সেই দূত বলে ব্যাখ্যা করেছিলাম যিনি মোশিকে সাহায্য ও রক্ষা করেন, যিনি মিশরীয়দের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর কাজ সম্পাদনে সহযোগিতা রাখেন; আমরা যে তাঁকে আমাদের আগে সঞ্জাত বলে গণ্য করেছিলাম তা অবশ্যই বলা বাহুল্য, কারণ দূতদের অশরীরী স্বরূপ আমাদেরটার চেয়ে আগে সৃষ্ট হয়েছিল, এবং তিনি যে ভাই তা তো সুস্পষ্ট, কারণ তাঁর উপলব্ধি-বিশিষ্ট স্বরূপ আমাদেরটার সঙ্গে আত্মীয়তা রাখে।

২১০। কিন্তু এখানে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়: যিনি ইস্রায়েলীয়দের জন্য প্রতিমাপূজার সেবাকর্মী হয়েছিলেন, সেই আরোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কেমন করে ইতিবাচক বলে গণ্য করা যেতে পারে? এবং এখানে পাঠ্যটা 'ভাই' শব্দের দ্ব্যর্থতার উপর জোর দেয়, কেননা একই শব্দ যে সবসময় একই অর্থ বহন করে তা নয়, যেহেতু একই শব্দ বিপরীত ধারণা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কেননা যিনি মিশরীয়দের সেই স্বৈরশাসককে হত্যা করেন তিনি তো ভাই, অপরদিকে যিনি ইস্রায়েলীয়দের জন্য একটা বাছুর ছাঁচে ঢালাই করেন তিনি একেবারে অন্য রকম ভাই যদিও নামটা উভয়ের জন্য এক।

২১১। এজন্য তেমন ভাইদের বিরুদ্ধে মোশি খড়্গ নিষ্কোষিত করেন ও তাদের বিষয়ে অন্যান্যদের যা হুকুম দিচ্ছিলেন তা স্পষ্টভাবে নিজের বিষয়েও হুকুম দেন, কারণ তেমন ভাইকে হত্যা হল পাপ-বিনাশ। কেননা যে কেউ সেই অনিষ্ট বিনাশ করে যা বিরোধীর উসকানিতে তার অন্তরে স্থান নিয়েছে, সে নিজেতে তাকেই হত্যা করেছে যে আগে পাপে জীবনযাপন করছিল।

[যাত্রা ৩২:২ দ্রঃ]

২১২। কিন্তু এ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, আমরা তা আরও সত্যায়িত করতে পারি যদি এ ব্যাখ্যার সঙ্গে বিবরণীর অন্যান্য বিষয় তুলনা করি। কেননা বিবরণী বলে, আরোন ইস্রায়েলীয়দের কানের দুল খুলে দিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তারা তা খোলার পর, সেটাই হল প্রতিমা তৈরির উপাদান। এতে আমরা কী বলব? বিধানের প্রতীক সেই দুল-অলঙ্কার দ্বারা মোশি ইস্রায়েলীয়দের কান অলঙ্কৃত করেছিলেন; কিন্তু মিথ্যা-ভাই অবাধ্যতা দ্বারা কানে লাগানো অলঙ্কার তুলে নিয়ে এখন তা দিয়ে একটা প্রতিমা তৈরি করেন।

২১৩। এবং পাপের প্রথম আগমনে কানের দুল খোলাটা আজ্ঞার প্রতি অবাধ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নির্দেশ করে। যে সাপ ঐশ আজ্ঞা-লঙ্ঘন উপযোগী ও শ্রেয় বিষয় বলে পরামর্শ দিয়েছিল, আমরা কেমন করে সেই সাপকে আমাদের পূর্বপুরুষদের বন্ধু ও প্রতিবেশী বলে গণ্য করব? এটাই কান থেকে দুল খোলার অর্থ, সেই যে দুল ঐশ আজ্ঞা নির্দেশ করে। এজন্য যে কেউ তেমন ভাই, বন্ধু ও প্রতিবেশীকে প্রাণে মারবে, সে বিধানকে সেই বাণী বলতে শুনবে যা বিবরণী অনুসারে মোশি তাদেরই উদ্দেশ করে উচ্চারণ করেছিলেন যারা এই ব্যক্তিদের প্রাণে মেরেছিল, তথা, ‘*আজ তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সন্তান বা ভাইয়ের মূল্যে প্রভুর উদ্দেশে নিজ নিজ হাত পূরণ করেছ, যাতে আশীর্বাদ তোমাদের দেওয়া হয় ও তোমাদের উপরে নেমে আসে*’ (ক)।

২১৪। আমার মনে হয়, বর্ণনায় তাদেরও স্মৃতি উপযোগী ভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে যারা পাপে সম্মতি দিয়েছিল যাতে জানা যেতে পারে কেমন করে, যে দুই পাথরফলকে ঐশ বিধান খোদাই করা ছিল, ঈশ্বরের তৈরী সেই ফলক দু'টো মোশির হাত থেকে মাটিতে পড়লে ও নিম্নস্থলের সঙ্গে আঘাতের ফলে ভেঙে গেলে মোশি নতুন করে সেগুলো ফিরিয়ে এনেছিলেন; আসলে ঠিক সেগুলো নয়, কিন্তু সেগুলোতে যা লেখা ছিল, তাই মাত্র ঠিক আগেরটার মত ছিল। কেননা, এ নিম্নস্থলের উপাদান থেকে ফলকগুলো নিয়ে তিনি সেগুলো তাঁরই অধিকারের অধীন করেন যিনি সেগুলোর উপরে বিধান খোদাই করেন, এবং এভাবে, সত্যকার ফলক দু'টোতে বিধান বহন করায় তিনি অনুগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই পাথরে বাণীগুলো খোদাই করেছিলেন।

২১৫। কেননা, এধারণা দ্বারা চালিত হয়ে, আমাদের মঙ্গলার্থে ঐশ দূরদর্শিতার কাজ উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে হয় তো সম্ভব হয়। কেননা, যিনি ফলকগুলোকে ‘হৃদয়’ অর্থাৎ প্রাণের প্রধান অংশ বলে অভিহিত করেন (ক), সেই ঐশ প্রেরিতদূত যদি সত্য বলেন (এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যিনি [পবিত্র] আত্মার পরাক্রমে ঈশ্বরের গভীরতা তলিয়ে দেখেন (খ) তিনি সত্য বলেন), তাহলে এ থেকে আমরা সুসঙ্গত ভাবে এটা জানতে পারি যে, যা ঈশ্বরের হাত দ্বারা সৃষ্ট ও বিধানের অলিখিত অক্ষরে অলঙ্কৃত ছিল, সেই মানব স্বরূপ আদিতে ছিল অভঙ্গুর ও অমর (গ), কারণ অনিষ্ট দূরে রাখার ও ঈশ্বরত্বকে উপাসনা করার বিধান অনুযায়ী ইচ্ছা আমাদের অন্তরে স্বরূপেই সহজাত।

[যাত্রা ৩২:১৯ দ্রঃ]

২১৬। পরে, শাস্ত্র যা সাপের কণ্ঠ বলে ডাকে ও বিধানের দুই পাথরফলক সংক্রান্ত বিবরণী যা মাতলামিতে যে গান ধরে তারই কণ্ঠ বলে ডাকে, যখন সেই পাপের ধ্বনি হঠাৎ করে এল, তখন মাটিতে পড়া ফলকগুলো ভেঙে গেল (ক)। কিন্তু মোশি যাঁর পূর্বচিহ্ন ছিলেন, সেই সত্যকার বিধানকর্তা আমাদের মাটি ব্যবহার করে পুনরায় নিজের জন্য স্বরূপের ফলক তৈরি করলেন। কেননা যে মাংস ঈশ্বরত্বকে গ্রহণ করে নিল, তা বিবাহ দ্বারা গড়া নয়, কিন্তু তিনি নিজে নিজের সেই মাংসের প্রণেতা হন যার উপরে ঐশ্বরিক আঙুল লেখেন: কেননা পবিত্র আত্মা কুমারীর উপরে এলেন ও পরাৎপরের পরাক্রম নিজের ছায়ায় তাঁকে আবৃত করল (খ)। যখন তেমনটা ঘটল, তখন সেই আঙুল দ্বারা খোদাই করা অক্ষর গুণে অমর হয়ে মানব স্বরূপ পুনরায় অভঙ্গুরতা অর্জন করল (গ)। বাস্তবিকই পবিত্র আত্মা শাস্ত্র দ্বারা বহুবার ‘আঙুল’ বলে অভিহিত (ঘ)।

২১৭। এভাবে, অধিক গৌরবময় আকারে মোশির এমন মহৎ রূপান্তর ঘটে যে, সেই গৌরবের অভিব্যক্তি পার্থিব চোখ দ্বারা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। এবং যে কেউ আমাদের বিশ্বাস সংক্রান্ত ঐশ রহস্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাঠ্যের আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে কেমন মিল রাখে, এবিষয় সে অবশ্যই অবলক্ষণ করে না। কেননা আমাদের ভেঙে যাওয়া ফলকের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা (এবং যা বলা হয়েছে তা থেকে তুমি অবশ্যই তাঁকে চিনে নাও যিনি আমাদের ভাঙ্গন নিরাময় করলেন) আমাদের স্বরূপের ভেঙে যাওয়া ফলককে তার প্রাচীন সৌন্দর্যে পুনরায় ফিরিয়ে আনার পর ও ফলকটা

(যেমনটা বলেছি) ঐশ্বরিক আঙুল দ্বারা অলঙ্কৃত করার পর অযোগ্যদের দৃষ্টির কাছে আর ধারণযোগ্য নন যেহেতু যারা তাঁর দিকে তাকায় তাদের কাছে তিনি নিজের গৌরবের আতিশয্যের ফলে অগম্য হয়েছেন।

২১৮। কেননা সত্যি, সুসমাচারের কথামত যখন তিনি আপন গৌরবে আসবেন ও সকল দূত তাঁর সঙ্গে আসবেন (ক), তখন ধার্মিকেরাও কষ্ট করে তাঁর দর্শন সহ্য করতে পারবে। কিন্তু দুর্জন ও যে কেউ ইহুদী ধর্মতত্ত্ব পালন করে, সে ইশাইয়ার বাণীমত এদর্শনের অংশী হয় না। তিনি বলেন, *ভক্তিহীনকে সরিয়ে দেওয়া হোক, যাতে সে প্রভুর গৌরব না দেখতে পায়* (খ)।

অবিরত অগ্রগতি (ক)

২১৯। আগে পরীক্ষা করা বিষয়গুলোর সঙ্গে এবিষয় সুসঙ্গত ভাবে অনুসরণ করে আমরা এ পদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিষয়ে কোন না কোন অর্থ ব্যক্ত করতে চালিত হচ্ছি। কিন্তু এসো, আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যাই। মোশি নানা দর্শনে ঈশ্বরকে স্পষ্টভাবে দেখেছেন, যেইভাবে ঐশ্বরিক বাণী এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলে, ‘*মুখোমুখিই, ঠিক সেইভাবে যেভাবে একজন লোক আপন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে*’ (খ)। তবে এ কেমন হতে পারে যে, তিনি তেমন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও, কেমন যেন তখনও এমনটা না পেয়ে যা আমরা শাস্ত্রের সাক্ষ্য ভিত্তি ক’রে বিশ্বাস করি তিনি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন, তিনি যাচনা করেন যেন সেই ঈশ্বর তাঁকে দেখা দেন, যিনি অবিরতই তাঁকে দেখা দিতেন তাঁকে তিনি কেমন যেন তখনও দেখেননি?

[যাত্রা ৩৩:২১-২৩ দ্রঃ]

২২০। এবং ঊর্ধ্ব থেকে সেই কণ্ঠ এখন তাঁর আগ্রহপূর্ণ যাচনায় সম্মতি দেয় এমনকি তাঁকে বাড়তি হিসাবে এই অনুগ্রহও দিতে অস্বীকার করে না, যদিও পরে পুনরায় তাঁকে নিরাশায় তাড়িত করে, কারণ কণ্ঠটা তাঁকে স্পষ্ট ভাবে বলে যে, তিনি যা যাচনা করেন, মানব অবস্থা তা ধারণ করতে পারে না। তথাপি ঈশ্বর বলেন, তাঁর কাছাকাছি একটা জায়গা আছে, ও সেই জায়গায় একটা শৈল আছে, ও সেই শৈলে একটা গর্ত আছে: তিনি মোশিকে সেইখানে স্থান নিতে আদেশ করেন, পরে সেই গর্তের

প্রবেশস্থানে হাত রাখেন, ও সেটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মোশিকে ডাকেন। ডাক শুনে মোশি গর্ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে, তাঁকে যে ডেকেছিলেন তিনি তাঁর কাঁধ দেখেন, এবং এভাবে এমনটা মনে হয় তিনি যা আকাঙ্ক্ষা করছিলেন তা দেখতে পেয়েছিলেন, ও সেইসঙ্গে ঐশ কণ্ঠের সংবাদ সত্যাশ্রয়ী থেকে যায়।

২২১। তবু, যদি একজন এঘটনাটা তার আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে, তবে যে অনুসন্ধান করে তার কাছে অর্থ যে অস্পষ্ট হয়ে থাকবে শুধু নয়, কিন্তু অর্থটা ঈশ্বর বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা থেকেও মুক্ত হবে না। কেননা অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ কেবল সেই বস্তুর বেলায় অর্থ রাখে যার গঠন আমরা দেখতে পাই, এবং এক একটা গঠন একটা দেহকে সীমাবদ্ধ করে; এ থেকে এটা দাঁড়ায় যে, ঈশ্বর বিষয়ে একটা গঠন কল্পনা করলে তবে একজন মনে করবে ঈশ্বরের স্বরূপও দেহছাড়া নয়। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রতিটি দেহ নানা অঙ্গের সংযোগে গঠিত, ও যা সংযুক্ত তা নিজের গঠন ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সংসর্গ থেকে আগত। এজন্য এমন কেউ নেই যে যা সংযুক্ত তা অবিচ্ছেদ্য বলে নির্দেশ করবে; ও যা অবিচ্ছেদ্য তা অক্ষয় হতে পারে না, কেননা ক্ষয় বলতে সংযুক্ত বিষয়গুলোর বিচ্ছেদ বোঝায়]।

২২২। সুতরাং, যে কেউ ঈশ্বরের কাঁধ আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে, সে যে নিজের যুক্তির যৌক্তিকতা দ্বারা এ অদ্ভুত সিদ্ধান্তে চালিত হবে তা অবশ্যম্ভাবী। কেননা 'অগ্র' ও 'পশ্চাৎ' শব্দদ্বয় একটা গঠনকে আবশ্যক বলে দাবি করে, এবং গঠন একটা দেহের সঙ্গেই সম্পর্কিত। দেহ স্ব স্বরূপে বিচ্ছেদ্য, কারণ যা কিছু সংযুক্ত তা বিচ্ছেদ্য। কিন্তু যা কিছু বিচ্ছেদ্য তা অক্ষয়শীল হতে পারে না। অতএব, যে কেউ আক্ষরিক অর্থের দাস, নিজের যুক্তির যৌক্তিকতার জোরে সে ঈশ্বরত্বকে ক্ষয়শীল বলে গণ্য করতে বাধ্য। কিন্তু ঈশ্বর অক্ষয়শীল ও অশরীরী।

২২৩। তবে, আক্ষরিক ব্যাখ্যার বিপরীতে কোন্ ব্যাখ্যা বর্ণনার পক্ষে উপযোগী হবে? আলোচনা প্রসঙ্গে, যদি এই অংশ আমাদের অন্য ব্যাখ্যা খোঁজ করতে বাধ্য করে, তাহলে তেমন ব্যাখ্যা পুরা প্রসঙ্গের বেলায়ও প্রসারিত করা উচিত। কেননা আমরা একটা অংশের জন্য যা ধারণা করি, তা অবশ্যই 'গোটা' প্রসঙ্গের জন্যও প্রযোজ্য বলে

গণ্য করি, কারণ ‘গোটা’ বলতে এমন কিছুই নেই যা নানা অংশে সংযুক্ত নয়। সুতরাং, ঈশ্বরের কাছাকাছি সেই জায়গা, সেই জায়গায় সেই শৈল, সেই শৈলে সেই স্থান যা গর্ত বলে নির্দেশিত, সেটার ভিতরে মোশির প্রবেশ, প্রবেশদ্বারে ঈশ্বরের হাত রাখা, তাঁর চলাটা, তাঁর ডাক এবং অবশেষে তাঁর কাঁধ দর্শন, এসমস্ত বিষয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার নিয়ম অনুসারে আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

২২৪। আমরা কোন্ অর্থ উপস্থাপন করি? ভারী বস্তু যখন নিচের দিকে ধাক্কা পায়, তখন, যদি কেউই একটা বাধা দিয়ে তার দৌড় বিঘ্নিত না করে, তাহলে প্রথম ধাক্কার পরে অন্য কেউই ধাক্কা না দিলেও সেই বস্তু ততক্ষণ ধরে আপনা আপনিই দ্রুত দৌড়ে নিচে চলে যায় যতক্ষণ না বস্তুটা যে স্থলের উপর দিয়ে দৌড়ে সেই স্থল খাঁড়া ও নিম্নমুখী থাকে। তেমনি, উল্টোভাবে, প্রাণ পার্থিব সংসর্গ থেকে মুক্ত হয়ে, ঊর্ধ্বমুখী ধাক্কার ফলে হালকা ও দ্রুত হয়ে ঊর্ধ্বের দিকে উড়ে যায়।

২২৫। যেহেতু উপর থেকে কেউই প্রাণের চলার বেগ বিঘ্নিত করে না (কেননা মঙ্গলের প্রকৃতি স্বভাবতই তাদের আকর্ষণ করে যারা সেই মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করে), সেজন্য, স্বর্গীয় মঙ্গলগুলোর বাসনায় প্রাণ, প্রেরিতদূতের কথামত, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে [ক] নিজের আরোহণে অবিরতই নিজেকে অতিক্রম করে ও নিজের ওড়াটা উত্তরোত্তর আরও ঊর্ধ্বের দিকে চালিত করতে থাকবে।

২২৬। কেননা প্রাণ, যা কিছু ইতিমধ্যে অর্জন করেছে, সেটার খাতিরে আরও বেশি ঊর্ধ্বতর ঊর্ধ্বতা অস্বীকার না করতে বাসনা ক’রে, এবং ইতিমধ্যে অর্জন করা ফলাফল দ্বারা ওড়ার ব্যাপারে নিজের আবেগ দৃঢ়তর ক’রে স্বর্গীয় বিষয়গুলোর প্রতি নিজের আকর্ষণ অবিরতই করে তোলে। কেননা কেবল সদ্‌গুণ অনুযায়ী কর্মই শ্রমের মধ্য দিয়ে প্রাণের তেজ বৃদ্ধি করে ও প্রাণ যা সাধন করছে সেই কর্মের জন্য তার আবেগ হ্রাসীকৃত না করে বরং সেটার বৃদ্ধি ঘটায়।

২২৭। সুতরাং আমরা ঘোষণা করি, সেই মহান মোশিও নিজের চেয়ে আরও বেশি মহান হতে হতেও ঊর্ধ্বমুখী পথ চলায় কখনও থামেন না ও স্বর্গীয় বিষয়গুলো অভিমুখে আরোহণে নিজের জন্য কোন সীমা রাখেন না, কিন্তু, যাকোব যেমন বলেন, যে সিঁড়িতে

ঈশ্বর ভর দিয়েছিলেন (ক), সেই সিঁড়ি বেয়ে আরোহণ করাটা একবার শুরু ক'রে তিনি সবসময় ঊর্ধ্বতর ধাপে আরোহণ করেন ও আরোহণ করায় কখনও থামেন না কারণ, আরোহণে যে ধাপে তিনি পৌঁছে গেছেন, সবসময় এমন ধাপ পান যা সেটার চেয়ে ঊর্ধ্বতর।

২২৮। মিশরীয়দের রানীর সঙ্গে সেই ধরে নেওয়া আত্মীয়তা অস্বীকার করে তিনি সেই হিব্রুর পক্ষে প্রতিশোধ নেন; এমন একাকী জীবন যাপন করতে যান যা মানবীয় সংসর্গের দ্বারা কম্পিত নয়; নিজের অন্তরে গৃহপালিত পশুপাল চরান; আলোর দীপ্তি দেখতে পান; জুতো খুলে আলো অভিমুখে আরোহণটা হালকা করেন; আত্মীয়দের ও স্বদেশীদের মুক্তিলাভে চালনা করেন; ঢেউতে নিমজ্জিত শত্রুকে জলে মরতে দেখেন;

২২৯। মেঘের নিচে থাকেন; শৈল থেকে পিপাসা মেটান; স্বর্গের গুণে রুটি যোগান; পরে, হাত প্রসারিত করে বিদেশীর উপর জয়ী হন। তুরির আওয়াজ শোনেন; ঘোর তমসার তলে প্রবেশ করেন; মানুষের হাতে তৈরী নয় সেই তাঁবুর অপ্রবেশ্য স্থানে প্রবেশ করেন; ঐশ যাজকত্বের গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত হন; প্রতিমা ধ্বংস করেন; ঈশ্বরত্বকে প্রশমিত করেন; ইহুদীদের জঘন্যতার কারণে ভেঙে যাওয়া সেই বিধান ফিরিয়ে আনেন;

২৩০। গৌরবে দীপ্তিমান হন; এবং ততসংখ্যক উন্নয়নে উন্নীত হয়েও তবু বাসনায় এখনও পিপাসিত, ও সবসময় বেশি পেলেও তৃপ্তি পান না, এবং ইচ্ছামত মহত্তম প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েও সেবিষয়ে এখনও পিপাসিত; এবং কিছুই এখনও পাননি যেন আরও বেশি পেতে যাচনা করেন, এতে ঈশ্বরকে অনুনয় করেন যেন তিনি তথা মোশি যে পরিমাণে তাঁর অংশভাগী হতে পারেন সেই পরিমাণে নয়, কিন্তু ঈশ্বর বাস্তবে যেমন সেইভাবে তাঁকে দেখা দেন।

২৩১। আমি মনে করি, যা প্রকৃতিগত দিক দিয়ে সুন্দর, যে প্রাণ ভালবাসার ভাবাবেগ দ্বারা সেদিকে তাড়িত, সেই প্রাণের বেলায় ঠিক তাই ঘটে; কেননা প্রত্যাশা সুন্দর যা কিছু ইতিমধ্যে দেখেছে তা দ্বারা সবসময় পুষ্ট হয়ে, যা সামনে রয়েছে সেই সেদিকে আকর্ষণ করে, কারণ সেই প্রত্যাশা যা পেয়ে গেছে তা, যা এখনও গুপ্ত রয়েছে, তার প্রতি তার বাসনা জ্বালায়।

২৩২। যার ফলে সৌন্দর্যের জ্বলন্ত প্রেমিক, সে যা বাসনা করে, তার মতে যা কিছু অবিরত ভাবে সেই বাসনার প্রতিচ্ছবির মত দেখায়, তা গ্রহণ করে নিয়ে, প্রকৃত নমুনাতেই তৃপ্ত হতে চায়, এবং বাসনার সীমা অতিক্রম করে এমন দুঃসাহসী দাবি রেখে সে আয়না ও প্রতিবিম্ব দ্বারা নয় কিন্তু মুখোমুখিই সৌন্দর্য ভোগ করতে ইচ্ছা করে (ক)। ঈশ্বরের কণ্ঠ যে কথা দিয়ে সেই দাবি ফিরিয়ে দেয়, সেই একই কথা দিয়ে সেই দাবি গ্রহণ করে নেয়, এবং সেই অল্প কথার মধ্য দিয়ে তাকে ধারণার অপূরণীয় অতল গহ্বর দেখায়। কেননা ঈশ্বরের বদান্যতা তাঁর বাসনা পূরণ করতে সম্মতি জানায়, কিন্তু তাঁকে শান্তি ও তৃপ্তি দেবে বলে প্রতিশ্রুত হয় না।

২৩৩। কেননা, যদি দর্শনটা এমনটা হত যা দর্শক মোশির বাসনা বন্ধ করে দিত, তাহলে ঈশ্বর নিজের দাসের কাছে দেখা দিতেন না, কেননা তখনই ঈশ্বরকে সত্যিকারে দেখা হয় যখন তাঁকে দেখে তাঁকে দেখার বাসনা কখনও ফুরিয়ে যায় না। বস্তুতপক্ষে তিনি বলেন, *তুমি আমার মুখমণ্ডল দেখতে পাবে না, কেননা কোন মানুষ আমার মুখমণ্ডল দেখলে জীবিত থাকতে পারবে না* (ক)।

২৩৪। যে কেউ ঈশ্বরকে দেখে ঈশ্বর তার জন্য হন মৃত্যুর কারণ, এমনটা বলার জন্যই যে বর্ণনাটা এটা আমাদের দেখায় তা নয়; কেননা যে কেউ একবার ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে গেছে তার জন্য জীবনের মুখমণ্ডল কেমন করে মৃত্যুর কারণ হতে পারে? কিন্তু, যেহেতু ঈশ্বরত্ব স্ব স্বরূপেই জীবন দান করেন, এবং ঐশস্বরূপের বিশিষ্ট চিহ্ন হল যত বিশিষ্ট চিহ্নের অতীত হওয়া, সেজন্য যে কেউ মনে করে, ঈশ্বর হলেন নানা জ্ঞাতব্য জীবদের একটা, সে, যা সত্যকার তা থেকে, আমাদের উপলব্ধির ধারণক্ষমতা তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে যা মনে করে সে তারই দিকে পথভ্রষ্ট হয়ে জীবনবঞ্চিত হয়।

২৩৫। কেননা যা সত্যিকার আছে, তা-ই সত্যকার জীবন, ও জ্ঞানের মাধ্যমে তাতে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। তাই, যখন জীবন-দানকারী স্বরূপটা জ্ঞান অতিক্রম করে, তখন জ্ঞানের মধ্য দিয়ে যা ধারণা করা যেতে পারে তা অবশ্যই জীবন নয়, এবং যা জীবন নয় তা স্বরূপেই এমন কিছু নয় যা জীবন দান করতে পারে। এজন্য মোশি, যা দ্বারা তাঁর নিজের বাসনা অতৃপ্ত হয়ে থাকে, তাই বাসনা করে তাতে তৃপ্তি পান।

২৩৬। বাস্তবিকই তিনি সেই বাণী থেকে এ শিক্ষা পান যে, ঈশ্বরত্ব স্বরূপে অসীম, কোন সীমায় সীমাবদ্ধ নন। কেননা আমরা যদি ঈশ্বরত্বকে সীমা বিশিষ্ট বলে ভাবতাম, তবে এর ফলে আমাদের অবশ্যই সেই সীমার পাশাপাশি সীমার অতীতে যা রয়েছে তাও ভাবতে বাধ্য হতাম। কেননা এটা আবশ্যকীয় যে, যা সীমাবদ্ধ তা কোন একটা কিছুতে শেষ হয়, যেভাবে পার্থিব জীবদের সীমা হল হাওয়া ও জলচর জীবদের সীমা হল জল। এবং যেমন জল চারদিকে মাছকে ঘেরে ও হাওয়া পাখীকে ঘেরে, এবং জলচর জীবদের জন্য জলের মধ্যে, ও পাখীদের জন্য হাওয়ার মধ্যে সর্বাতীত প্রান্ত হল সেই সীমার চিহ্ন যা মাছ ও পাখিকে ঘেরে ও জল ও হাওয়াকে সীমিত করে, তেমনি এটা আবশ্যক যে, আমরা যদি ঈশ্বরত্বের বেলায় একটা সীমা ভাবি, তবে ঈশ্বরত্ব এমন বস্তু দ্বারা ধারণকৃত হবেন যা স্বরূপে ভিন্ন, এবং ধারণার সুসঙ্গতি আমাদের এবিষয়ে নিশ্চিত করে যে, ধারণকৃত বস্তুর চেয়ে ধারণকারী বস্তু বৃহত্তর।

২৩৭। কিন্তু আমরা সবাই এতে একমত যে, ঈশ্বরত্ব স্বরূপে মঙ্গল: মঙ্গল থেকে যা কিছু ভিন্ন স্বরূপের, তা মঙ্গলের চেয়ে সম্পূর্ণরূপে অন্য কিছু; কারণ মঙ্গলের বাইরে যা কিছু রয়েছে, তা অনিষ্টের স্বরূপে অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, আমরা দেখিয়েছি যে, ধারণকৃত বস্তুর চেয়ে ধারণকারী বস্তু বৃহত্তর। এর ফলাফল হল, যে কেউ মনে করে, ঈশ্বরত্বের একটা সীমা আছে, তাকে অবশ্যই এটাও মেনে নিতে হবে যে ঈশ্বরত্ব অনিষ্ট দ্বারা ধারণকৃত

২৩৮। এবং যখন ধারণকৃত বস্তু ধারণকারীর স্বরূপের চেয়ে একেবারে ন্যূনতম, তখন যেটা বৃহত্তর, সেটার মহত্ত্ব প্রমাণিত। অতএব, যে কেউ ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে সীমা রাখে, সে এমনটা করে যে, মঙ্গল তার বিপরীত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু এ যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং সীমাহীন স্বরূপের সীমাবদ্ধতার কথা ভাবা সম্ভব নয়, এবং স্বরূপে যা অসীমাবদ্ধ, তা ধারণ করা সম্ভব নয়। এজন্য, সেই আরোহণের প্রতি আকর্ষণ করে যে মঙ্গল-বাসনা, যে কেউ মঙ্গলের দিকে ধাবমান, সেই বাসনা তার দৌড়ের জন্য অবিরত ভাবে নিজেকে প্রসারিত করে।

২৩৯। বাস্তবিক পক্ষে, ঈশ্বরকে দেখা বলতে তাঁকে বাসনা করায় কখনও তৃপ্ত না হওয়া বোঝায়; এবং যে কেউ দেখে, যেহেতু সে দেখতে পায়, ঠিক একারণেই তার

পক্ষে সবসময় আরও বেশি দেখার বাসনা দ্বারা জ্বলে ওঠা অনিবার্য। এর ফলে, কোন সীমা ঈশ্বর অভিমুখে আরোহণের অগ্রগতি রোধ করে না, কারণ মঙ্গল সীমাহীন; মঙ্গল-বাসনার অগ্রগতিও কোনও তৃপ্তি দ্বারা বিঘ্নিত নয়।

২৪০। কিন্তু ঈশ্বরের সেই কল্পিত কাছাকাছি স্থান কোথায়? সেই শৈল কোন্টা? এবং শৈলের সেই গর্তও কোন্টা? ঈশ্বরের যে হাত শৈলের গর্তের প্রবেশস্থান আবৃত করে, ঈশ্বরের সেই হাত কোন্টা? ঈশ্বরের সেই হেঁটে যাওয়াটা কোন্টা? যিনি ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখবার যাচনা করেছিলেন, সেই মোশিকে ঈশ্বর নিজের যে কাঁধ দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুত হন, সেই কাঁধ কোন্টা?

২৪১। কেননা এটাই একান্ত দরকার যে, এসমস্ত কিছু, প্রত্যেকটাই, মহৎ হবে ও দাতার মাহাত্ম্যেরও যোগ্য হবে, যাতে এর ফলে এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, সেই মহান দাস যে যে ঐশদর্শন ইতিমধ্যে পেয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতিটা সেই সমস্ত ঐশদর্শনের চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্যময় ও উৎকৃষ্ট। কেননা এসমস্ত কথা থেকে, যে উচ্চতায় এসমস্ত আরোহণের পরে মোশি আরোহণ করতে বাসনা করেন ও যে উচ্চতা অভিমুখে তিনিই নিজের পরিচালনা দ্বারা তাঁর আরোহণ সহজ করেন যিনি *‘দেখ, আমার কাছাকাছি এই এক জায়গা আছে’* [ক] ব’লে, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে সবকিছুতে তাদের মঙ্গলার্থে সহযোগিতা দান করেন [খ], একটা মানুষ কেমন করে সেই উচ্চতা উপলব্ধি করতে পারে?

২৪২। হয় তো এই ব্যাখ্যা সেই অন্যান্য ব্যাখ্যার সঙ্গে মিল রাখে যা আগে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা বর্ণনাটা জায়গার কথা উল্লেখ ক’রে, যা নির্দেশ করে তা পরিমাণ-মাফিক ভাবে সীমাবদ্ধ করে না (কেননা যার পরিমাণ নেই তার জন্য পরিমাপ নেই), কিন্তু পরিমাপযোগ্য উদাহরণ ব্যবহার ক’রে শ্রোতাকে তারই দিকে চালনা করে যা অসীম ও সীমাহীন। সেজন্য আমি মনে করি, ঐশ্বরিক বাণী ঠিক এধারণাই নির্দেশ করে, যথা, যেহেতু তোমার বাসনা সামনের দিকেই প্রাণপণে ধাবিত ও তুমি দৌড়ানোতে তৃপ্ত হও না ও মঙ্গল ক্ষেত্রেও কোন সীমা জান না, কিন্তু যা আরও বেশি মহৎ তোমার বাসনা সেটাকেই সবসময় লক্ষ করে, সেজন্য আমার কাছে এতখানি জায়গা রয়েছে যে,

সেটার অন্তরে যে দৌড়ে সে দৌড়োনোতে কখনও থামতে পারবে না। কিন্তু উল্টো দিকে দৌড় অচলতারই শামিল।

[যাত্রা ৩৩:২১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ]

২৪৩। ঈশ্বর মোশিকে বলেন, 'তুমি ওই শৈলের উপরে থামো'। সমস্ত কিছুর মধ্যে এটাই সবচেয়ে অসাধারণ বিষয়, অর্থাৎ অচলতা ও চলাটা কেমন করে এক হতে পারে। কেননা যে কেউ এগোয় সে অবশ্যই অবিচল হয়ে থাকে না, ও যে কেউ অবিচল থাকে সে এগোয় না; অথচ এখানে ঠিক অবিচল থাকাতেই অগ্রগতি হয়। এর অর্থ এ: মানুষ মঙ্গলে যতখানি সুস্থির ও অবিচল থাকে, ততখানি সে নিজের সদ্‌গুণ-দৌড় সম্পন্ন করে। কেননা যে কেউ চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে দু'মনা ও টলমান, এবং কম্পিত হয়ে ও প্রেরিতদূতের কথা মত বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত হয়ে (ক) মঙ্গলে সুস্থির স্থায়িত্বের অধিকারী নয়, সে সদ্‌গুণের চূড়ায় কখনও গিয়ে পৌঁছোবে না।

২৪৪। একইপ্রকারে, যারা বালুময় স্থানের মধ্য দিয়ে আরোহণ করে, তারা লম্বা লম্বা ধাপে এগোলেও বৃথাই কষ্ট করে, কারণ পা সবসময় বালুতে নিচের দিকে পিছলে যায়, যার ফলে তারা চলাচল করে বটে কিন্তু তেমন চলাচল তাদের অগ্রসর করে না। কিন্তু, সামসঙ্গীত যেমনটা বলে (ক), সেই অনুসারে যদি একজন অতল গহ্বর থেকে পা বের করে দিয়ে শৈলের উপরেই তা স্থাপন করে (শৈল হলেন সেই খ্রিষ্ট (খ) যিনি সিদ্ধ সদ্‌গুণ), তাহলে পলের পরামর্শমত সে মঙ্গল-অধিকারে যতখানি সুস্থির ও অবিচল হয় (গ), অচলতা কেমন যেন পাখার মত ব্যবহার ক'রে ও মঙ্গলের দৃঢ়তায় হৃদয়কে পাখাবিশিষ্ট ক'রে তত দ্রুতভাবে নিজের নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছোয় যাতে পরে উচ্চতে আরোহণ করতে পারে।

২৪৫। সুতরাং, যিনি মোশিকে জায়গাটা দেখান, তিনি তাঁকে দৌড়োতেই প্রেরণা দেন, এবং শৈলের অবিচলতা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়ে তাঁকে দেখান কেমন করে সেই ঐশ প্রতিযোগিতায় দৌড়োতে হয়।

শৈলের সেই গর্ত সম্পর্কে যা বর্ণনাটা 'খোলা-স্থান' বলে অভিহিত করে, প্রেরিতদূত সেটাকে নিজের বাণী দিয়ে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (ক) এটা ব'লে যে, মানুষের

হাতে তৈরী নয় এমন আবাস স্বর্গে প্রস্তুত রয়েছে, প্রত্যাশার উদ্দেশেই, তাদেরই জন্য যারা এ পার্থিব-তাঁবু থেকে নিজেদের মুক্ত করে দিয়েছে।

২৪৬। কেননা, এটা সত্য যে, প্রেরিতদূতের কথামত, যে কেউ সেই চওড়া ও প্রশস্ত রঙ্গভূমিতে (যা ঐশশাস্ত্র 'স্থান' বলে) নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছে (ক) এবং, বর্ণনার ব্যবহৃত প্রতীক অনুসারে, নিজের পা শৈলে [তথা খ্রিষ্টেই] দৃঢ়স্থাপিত করেছে বলে নিজের বিশ্বাস যথার্থই অক্ষুণ্ন রেখেছে, সেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিচারকর্তা দ্বারা ধর্মময়তার মুকুটে পুরস্কৃত হবে (খ)।

২৪৭। শাস্ত্র দ্বারা এ পুরস্কার নানা শব্দ দ্বারা চিহ্নিত, কেননা যা এখানে শৈলের গর্ত বলে নির্দেশিত, তা অন্যত্র পুলক-বাগান, অনন্ত তাঁবু, পিতার কাছে আবাস, পিতৃকুলপতির বুক, জীবিতদের দেশ, বিশ্রামদায়ী জল, স্বর্গীয় যেরুশালেম, স্বর্গরাজ্য, আহূতদের পুরস্কার, অনুগ্রহের মালা, পুলক-মুকুট, কান্তির মুকুট, শক্তিশালী দুর্গমিনার, পর্বীয় ভোজসভা, ঈশ্বরের সঙ্গে স্থান, বিচারাসন, উৎকৃষ্ট স্থান, গুপ্ত তাঁবু বলে অভিহিত।

২৪৮। এজন্য আমরা বলি, সেই শৈলে মোশির প্রবেশও সেই কথাগুলোর একটা যা সদৃশ অর্থবহ শব্দ। কেননা পল দ্বারা শৈলকে খ্রিষ্ট বলে ব্যাখ্যা করা হয় (ক), এবং আমরা বিশ্বাস করি, মঙ্গল যত প্রত্যাশা সেই খ্রিষ্টে নিহিত যেখানে, আমরা জানি, মঙ্গলময়তার সমস্ত ধন স্থিত; যে কেউ মঙ্গলকর কিছুর অধিকারী হয়েছে, সে অবশ্যই সেই খ্রিষ্টে রয়েছে যিনি নিজেতে সমস্ত মঙ্গল ধারণ করেন।

২৪৯। যে কেউ এপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে ও ঈশ্বরের হাত দ্বারা সুরক্ষিত, বর্ণনাটা যেমন আমাদের জানিয়েছে, (ঈশ্বরের হাত হল সেই পরাক্রম যা বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে, সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বর যাঁর দ্বারা সবই হয়েছে (ক), যিনি নিজে দৌড়-প্রতিযোগীদের পক্ষে গন্তব্যস্থান, যিনি নিজে সেই পথ (খ) যা দিয়ে দৌড় সম্পাদিত, যেইভাবে তিনি নিজে বলেন, যে কেউ সুস্থির তিনি তার জন্য শৈল ও যে কেউ বিশ্রামে এসে পৌঁছেছে তিনি তার জন্য বাসস্থান (গ)), সে সেসময় শুনবে তাকে আহ্বান করা হয় ও যিনি তাকে আহ্বান করেন সে তাঁর কাঁধের পিছনেই নিজেকে পাবে অর্থাৎ, বিধান যেইভাবে জারি করে থাকে (ঘ), সে প্রভু ঈশ্বরের পিছনে এগিয়ে চলবে।

২৫০। তেমন বিধি শুনে, সেই মহান দাউদও তখনই তা ভালই বুঝেছিলেন যখন, যে পরাৎপরের রক্ষায় রয়েছে, তাকে বলেন, '*তিনি তাঁর পিঠ দিয়ে তোমার ছায়া দেবেন*' (ক), যার অর্থ হল ঈশ্বরের পিছনে থাকা (কেননা পিঠ মানুষের পশ্চাদ্ভাগে স্থিত), ও নিজের বিষয়ে বলেন, 'তোমার পিছনে তোমাকে আঁকড়ে ধরেছে আমার প্রাণ, আমাকে ধরে রেখেছে তোমার ডান হাত' (খ)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ সামটা বিবরণীর সঙ্গে কেমন মিল রাখে? কেননা, যেমন সেই সাম বলে যে, ডান হাত তাকেই ধরে রেখেছে যে ঈশ্বরকে পিছনে আঁকড়ে ধরেছিল, তেমনি এখানেও হাত তাঁকে স্পর্শ করে যিনি শৈলে ঐশ্বরিক কণ্ঠের অপেক্ষা করেন ও প্রার্থনা করেন যেন তাঁর পিছনে যেতে পারেন।

২৫১। যিনি সেসময় মোশির সঙ্গে কথা বলতেন ও এখন নিজের বিধান পূরণ করতে এসেছেন, সেই প্রভু, প্রতীকের মধ্য দিয়ে যা লেখা ছিল তা শিষ্যদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে একই ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, '*কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে,* [ইত্যাদি]' (ক); তিনি তো বলেন না, 'যে কেউ আমার সামনে যেতে ইচ্ছা করে'। এবং যে তাঁকে অনন্ত জীবনের জন্য অনুনয় করছিল, তিনি তার প্রতি একই আহ্বান উচ্চারণ করেন: তাকে বলেন, '*এসো ও আমার অনুসরণ কর*' (খ); এবং যে কেউ অনুসরণ করে, সে কাঁধ লক্ষ করে।

২৫২। সেজন্য যিনি ঈশ্বরকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই মোশি এখন জ্ঞাত হন কেমন করে ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারে, অর্থাৎ, তিনি জ্ঞাত হন যে, ঈশ্বর যেখানে আমাদের চালনা করেন তাঁকে সেখানে অনুসরণ করা, সেটাই ঈশ্বরকে দেখা। কেননা তাঁর গমন এটা দেখান যে, তাঁকে যে অনুসরণ করে, তিনি তাঁর পথদিশারী, কেননা যে পথ জানে না, তার পক্ষে পথদিশারীকে পিছন থেকে অনুসরণ করা ছাড়া অন্য ভাবে নিরাপদে সেই পথে চলা সম্ভব নয়। সেজন্য যে চালনা করে সে সামনে চ'লে তাকে পথ দেখায় যে পিছনে তার অনুসারন করে; এবং যে অনুসরণ করে, সে যদি পিছন থেকে অবিরতই নিজের পথদিশারীকে লক্ষ করে, তাহলে সে সঠিক পথ থেকে সরে যায় না।

২৫৩। কেননা যে কেউ চলাচল দ্বারা নিজেকে আড়াআড়ি ভাবে চালিত হতে দেয় অথবা নিজের পথদিশারীর আগে আগে স্থান নেয়, সে নিজের জন্য আলাদাই একটা পথ বেছে নেয়, সেই পথ নয় যা পথদিশারী তাকে দেখায়। এজন্য ঈশ্বর যাঁকে চালনা করেন

তাঁকে বলেন, ‘*তুমি আমার মুখমণ্ডল দেখতে পাবে না*’ (ক), অর্থাৎ, যিনি তোমাকে চালনা করেন, তুমি তাঁর মুখমণ্ডলের সামনে যেয়ো না। কেননা দৌড় অবশ্যই বিপরীত দিকে হত, যেহেতু মঙ্গল মঙ্গলকে মুখোমুখি লক্ষ করে না, কিন্তু তার অনুসরণ করে।

২৫৪। কিন্তু আমরা যা মঙ্গলের বিপরীত দিকের বলে ভাবি, তা তার সামনে মুখোমুখিই রুখে দাঁড়ায়: রিপু সদ্‌গুণকে মুখোমুখিই লক্ষ করে, কিন্তু সদ্‌গুণ সদ্‌গুণকে মুখোমুখি লক্ষ করে না। এজন্য মোশি ঈশ্বরকে মুখোমুখি লক্ষ করেন না, কিন্তু তাঁর কাঁধ লক্ষ করেন। কেননা যে কেউ তাঁকে মুখোমুখি লক্ষ করে, সে জীবিত থাকবে না, যেইভাবে ঐশ্বরিক কণ্ঠ ঘোষণা করে, *প্রভুর মুখমণ্ডল দেখলে কেউই জীবিত থাকতে পারবে না* (ক)।

২৫৫। তবে লক্ষ কর, ঈশ্বরের অনুসরণ করতে শেখা কেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ সেই নানা মহৎ আরোহণের পরে ও সেই নানা ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়কর ঐশ আবির্ভাবের পরে, যে কেউ ঈশ্বরের কাঁধে অর্থাৎ পিছনেই স্থান নিতে শিখেছে, জীবনের শেষের দিকে সেও তেমন অনুগ্রহের যোগ্য বলে তত সহজে পরিগণিত হয়।

মোশির প্রতি হিংসা

২৫৬। যে কেউ এভাবে ঈশ্বরের অনুসরণ করে, অনিষ্টকর অন্যায় আর কখনও সরাসরি তার বিরোধিতা করে না। কেননা এসবকিছুর পরে ভাইদের থেকেই মোশির বিরুদ্ধে হিংসা জন্ম নেয়। সেই হিংসা যা অনিষ্টের উৎপত্তি-ভাবাবেগ, মৃত্যুর জনক, পাপের প্রথম প্রবেশ, রিপুর শিকড়, দুঃখের উৎপত্তি, দুর্দশার জননী, অবাধ্যতার ভিত, লজ্জার সূত্রপাত। হবার ক্ষতিতে সাপ হয়ে হিংসাই আমাদের পরমদেশ থেকে তাড়িত করেছে; হিংসাই জীবন-বৃক্ষ থেকে আমাদের দূরে রেখেছে এবং পবিত্র পোশাক থেকে আমাদের বিবস্ত্র ক’রে লজ্জার খাতিরে আমাদের ডুমুরগাছের পাতায় আমাদের আবৃত করেছে।

২৫৭। হিংসাই কাইনকে তার নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত করেছে ও সেই মৃত্যুকে অনুপ্রবিষ্ট করেছে যা সাতগুণ দণ্ডনীয়। হিংসাই যোসেফকে দাস করেছে। সেই

হিংসা, যা মৃত্যুজনক হূল, লুকোনো অস্ত্র, প্রকৃতির দুর্বিপাক, বিষাক্ত রস, স্বেচ্ছাকৃত ক্ষয়, তেতো তীর, প্রাণের পেরেক (ক), হৃদয়ের আগুন, অন্ত্ররাজিতে জ্বলন্ত মশাল স্বরূপ।

২৫৮। হিংসার কাছে তা-ই দুর্বিপাক যা নিজের অমঙ্গল নয়, কিন্তু তা যা পরের মঙ্গল; অপরদিকে তা-ই সুখময় সাফল্য যা নিজের মঙ্গল নয়, কিন্তু তা যা প্রতিবেশীর অমঙ্গল। হিংসা মানুষদের কল্যাণে দুঃখ পায় ও তাদের দুর্বিপাকে উল্লাস করে। কথিত আছে, লাশখেকো শকুন সুগন্ধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ তাদের স্বভাব যা পচা ও ক্ষয়প্রাপ্ত তাতে অভ্যস্ত। তাই যে কেউ এ রোগের হাতে পড়েছে, সে যেমন সুগন্ধের সংস্পর্শে, তেমনি প্রতিবেশীর সৌভাগ্য থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কিন্তু সে যখন দুর্বিপাক ও দুঃখ দেখে তখন ইতস্তত না করে সেখানে উড়তে উড়তে চলে আসে ও দুর্বিপাকের গুপ্ততম দিকও বের করার লক্ষ্যে নিজের বাঁকা ঠোঁট সেটার ভিতরে ঢোকায়।

২৫৯। মোশিকে আক্রমণ করার আগে হিংসা আরও অনেককেই আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এই মহানের বিরুদ্ধে সজোরে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করে শৈলের গায়ে নিক্ষিপ্ত মাটির পাত্রের মত নিজেকে ধ্বংস করে। কেননা এই পরিস্থিতিতেই মোশির পক্ষ থেকে ঈশ্বরের পিছনে এগিয়ে চলবার উপকারিতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেল, কেননা মোশি ঐশ্বরিক জায়গায় ছুটে গেছিলেন, শৈলের কাছে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ও সেই গর্তে রুদ্ধ থেকে ঈশ্বরের হাত দ্বারা রক্ষা পান ও যিনি তাঁর পথদিশারী হন, তাঁর মুখোমুখি নয় কিন্তু কাঁধ দিয়ে লক্ষ করে পিছন থেকে তাঁর অনুসরণ করেন।

[গণনা ১২:১-২ দ্রঃ]

২৬০। এবং ঈশ্বরের অনুসরণ করছিলেন বিধায়ই যে তিনি নিজে থেকে সুখী হলেন, তা ধনুকের তীরের বেশ উপরে তাঁর অবস্থান করাটাও প্রমাণিত করে। কেননা হিংসা তাঁর বিরুদ্ধেও নিজের তীর ছোড়ে, কিন্তু মোশি যেখানে অবস্থান করছিলেন, ছোড়াটা সেই উচ্চতায় পৌঁছোয় না কারণ জঘন্যতার দড়ি তেমন ভাবাবেগ তীর ছুড়বার জন্য বেশি দুর্বল ছিল যাতে করে এই রোগে পতিত লোকদের থেকে তাঁকেও আক্রান্ত করতে পারে। অপরদিকে আরোন ও মরিয়ম মহৎ ঈর্ষায় আহত হলেন ও তাঁর বিরুদ্ধে তেমন কথা তীরের মত ছুড়ে নিজেরাই হিংসা-ধনুক হয়ে দাঁড়ান।

[গণনা ১২:১২ দ্রঃ]

২৬১। তিনি যে সেই রোগে আক্রান্ত হবেন, তা থেকে এত দূরে ছিলেন যে, যাঁরা তাতে পড়েছিলেন তাঁদের খারাপ অবস্থায় তাঁদের সেবাযত্ন করলেন; এবং যাঁরা তাঁর অনিষ্ট ঘটিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি প্রতিশোধের কোনও অনুভূতি থেকে শুধু অক্ষত হয়ে রইলেন তা নয়, বরং ঈশ্বরকে তাঁদের পক্ষে প্রশমিত করলেন: আমার মতে, তেমন ব্যবহারে তিনি দেখালেন যে, সদ্‌গুণ-ঢাল দ্বারা যে সুরক্ষিত, তীরের ডগা তাঁকে খোঁচায়ও না।

২৬২। কেননা, যে বর্ম এসমস্ত তীর থেকে রক্ষা করে, তা হলেন স্বয়ং ঈশ্বর: হ্যাঁ, সদ্‌গুণের পক্ষে যে সংগ্রাম করে সে ঈশ্বরকেই পরিধান করে, কেননা লেখা রয়েছে, '*তোমরা স্বয়ং প্রভু যিশু খ্রিষ্টকেই পরিধান কর*' (ক), অর্থাৎ সেই অভঙ্গুর বর্ম পরিধান কর যা দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে মোশি জঘন্য তীরন্দাজের নিক্ষেপ অকেজো করেছিলেন।

২৬৩। বাস্তবিকই, যাঁরা তাঁর অনিষ্ট ঘটিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের তাড়না তাঁকে ধরেনি, এবং পরে, তাঁরা নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা দণ্ডিত হওয়ার পরেও তিনি যা প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ন্যায্য তা ভুলে গেলেন এবং ভাইদের হয়ে ঈশ্বরকে অনুনয় করলেন। অবশ্যই, তিনি তেমনটা করতেন না যদি সেই ঈশ্বরের পিছনে না থাকতেন যিনি আগে তাঁকে নিজের কাঁধ দেখিয়েছিলেন যাতে মোশির কাছে সদ্‌গুণ অভিমুখে সুনিশ্চিত একটা পথদিশারী থাকে।

যিশু [অর্থাৎ যোশুয়া] ও সেই গুপ্তচরেরা

২৬৪। পরবর্তী যত ঘটনাও এধরনেরই ঘটনা। কেননা, যেহেতু মানুষদের স্বাভাবিক শত্রু তাঁর ক্ষতি করার মত উপায় পাচ্ছিল না, সেজন্য সেই শত্রু তাঁর চেয়ে সহজ শিকারের দিকে নিজের বিরোধিতা ফেরায়। এবং শত্রু জনগণের মধ্যে একটা তীরের মত পেটুকতা ভাবাবেগ অনুপ্রবেশ করায় যার ফলে তারা স্বর্গীয় খাদ্যের চেয়ে মিশরের উৎকৃষ্ট মাংস পছন্দ করায় শত্রু মিশরীয় রীতি অনুসারে জীবনযাপন করতে তাদের প্ররোচিত করে।

২৬৫। কিন্তু যিনি প্রাণে এ ভাবাবেগের চেয়ে আরও বেশি ঊর্ধ্বে উড়তেন, সেই মোশি সেই ভাবী উত্তরাধিকার বিষয়েই অতিব্যস্ত ছিলেন যা ঈশ্বর দ্বারা তাদেরই জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছিল যারা আধ্যাত্মিক অর্থ অনুযায়ী ধরে নেওয়া সেই মিশর ছেড়ে স্থানান্তর করবে ও দুধ ও মধু প্রবাহী দেশ অভিমুখে যাত্রা করবে। এজন্য তিনি এমন গুপ্তচর পাঠান যারা সেই দেশে পাওয়া মঙ্গল বিষয়ে খবর দেবে।

২৬৬। আমার মতে, যে গুপ্তচরেরা মঙ্গল প্রত্যাশা পোষণ করে তারা হল বিশ্বাসজনিত সেই চিন্তা-ভাবনা যা আমাদের অপেক্ষমান মঙ্গল বিষয়গুলোর প্রত্যাশা আরও দৃঢ় করে, কিন্তু যে গুপ্তচরেরা মঙ্গল প্রত্যাশা ব্যর্থ করে তারা হল সেই বিপরীত চিন্তা-ভাবনা যা প্রতিশ্রুতিতে ভরসা দুর্বল করে। কিন্তু বিরোধীদের কথা আদৌ বিবেচনা না করে মোশি তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য বলে জ্ঞান করলেন যিনি সেই দেশ সম্পর্কে উত্তম খবর দিচ্ছিলেন।

[গণনা ১৩:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

২৬৭। তিনি ছিলেন সেই যিশু [অর্থাৎ যোশুয়া] যিনি অধিক সৌভাগ্যবান পরিদর্শন পরিচালনা করেছিলেন ও তাঁর নিজের সমর্থনে খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা সত্য বলে ঘোষণা করছিলেন। তাঁকে লক্ষ করে মোশি, যে আঙুরগুচ্ছ দণ্ডে ঝুলিয়ে তাঁর কাছে আনা হয়েছিল তা সেই দেশের ঐশ্বর্যের চিহ্ন বলে ধরে নিয়ে ভাবী মঙ্গলবিষয়গুলো বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যাশা অর্জন করলেন। যিনি সেই দেশের বিষয়ে খবর দেন ও কাঠে ঝোলা সেই আঙুরগুচ্ছ নির্দেশ করেন [ক], সেই যিশুর [অর্থাৎ যোশুয়ার] কথার প্রতি একাগ্রতার সঙ্গে কর্ণপাত করে তুমি অবশ্যই উপলব্ধি কর, প্রত্যাশা বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য মোশি কিসের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

২৬৮। কেননা যে আঙুরগুচ্ছ এই অন্তিমকালে ক্রুশ-কাঠে ঝোলানো হয়েছিল ও যার রক্ত বিশ্বাসীদের জন্য পরিত্রাণদায়ী পানীয় হয়, দণ্ডে ঝোলানো আঙুরগুচ্ছটা সেই আঙুরগুচ্ছের প্রতীক ছাড়া আর কিসের প্রতীক হতে পারে? মোশি প্রতীকাকারে এসব কিছু আগে থেকে দেখেছিলেন, কেননা তিনি বলেন, *তারা সেই আঙুররস খেত যা আঙুরের রক্ত* [ক], এবং একথা দ্বারা তিনি আমাদের কাছে পরিত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগ নির্দেশ করেন।

মরুপ্রান্তরে উত্তোলিত সেই ব্রঞ্জের সাপ (গণনা ২০:২ ইত্যাদি; যাত্রা ১৭:১-৭ দ্রঃ)

২৬৯। আবার মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়; এবং যারা প্রতিশ্রুত মঙ্গল বিষয়গুলো ক্ষেত্রে নিরাশ হয়েছিল, সেই জনগণের পিপাসাজনিত উৎপীড়নও আবার দেখা দেয়। কিন্তু আবার তাদের জন্য মোশি শৈল থেকে উৎসারিত জল দিয়ে মরুপ্রান্তরকে প্লাবিত করেন। এ বর্ণনা আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করা হলে মনপরিবর্তনের রহস্য [তথা পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত] যে কি সেবিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিতে পারে। কেননা যারা একসময় শৈলের জল ভোগ করা সত্ত্বেও উদর, মাংস ও মিশরীয়দের সুখভোগের দিকে চেয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছিল, তারা এবার, যে মঙ্গল বিষয়গুলোর অংশী ছিল সে বিষয়গুলো-ক্ষুধা দ্বারা শাস্তি ভোগ করে।

২৭০। কিন্তু তারা যে শৈল পরিত্যাগ করেছিল, অনুতাপ দ্বারা পুনরায় তার সন্ধান পেতে পারে, তা থেকে জলের উৎস উৎসারিত করতে পারে, ও তৃপ্তি সহকারে সেই পানীয় ভোগ করতে পারে যা শৈল তাঁকেই দান করে যিনি বিরোধীদের পরিদর্শনের চেয়ে যিশুরই [অর্থাৎ যোশুয়ারই] পরিদর্শন বিশ্বাসযোগ্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন, যিনি আমাদের জন্য রক্তমাখা সেই আঙুরগুচ্ছ চেয়ে দেখছিলেন, ও কাঠ গুণে পুনরায় শৈল থেকে জল উৎসারিত করেছিলেন (ক)।

২৭১। কিন্তু জনগণ মোশির মহত্ত্ব ধাপে ধাপে অনুসরণ করতে তখনও শেখেনি। তারা এখনও দাসযোগ্য বাসনা দ্বারা আকর্ষিত ও মিশরের সুখভোগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে বিবরণী আমাদের দেখাতে চায় যে, হাজার হাজার ভাবে রোগে আক্রান্ত হতে বাধ্য যে মানব স্বভাব, তা নানা ভাবাবেগের মধ্যে এটারই প্রতি বিশেষভাবে প্রবণ।

[গণনা ১১:৬, ৯ দ্রঃ]

২৭২। কিন্তু এমন চিকিৎসকের মত যিনি নিজের নৈপুণ্যে অমঙ্গলের অবিরত প্রাধান্য বিরোধিতা করেন, মোশি এমনটা দেন না রোগ মৃত্যু পর্যন্ত তাদের উপর প্রভুত্ব করবে। কেননা তাদের বাজে অভিলাষ এমন সাপগুলোকে জন্ম দিচ্ছিল যেগুলোর কামড় আঘাতগ্রস্তদের মধ্যে মারাত্মক বিষ অনুপ্রবেশ করাচ্ছিল; কিন্তু সাপের প্রতীক দ্বারা সেই মহান বিধানকর্তা প্রকৃত সাপগুলোর শক্তি নিঃশেষ করে দিলেন (ক)।

২৭৩। প্রতীকের অর্থ আরও স্পষ্টভাবে বোঝাবার সময় এবার এসেছে। এ জঘন্য ভাবাবেগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা একটামাত্র, তথা সেই শুদ্ধিকরণ যা আমাদের প্রাণ ধর্মভক্তির রহস্য থেকে অর্জন করে। যে রহস্যে আমরা বিশ্বাসী সেক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক বিষয়টা হল তাঁরই যন্ত্রণাভোগে বিশ্বাস যিনি আমাদের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করতে মেনে নিয়েছেন। ক্রুশই তো যন্ত্রণাভোগ, যার ফলে, বর্ণনা যেমনটা বুঝিয়ে দেয় সেই অনুসারে, যে কেউ সেটার দিকে তাকায় সে অভিলাষের বিষ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

২৭৪। কিন্তু ক্রুশের দিকে তাকানোর অর্থ হল, নবীর কথামত ঈশ্বরভয় দ্বারা নিজের মাংস পেরেক দিয়ে সত্যিকারে বিঁধিয়ে দেওয়ায় (ক) নিজের গোটা জীবনকে জগতের কাছে মৃত ও ক্রুশবিদ্ধ করা (খ) ও যত পাপের সামনে তা অবিচল করা। যে পেরেক মাংসকে অবিচল রাখে তা হল আত্মসংযম।

২৭৫। সুতরাং, যেহেতু বাজে অভিলাষ মাটি থেকে মৃত্যুজনক সাপ বের করে (কেননা জঘন্য ভাবাবেগের যেকোন ফল হল একটা সাপ), সেজন্য বিধান আমাদের তাই দেখায় যা সেই কাঠে প্রকাশ পায়। তা যে সাপ তা নয় বরং তা সাপের সাদৃশ্য, যেইভাবে মহান পলও বলেন, ‘*পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে*’ (ক)। সত্যকার সাপ হল পাপ, এবং যে কেউ পাপ-সাপের পক্ষে চলে যায়, সে সাপের স্বভাব আপন করে নেয়।

২৭৬। সুতরাং, মানুষ তাঁরই দ্বারা পাপ থেকে মুক্তি পায় যিনি সাপের সাদৃশ্য নিজের উপরে তুলে নিয়েছেন এবং এই আমাদের সমরূপ হয়েছেন যারা সাপের সাদৃশ্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলাম। তাঁরই খাতিরে মৃতদের জনিত দুঃখ সরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু জন্তুগুলো যে ধ্বংসিত হয় তা নয়: আমি অভিলাষকেই জন্তু বলি। কেননা যে অনিষ্টকর মৃত্যু পাপীদের আঘাত করে, যারা ক্রুশের দিকে তাকায় তা তাদের কিছুই করতে পারে না; কিন্তু আত্মার বিরোধী মাংসে যে কামনা স্থিত, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসিত হয়নি (ক)।

২৭৭। বাস্তবিকই, বাসনার কামড় নিজের প্রতিক্রিয়া বিশ্বাসীদের মধ্যেও কার্যকর করে; কিন্তু ক্রুশকাষ্ঠের উপরে যাঁকে উত্তোলন করা হয়েছে, যে কেউ তাঁর দিকে তাকায় সে সেই ভাবাবেগ দূর করে দেয় যেহেতু সে আজ্ঞার ভয় দ্বারা ঔষধই দ্বারা যেন বিষ নিঃশেষ করে ফেলেছে। এবং মরুপ্রান্তরে উত্তোলিত সাপ যে ক্রুশ-রহস্যের চিহ্ন,

এবিষয়ে প্রভুর কণ্ঠ সেখানে প্রকাশ্যেই শিক্ষা দেয় যেখানে তিনি বলেন, *‘মোশি যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে’* (ক)।

সত্যকার যাজকত্ব

২৭৮। যত অনিষ্ট একটা শেকলেই যেন বিজড়িত ক'রে সাপ পুনরায় জঘন্য সুসঙ্গতি সহ নিজের পথে এগিয়ে চলে। এবং বিধানকর্তা চিকিৎসকের মত এমন প্রতিকার স্থির করেন যা অনিষ্টের তীব্রতার অনুরূপ। কেননা, যারা সাপের সেই সাদৃশ্যের দিকে তাকাত, তাদের বিরুদ্ধে সাপের কামড় অকেজো বলে প্রমাণিত হওয়ার পর (এবং আমরা যা বলেছি, তা গুণে তুমি যদি প্রতীক সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করে থাক), আমাদের ক্ষতি করার জন্য যে তত বহুবিধ অমঙ্গল দিয়ে ব্যস্ত থাকে, সে পাপ করার আর একটা উপায় খুঁজে বের করে। তেমনটা আজও অনেকের মধ্যে ঘটছে, আর আমরা এবিষয়ে সাক্ষী।

[গণনা ১৬:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

২৭৯। কেননা এমন কেউ আছে যারা যথেষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনধারণ দিয়ে বাসনার ভাবাবেগ শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখায় যাজকত্ব আকাঙ্ক্ষা করে (ক), এবং এভাবে মানবীয় আগ্রহ ও অহঙ্কার জনিত প্রেরণার দ্বারা ঈশ্বরের দূরদর্শী প্ররিকল্পনা অপমান করে; এবং পাপের এ জঘন্য ধারার দিকে সে-ই তাদের প্রণোদিত করে যে, বিবরণীর অভিযোগ অনুসারে, সবসময় মানুষের অনিষ্ট ঘটায়।

২৮০। যারা বাসনায় জ্বলত, তাদের বিরুদ্ধ ভূমি সেসময় থেকে আর সাপ জন্মাল না, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের খাতিরে যাঁকে সেই কাঠে উত্তোলন করা হয়েছিল; এবং তারা মনে করল, তারা বিষাক্ত কামড়ের চেয়ে উপরেই রয়েছে; তখন এমনটা ঘটে যে, বাসনা-জনিত ভাবাবেগ নিঃশেষ হতে হতে তার জায়গায় গর্ব-রোগই অনুপ্রবেশ করে। এর ফলে, তাদের যে পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেই পদে থাকা তাদের পক্ষে বেশি নিচু বলে বোধ ক'রে তারা, ঈশ্বর যাজকত্ব-পদ যাদের বণ্টন করেছিলেন, তাদের দূর করে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে সেই যাজকত্ব-মর্যাদা পাবার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু অতল

গহ্বর তাদের গ্রাস করলে তারা নিঃশেষ হয়। এবং তাদের দলের মধ্য থেকে যারা স্থলে বেঁচে যায়, তারা বিদ্যুৎ-ঝলকের আগুনে পুড়ে যায়; এর ফলে আমি মনে করি, এ বিবরণী দিয়ে ঐশ্বরিক বাণী এশিক্ষা দিতে অভিপ্রেত যে, গর্বে নিজেকে উত্তোলন করার শেষ গন্তব্যস্থান হল অতলে নেমে যাওয়া। এমনকি, এ ঘটনা ভিত্তি ক'রে একজন যুক্তিসঙ্গত ভাবে গর্বকে নিচের দিকেই আরোহণ বলে বর্ণনা করতে পারবে।

২৮১। এ ধারণা যে মানুষদের স্বাভাবিক অভিমতের বিরোধী, তাতে তুমি বিস্মিত হবে না, কারণ অধিকাংশ লোক এমনটা ভাবে যে, গর্ব শব্দটা অন্যান্যদের উপরেই থাকা নির্দেশ করে; কিন্তু এখানে বর্ণিত ঘটনাগুলো আমাদের দেওয়া সংজ্ঞা সত্য বলে প্রমাণিত করে। কেননা যারা অন্যান্যদের উপরে নিজেদের উন্নীত করেছিল তারা যখন অতলে পড়ে যেহেতু তাদের নিচে সৃষ্ট একটা গহ্বরের কারণে ভূমি খুলে গেছিল, তখন কেউই সেই সংজ্ঞা নিন্দা করতে পারে না, যা অনুসারে গর্বে উন্নীত হওয়া একেবারে নিচে পড়ে যাওয়ার শামিল।

২৮২। এভাবে, আমরা এঘটনাসকল লক্ষ করলে মোশি এ শিক্ষা দেন, যেন আমরা অর্জিত সাফল্যের কারণে গর্বিত না হয়ে বরং নম্রতা দেখাই, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উত্তম মনোভাব বজায় রাখি। কেননা জগতের সমস্ত আমোদপ্রমোদ জয় করেছ বিধায় তুমি যে অন্য ধরনের ভাবাবেগের শিকার হওয়া থেকে সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছ এমন নয়। বাস্তবিকই যেকোন উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ যতক্ষণ ভাবাবেগ হয়ে থাকে, ততক্ষণ তা পতন স্বরূপ, ও ভাবাবেগের ভিন্নতা অনুযায়ী পতনের ভিন্নতা বলতে কিছুই নেই: একজনের পতন হয় কারণ সে আমোদপ্রমোদের তৃপ্তিকর মসৃণতায় পিছলে পড়ে; অন্যদিকে অন্য একজনের পতন হয় কারণ সে গর্বে হোঁচট খেয়েছে। আসলে, যে বুদ্ধিসম্পন্ন, তার কাছে এক প্রকার পতন অন্য প্রকার পতনের চেয়ে বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু প্রতিটি পতন যতক্ষণ পতন হয়, ততক্ষণ তা এড়াবার বিষয়।

২৮৩। সুতরাং, তুমি যদি আজও এমন একজনকে দেখ যে আমোদপ্রমোদ জনিত রোগ থেকে কোন রকমে সুস্থতা লাভ করেছে কিন্তু অন্যান্যদের চেয়ে নিজেকে উন্নত মনে ক'রে অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে যাজকত্ব অন্বেষণ করে, তবে তুমি নির্দ্বিধায় ধরে

নিতে পার, তুমি তাকে তার গর্বের উচ্চতায় মাটির তলে পড়তে দেখবেই। কেননা, পরবর্তী ঘটনা দিয়ে বিধান এ শিক্ষা দেয় যে, যাজকত্ব মানবীয় নয়, ঐশ্বরিক বিষয়।

[গণনা ১৭:১৬-২৪ দ্রঃ]

২৮৪। শিক্ষাটা এরূপ [ক]: সেসময়, এক একটা লাঠিকে দাতার নামে চিহ্নিত করার পর মোশি এক একটা গোষ্ঠীর জন্য একটা করে লাঠি বেদির সামনে উপস্থাপন করান, যাতে অন্যান্য লাঠির চেয়ে কোন ঐশ বিস্ময়কর কাজ দ্বারা চিহ্নিত লাঠি ঊর্ধ্ব দ্বারা নির্ধারিত মনোনয়নের সাক্ষ্য স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তেমনটা সমাধা করা হলে অন্যান্যদের লাঠি যেমন ছিল তেমনি থাকল, কিন্তু যাজকের যে লাঠি অন্যের দ্বারা জলসিঞ্চিত হয়েছিল এজন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বর তার মধ্যে উপযুক্ত ক্ষমতা সঞ্চার করেছিলেন, এজন্যই শিকড় ধরেছিল, সেই লাঠিতে শাখা ও ফল ধরেছিল ও ফলটা পরিপক্ক হল (ফলটা ছিল বাদাম)।

২৪৫। এ ঘটনার ফলে গোটা জনগণ শান্তশিষ্ট থাকতে শিখল। যাজকের লাঠি থেকে পুষ্পিত সেই ফল আমাদের এবিষয়ে ভাবতে প্রেরণা দেয়, জীবনের বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে যাজকের আচরণ কেমন আত্মসংযমী, কঠোর ও কঠিন হওয়া দরকার, কেননা তার অভ্যন্তরে সেই গুপ্ত ও অদৃশ্য ফল বহন করে যা সময়মত আলোতে আসে: সেসময় ফলের মধ্যে যা খাদ্য, সেই অংশ যথাসময় পরিপক্ক হয়, শক্ত ছালটা ভাঙে, ও ফলের কাঠময় কোষ দু'ভাগ হয়।

২৮৬। যখন তুমি এমনটা জানতে পার, নিজের বিষয়ে যাজক পরিচয় দেয় এমন একজন সেইভাবে মধুর, আরামপূর্ণ ও সহজ জীবন যাপন করে যেভাবে তারাই করে যারা বেগুনি কাপড়ে ও সূক্ষ্ম ক্ষোমের বস্ত্রে নিজেদের ভূষিত করে, পরিমেশিত আঙুররস পান করতে করতে চর্বিয়ালা ভোজসভায় বসে মোটা-সোটা হয়, দামী সুগন্ধী তেল গায়ে মাখে, ও বাকি সেই সমস্ত বিলাসিতা উপভোগ করে যা বিলাসিতাপূর্ণ জীবনে নিবেদিত মানুষের কাছে মধুর লাগে, তখন তেমন ব্যক্তির বেলায় তুমি সুসমাচারের বাণী উপযোগী করতে পার, *'ফল লক্ষ করে আমি ফল থেকে যাজকীয় গাছ চিনি না'* [ক]। যাজকীয় ফল একরকম, এই ফল আর একরকম; সেই ফল হল আত্মসংযম, এই ফল হল ভোগবিলাসিতা; সে মাটি থেকে উৎপন্ন রস দ্বারা মোটা-সোটা হয় না, কিন্তু এর কাছে

অতল থেকে উৎসারিত অপর্যাপ্ত পরিমাণে সেই আমোদপ্রমোদের স্রোত বয়ে আসে, যে আমোদপ্রমোদের কারণে এসময় জীবনের ফল লাল হয়।

সেই রাজকীয় রাস্তা (গণনা ২০:১৭ দ্রঃ)

২৮৭। জনগণ এ ভাবাবেগ থেকেও নিজেদের শুচীকৃত করার পর, বিধান দ্বারা রাজকীয় রাস্তায় চালিত হয়ে তারা বিদেশী জীবনধারণের মধ্য দিয়ে পার হয়; এমনটা হয় যাতে কেউই এপাশ ওপাশ দিয়ে সরে না যায়, কারণ যে যাত্রা করে, তার পক্ষে আড়াআড়ি পথ দিয়ে সরে যাওয়া বিপজ্জনক ব্যাপার। কেননা, যদি চূড়ার উচ্চতম স্থলে খাঁড়া দু'টো ফাটলের মধ্যে একটামাত্র সরু পথ চলে যায়, তাহলে যে সেই পথ দিয়ে যায় তার পক্ষে একপাশ বা অন্য পাশ দিয়ে মধ্য পথ থেকে সরে যাওয়ার বিপদ আছে: কেননা যে কেউ এপাশ বা ওপাশ দিয়ে সরে, ঠিক সেখানেই, সেই দুই পাশে সমভাবে গভীর খাদ তার অপেক্ষায় রয়েছে; একই প্রকারে বিধান এমনটা দাবি রাখে (ক), যে কেউ ধাপে ধাপে তার অনুসরণ করে সে যেন বাঁমে হোক বা সে যা ডান মনে করে সেপাশে হোক সরে না যাবার জন্য যেন সেই পথ ত্যাগ না করে যা প্রভু সরু ও সঙ্কীর্ণ বলে চিহ্নিত করেন (খ)।

২৮৮। কেননা, এক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা প্রচলিত যা অনুসারে সদ্‌গুণগুলো মাঝখানেই রয়েছে, কারণ প্রতিটি রিপু, স্বভাবত, হয় সদ্‌গুণের অভাব থেকে, না হয় সদ্‌গুণের আতিশয্য থেকে উদ্ভূত। সাহসের কথা ধরা হোক, তার সদ্‌গুণের অভাব হল কাপুরুষতা, ও তার আতিশয্য হল দুঃসাহস, কিন্তু উভয় থেকে মুক্ত যে আচরণ, তা এপাশে বা ওপাশে স্থিত রিপু দু'টোর মাঝখানে স্থান নেয়; এবং এটাই সদ্‌গুণ। একইপ্রকারে, শ্রেয় বিষয়ের দিকে ধাবিত অন্য যত আচরণ, তা, বলতে গেলে, খারাপ প্রতিবেশীর মধ্যে মাঝখান পথ ধরে থাকে।

২৮৯। প্রজ্ঞা সবসময় চালাকি ও সরলতার মধ্যস্থান রাখে, কেননা সাপের চতুরতা হোক বা কপোতের সরলতা হোক (ক), দু'টোই প্রশংসার পাত্র নয় যখন সেই দু'টোর কেবল একটাই ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু যে মধ্যবর্তী আচরণ সেই দু'টোকে যুক্ত করে, সেটা সদ্‌গুণ হয়ে যায়। যে কেউ মিতাচারিতার অভাবী সে উচ্ছৃঙ্খল, যে কেউ

অমিতাচারী সে, প্রেরিতদূতের কথামত, নিজের বিবেক জ্বলন্ত লোহার শিক দিয়ে চিহ্নিত করে [খ]। কেননা একজন আমোদপ্রমোদের হাতে নিজেকে অবাধেই ছেড়ে দেয়, কিন্তু অন্যজন বিবাহও ঘৃণা করে কেমন যেন বিবাহ একটা ব্যভিচার। কিন্তু যে আচরণ সেই দু'টোর মধ্যে স্থান রাখে, সেটাই মিতাচারিতা।

২৯০। এবং প্রভুর কথামত, যেহেতু '*জগৎ অমঙ্গলে স্থিত*' [ক], এবং যে কেউ বিধান অনুসরণ করে, তার পক্ষে যা কিছু সদ্‌গুণের বিরোধিতা করে, তা তথা জঘন্যতাই বিদেশী, সেজন্য যে কেউ এজগতের মধ্য দিয়ে জীবনের পথে চলে, সে সদ্‌গুণ অভিমুখে এ আবশ্যকীয় যাত্রার গন্তব্যস্থানে নিরাপদে পৌঁছবে যদি রিপুর কারণে দু'পাশে স্থিত দুর্গম পথগুলোতে সরে না গিয়ে সেই পথ ধরে চলে যা সত্যিকারে হল সেই সোজা পথ যা বেয়ে সদ্‌গুণ নিজে চলে ও সেজন্য তার দ্বারা শুভ্র হয়েছে।

সেই বালায়াম ও সেই মোয়াবীয় স্ত্রীলোকেরা (গণনা ২২:২ ইত্যাদি দ্রঃ)

২৯১। যেমনটা বলা হয়েছে, সদ্‌গুণে অগ্রগতির সাথে সাথে সেই বিরোধীর মতলবের কায়দাও অগ্রসর হয়, এবং অনিষ্টের দিকে টানবার জন্য সেই বিরোধী এক একজনের জন্য উপযোগী সুযোগ পায়। সুতরাং, যেহেতু সেসময় জনগণ ঈশ্বর অনুযায়ী জীবনযাপনে যথেষ্ট বেড়ে উঠেছিল, সেজন্য সেই বিরোধী অন্য একটা মতলব হাতিয়ার করে, তারই মত যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়ায় শক্তির দিক দিয়ে মহত্তর শত্রুর অগ্র বিন্যাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা কঠিন বোধ ক'রে, মতলবের মাধ্যমে ও ওৎ পাতার মাধ্যমে শত্রুকে পরাজিত করে। এর ফলে, বিধান ও সদ্‌গুণ গুণে যারা প্রবল হয়েছিল, রিপুর সেনাপতি তাদের বিরুদ্ধে নিজের সেনাদলকে আর সামনাসামনি চালনা করে না, কিন্তু নানা মতলব হাতিয়ার করে তাদের গোপনেই আক্রমণ করে।

২৯২। সেজন্য, যাদের বিরুদ্ধে সে মতলব করছিল, তাদের বিপক্ষে নিজের সাহায্যে সেই জাদুবিদ্যা আহ্বান করে যা বিবরণী মন্ত্রজালিক ও পাখি-ওড়ার কায়দা পরীক্ষক বলে উপস্থাপন করে: সে তো কোন না কোন অপদূত-জাতীয় শক্তির অধিকারী হওয়ায় নিজের বিরোধীদের অনিষ্ট ঘটাবার অধিকার রাখত ও যাকে মিদিয়ানীয়দের জনপ্রধান দ্বারা ভাড়া করা হয়েছিল যাতে সে নিজের অভিশাপ দিয়ে তাদেরই ক্ষতি করে

যারা ঈশ্বরের পক্ষে জীবনযাপন করছিল; কিন্তু এই লোক অভিশাপ আশীর্বাদে পরিণত করল। এবং আগেকার সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে মিল রেখে আমরা এটা উপলব্ধি করি যে, যারা সদ্‌গুণে জীবনযাপন করে, তাদের বিরুদ্ধে জাদুবিদ্যাও কার্যকর নয়, বরং যে কেউ ঈশ্বরের সাহায্য দ্বারা সুস্থির হয় সে যেকোন মতলবের উপর জয়ী হয়।

২৯৩। কেননা বিবরণী সেইখানে এটা ঘোষণা করে যে, লোকটা পাখি-ওড়ার কায়দা থেকে দৈব নেবার বিদ্যা পালন করত, যেখানে বিবরণীটা বলে যে, সে দৈববাণী দেবার ক্ষমতা হাতে রাখত ও পাখিদের থেকে মন্ত্রণা পেত, এবং একথার আগে এও বলে যে, লোকটা নিজের গাধীর ডাক থেকে সেই সমস্ত কিছু জানতে পেরেছিল যা তার বর্তমান দায়িত্ব সংক্রান্ত। শাস্ত্র গাধীর কণ্ঠকে এজন্য ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট বলে বর্ণনা করেছে কারণ লোকটা অপদূত-জাতীয় ক্ষমতা গুণে বিচারশক্তিহীন জীবদের কণ্ঠ থেকে মন্ত্রণা পেতে অভ্যস্ত ছিল, এবং এভাবে শাস্ত্র আমাদের দেখায় যে, যারা এ অপদূত-জাতীয় মতলবে বিশ্বাসী, তারা সবাই এ চর্চার মধ্য দিয়ে যুক্তির বাণীর চেয়ে বিচারশক্তিহীন জন্তুদের কণ্ঠ থেকে আগত শিক্ষাই গ্রহণ করে নেয়। তেমন শিক্ষায় কান দিয়ে সেই মন্ত্রজালিক, যে উপায় দিয়ে ছলনা করতে অভ্যস্ত ছিল সেই একই উপায় হাতিয়ার করে জানতে পারল যে, যে শক্তির বিরুদ্ধে তাকে ভাড়া করা হয়েছিল সেই শক্তি অপরাজেয়।

২৯৪। বাস্তবিকই সুসমাচারেও ‘বাহিনী’ বলে অভিহিত অপদূতদের সঙ্ঘ (ক) প্রভুর অধিকারের বিরোধিতা করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়; কিন্তু যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন, তিনি যখন এগিয়ে এলেন তখন সেই অপদূতেরা উচ্চকণ্ঠে তাঁর মহত্তর প্রতাপ প্রকাশ করল ও সত্য লুকিয়ে রাখল না তথা, যা সময়মত পাপীদের শাস্তি দেবে, তা ঐশ্বরিক স্বরূপ। বাস্তবিকই অপদূতদের সেই কণ্ঠ বলে, ‘আমরা জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন। আপনি আসল সময়ের আগেই আমাদের জ্বালাযন্ত্রণা দিতে এসেছেন’ (খ)। তেমনিভাবে সেইকালেও ঘটেছিল, কারণ যে অপদূত-জাতীয় শক্তি মন্ত্রজালিকের সাথে সাথে চলত, সেই শক্তি বালায়ামকে শিখিয়ে দিল যে, সেই জনগণ অপরাজেয় ও অবিরোধ্য।

২৯৫। আমরা যা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছি, তাতে বিবরণীকে উপযোগী করে ঘোষণা করি, যারা সদ্‌গুণে জীবনযাপন করে যে কেউ তাদের অভিশাপ দিতে চায়, সে বিরোধী

ও অপমানজনক কথা উচ্চারণ করতে পারে না, বরং অভিশাপ আশীর্বাদে পরিণত করে। এর অর্থ হল যে, যারা সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন পালন করে, নিন্দাজনক অপবাদ তাদের স্পর্শ করে না।

২৯৬। কেননা, যে কোনও কিছুরই অধিকারী নয়, সে কেমন করে লোভী বলে নিন্দিত হবে? অথবা, যে একাকী ও নির্জন জীবন যাপন করে, তার বিষয়ে কেমন করে উচ্ছৃঙ্খলতার কথা প্রচারিত হবে? অথবা, যে কোমল, তার বিষয়ে কেমন করে রোষের কথা, বা যে নম্র, তার বিষয়ে কেমন করে গর্বের কথা প্রচারিত হবে? অথবা যে কেউ সেইসব কিছুর বিপরীত বলে পরিচিতি দেয়, তার বিষয়ে কেমন করে অন্য ধরনের নিন্দাজনক কথা প্রচারিত হবে? তেমন মানুষের লক্ষ্য হল নিন্দার আক্রমণের অতীত জীবনধারণ উপস্থাপন করা, যাতে করে, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, '*আমাদের বিরোধী অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে*' (ক)। এজন্য, অভিশাপ দেবার জন্য যাকে ভাড়া করা হয়েছিল, তার কণ্ঠ বলে, 'প্রভু যাকে অভিশাপ দেন না কেমন করে আমি তাকে অভিশাপ দেব? (খ), অর্থাৎ, যে নিন্দা করার মত কিছুই উপস্থাপন করে না, ঈশ্বরকে লক্ষ করে বিধায় যার জীবন রিপুর আক্রমণের অতীত, আমি কেমন করে তার নিন্দা করব?

২৯৭। নিজের প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়েছিল বলে অমঙ্গলের উদ্ভাবক যে এজন্য যাদের বিরুদ্ধে নিজের মতলব ফেরাতে অভ্যস্ত তাদের ক্ষতি আঁটায় ক্ষান্ত হল তা নয়, কিন্তু সে যাতে নিপুণ তাতেই নিজের মতলব ফেরায়, তথা, মানব স্বভাবকে পুনরায় আমোদপ্রমোদের মাধ্যমে লোভ দেখায়। কেননা যেকোন রিপুর টোপ হিসাবে উপস্থাপিত আমোদপ্রমোদ অধিক আগ্রহী প্রাণকে সহজে ধ্বংসের বড়শির কাছে আর্কষণ করে; এবং তেমন পরিস্থিতিতে উচ্ছৃঙ্খলাই বিশেষভাবে অরক্ষিত মানব স্বভাবকে অনিষ্টের দিকে টানে। সেই কালেও এইভাবে ঘটেছিল।

[গণনা ২৫:১ ইত্যাদি দ্রঃ]

২৯৮। কেননা যারা অস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ও এটা দেখিয়েছিল যে, লোহা দ্বারা আনা মতলব তাদের নিজেদের শক্তির চেয়ে দুর্বল ছিল, ও সজোরে শত্রুদলকে পালাতে বাধ্য করেছিল, তারা সবাই আমোদপ্রমোদের কারণে স্ত্রীলোক-তীর দ্বারা আহত

হয়েছিল; এবং যারা পুরুষদের চেয়েও শক্তিশালী হয়েছিল, তারা স্ত্রীলোকদের দ্বারা নিজেদের পরাজিত হতে দিল। কেননা যেইমাত্র তাদের কাছে সেই স্ত্রীলোকদের দেখানো হল যারা অস্ত্রের স্থানে নিজেদের রূপ দেখাচ্ছিল, তারা আমোদপ্রমোদে নিজেদের তেজ উড়িয়ে দিয়ে সাথে সাথে নিজেদের বীরতুল্য সাহসের কথা ভুলে গেল।

২৯৯। এবং তাদের মধ্যে অবশ্যই এমন কয়েকজন ছিল যারা বিদেশী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার নিষেধাজ্ঞা আদৌ সহ্য করেনি। কিন্তু অনিষ্টের সঙ্গে আত্মীয়তা তাদের মঙ্গলের সাহায্য-বঞ্চিত করল। কেননা ঈশ্বরত্ব সাথে সাথে তাদের প্রতি বিরোধী হলেন; কিন্তু ফিনেয়াস পবিত্র আগ্রহে পরিপূর্ণ হয়ে এমনটা অপেক্ষা করেননি পাপ ঐশ্বরিক রায় দ্বারা শোধিত হবে, কিন্তু তিনি নিজেই একাধারে হলেন বিচারকর্তা ও ঘাতক।

৩০০। কেননা, যারা উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের শিকার ছিল তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে চালিত হয়ে ফিনেয়াস রক্ত দিয়ে পাপ শোধন করায় যাজক-ভূমিকা পালন করলেন: অশুচিতা জনিত দূষণ থেকে মুক্ত এমন নির্দোষ জন্তুর রক্ত দিয়ে নয়, কিন্তু যারা পাপকর্মে নিজেদের মধ্যে মিলিত করেছিল, তাদেরই রক্ত দিয়ে। এজন্য যে বর্শা এক কোপে সেই দেহ দু'টো বিঁধিয়ে দিল, তা ঐশ্বরিক বিচারের কাজ মন্থর করে দিল ও সেইভাবে আমোদপ্রমোদের সঙ্গে পাপীদের মৃত্যু মিশিয়ে দিল।

৩০১। আমি মনে করি, বিবরণী মানুষদের কাছে প্রাণের জন্য উপকারী একটা প্রতীক উপস্থাপন করে যা আমাদের এবিষয়ে শিক্ষা দেয় যে, মানুষের যুক্তির বিরোধিতা করে যতগুলো ভাবাবেগ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শক্তির দিক দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে এমন একটাও নেই যা আমোদপ্রমোদ-রোগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বাস্তবিকই, ইস্রায়েলীয়েরা সবাই মিলে মিশরীয় অশ্বারোহীদের চেয়ে নিজেদেরই বলবান দেখানোর পরে, আমালেকীয়দের পরাজিত করার পরে, এদের নিকটবর্তী জাতিসকলের কাছে নিজেদের ভয়ঙ্কর দেখানোর পরে ও মিদিয়ানীয়দের সেনাবাহিনীকে পরাভূত করার পরে, তারা যে বিদেশী স্ত্রীলোকদের দেখা মাত্র নিজেদের অনিষ্টের দাস করল, তা, যেমনটা বলেছি, শুধু এটাই দেখায় যে, আমোদপ্রমোদ আমাদের পক্ষে এমন শত্রু যার বিরোধিতা করা ও যাকে পরাজিত করা কঠিন।

৩০২। যারা অস্ত্রের দ্বারা পরাজিত হয়নি, শুধু নিজেকে দেখা দিলেই তাদের পরাস্ত করার পর সেই আমোদপ্রমোদ, সূর্যের আলোতে তাদের লজ্জা নিন্দিত করে তাদের সর্বনাশে অসম্মানের জয়চিহ্ন উত্তোলন করল। কেননা আমোদপ্রমোদ এটা দেখাল যে, তার নিজের কারণেই মানুষ একটা পশু হয় [ক]; হ্যাঁ, এমন মানুষ যাদের পশুতুল্য ও বিচারশক্তিহীন উচ্ছৃঙ্খলা-প্রবণ তাড়না, অসম্মান না লুকিয়েও, মানব স্বভাবকে ভুলে যেতে তাড়িত করল, এমনকি সেই ভাবাবেগের অসম্মান বিষয়ে বড়াই ক'রে ও লজ্জার বিশ্রী চেহারা বিষয়ে নিজেদের সুন্দর ক'রে শূকরের মত প্রকাশ্য, একে অন্যের চোখের সামনেই, অশুচিতা-পঙ্কিলতায় গড়াগড়ি দিল।

৩০৩। এ বর্ণনা থেকে আমরা কী শিখব? এটা শিখব, আমোদপ্রমোদ-রোগ যে কত শক্তি দিয়ে অনিষ্টের দিকে তাড়া দেয় একবার তা বুঝে আমরা যেন এই প্রতিবেশী থেকে আমাদের জীবন যথাসম্ভব দূরে রাখি যাতে রোগটা এমন আগুনের মত যা সংস্পর্শের কারণে সর্বনাশা শিখা উৎপন্ন করে আমাদের সান্নিধ্যে প্রবেশের সুযোগ না পায়। কেননা শলোমন সেই প্রজ্ঞায় [অর্থাৎ প্রবচনমালা পুস্তকে] এটাই আমাদের শিক্ষা দিয়ে বলেন, জুতো-ছাড়া পায়ে জ্বলন্ত কয়লা স্পর্শ করতে নেই ও বুকে আগুন রাখতে নেই [ক], এই অর্থে যে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ থেকে মুক্ত থাকা আমাদের উপরে নির্ভর করে—ততক্ষণ ধরে যতক্ষণ আগুনে যা ইন্ধন দেয় আমরা তা থেকে নিজেদের দূরে রাখি। কিন্তু যদি এমন পর্যায় পৌঁছোই যে এ জ্বলন্ত উত্তাপ স্পর্শ করি, তাহলে লালসার আগুন আমাদের অন্তরে ঢুকবেই যার ফলে পা পুড়ে যাবে ও বুক নষ্ট হয়ে যাবে।

৩০৪। আমরা যেন এই অনিষ্ট থেকে দূরে থাকি, সুসমাচারে প্রভু নিজের বাণী দ্বারা [ক] ভাবাবেগের শিকড় তথা দৃষ্টিজনিত লালসা একবার সবসময়েরই মত কেটে ফেলেছেন এশিক্ষা দিয়ে যে, যে কেউ চোখ দিয়ে লালসা গ্রহণ করে নেয়, সে নিজের বিরুদ্ধে রোগের জন্য পথ উন্মুক্ত করে। কেননা অনিষ্টকর ভাবাবেগ মহামারির মত একবার অপরিহার্য স্থানগুলো দখল করলে কেবল মৃত্যুতে নিঃশেষ হয়।

দাস মোশির সিদ্ধতা

৩০৫। কিন্তু তবু আমি মনে করি, পাঠকদের কাছে মোশির সমস্ত জীবন সদ্‌গুণের আদর্শ বলে উপস্থাপন ক'রে এবিষয়ে আলোচনা অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। কেননা, যে কেউ ঊর্ধ্বতর জীবনের দিকে প্রাণপণে ধাবিত, আমি যা বলেছি, সত্যকার তত্ত্ববিদ্যা ক্ষেত্রে তার জন্য তা ক্ষুদ্র নয় এমন পাথেয় হবে, কিন্তু যে কেউ সদ্‌গুণের শ্রম ক্ষেত্রে অলস, আমরা যা লিখেছি তার চেয়ে আরও বেশি লিখলেও, পরিমাণ থেকে তার কাছে কোন উপকার আসতে পারে না।

৩০৬। কিন্তু, শুরুতে দেওয়া সেই সংজ্ঞা ভুলে না যাবার জন্য, সেই যে সংজ্ঞার উপরে আমার আলোচনা ভর করেছে—তথা, সিদ্ধ জীবন এমন যা কোনও সীমাবদ্ধতা সিদ্ধতার প্রতি প্রবেশাধিকারে বাধা দিতে পারে না, কিন্তু প্রাণের জন্য সিদ্ধতা অভিমুখে পথ হল উত্তম সঙ্গল অভিমুখে জীবনের অবিরত অগ্রগতি—আলোচনাটা মোশির জীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘায়িত ক'রে সিদ্ধতা প্রসঙ্গে আমাদের দেওয়া সংজ্ঞা যে যথার্থ তা প্রমাণ করা উত্তম হবে।

৩০৭। কেননা তিনি সারা জীবন ধরে তেমন নানা উন্নয়নে নিজেকে উন্নীত করা সত্ত্বেও তবু নিজেরও উপরে নিজেকে উন্নীত করায় কখনও ক্ষান্ত হননি, যার ফলে, আমার মতে, তাঁর জীবন সকলের মাঝে, উপলব্ধি-আরোহণের আকাশে, মেঘলোকের উপরেও উচ্চ বলে প্রকাশ পেল এমন ইগল পাখির মত যা ঊর্ধ্বস্থানে চলাচল করে।

৩০৮। তিনি এমন সময় জন্মগ্রহণ করলেন যখন হিব্রুদের পক্ষে মিশরীয়দের মধ্যে জন্ম নেওয়া অপরাধ বলে পরিগণিত হচ্ছিল। যারা জন্ম নিত, সেই স্বৈরশাসক বিধিক্রমে তাদের দণ্ডিত করতে করতে তিনি ধ্বংসাত্মক বিধির উপর জয়ী হলেন যেহেতু আগে পিতামাতা দ্বারা ত্রাণ পেলেন ও পরে তাদেরই দ্বারা যারা সেই বিধি জারি করেছিল। এবং এরা যারা সেই বিধি দিয়ে তাঁর মৃত্যুর জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, তারাই শুধু তাঁর জীবনের জন্য শুধু নয়, কিন্তু সেই যুবককে সমস্ত বিদ্যার মধ্য দিয়ে চালনা করায় সম্মানজনক শিক্ষাদানের জন্যও যথেষ্ট যত্ন দেখাল।

৩০৯। পরবর্তীকালে মোশি মানব সম্মান ও রাজকীয় মর্যাদার চেয়ে নিজেকে আরও বেশি উচ্চ দেখান, কারণ এমনটা বিবেচনা করেন যে, প্রহরীদের ও রাজ-ব্যবস্থার নয় বরং সদ্‌গুণেরই সুরক্ষার অধিকারী হওয়া ও এই অলঙ্কার বিষয়ে গর্ব করা আরও গুরুত্বপূর্ণ ও রাজার যোগ্যতর বিষয়।

৩১০। পরে তিনি সেই স্বদেশীকে বাঁচান ও এক কোপে সেই মিশরীয়কে নিপাত করেন যাদের আমরা, ব্যাখ্যা গভীরতর ক'রে, প্রাণের বন্ধু ও শত্রু বলে ধরে নিয়েছি। তিনি শান্তশিষ্টতাকে উচ্চ শিক্ষার শিক্ষক করেন, এবং সেইভাবে সেই ঝোপ থেকে জাজ্বল্যমান সেই আলো দ্বারা তিনি মনে আলোকিত হন। তখন ঈশ্বর থেকে তাঁর কাছে যত মঙ্গল বিষয় এসেছিল, তিনি তাতে স্বদেশীয়দের অংশভাগী করার জন্য পদক্ষেপ নেন।

৩১১। নানা ও বহুবিধ আঘাত দ্বারা শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা-প্রতাপ ও স্বদেশীয়দের কল্যাণার্থে উপকারী প্রতাপ দেখিয়ে তিনি তাদের মধ্যে নিজেকে দ্বিবিধ প্রতাপের অধিকারী বলে প্রমাণ দিলেন। নিজের জন্য কোন নৌবহর ব্যবস্থা না করে তিনি তত মহৎ জনগণকে সাগরের মধ্য দিয়ে পায়ে পার করান, কিন্তু পারের জন্য জাহাজ হিসাবে তাদের জন্য বিশ্বাস যুগিয়ে হিব্রুদের জন্য অতল গহ্বরকে স্থলভূমি করেন ও মিশরীয়দের জন্য স্থলভূমিকে সাগর করেন।

৩১২। তিনি সেই জয়-গীতিকা গান করলেন; সেই মেঘস্তম্ভ দ্বারা চালিত হলেন; স্বর্গীয় আগুন দ্বারা আলোকিত হলেন; স্বর্গ থেকে আগত খাদ্য দিয়ে ভোজসভা ব্যবস্থা করলেন; শৈল থেকে উৎসারিত জল তৃপ্তি সহকারে পান করলেন; আমালেকীয়দের বিনাশের জন্য হাত প্রসারিত করলেন। আরও, তিনি পর্বতে আরোহণ করেন, নিজেকে ঘোর তমসার মধ্যে পান, তুরিধ্বনি শুনতে পান, ঐশ্বরিক স্বরূপের কাছে এগিয়ে যান, নিজেকে স্বর্গীয় তাঁবুর অভ্যন্তরে পান, যাজকত্ব ব্যবস্থা করেন, তাঁবু উত্তোলন করেন, বিধান দ্বারা জীবনধারণ সংস্কার করেন, শেষ যুদ্ধগুলো শুভ পরিণামে চালনা করেন, সেইভাবে যেভাবে বলা হয়েছে।

৩১৩। তাঁর পুণ্য জীবনধারণ শেষে তিনি যাজকত্বের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলাকে শাস্তি দেন: কেননা ঠিক এটাই উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের বিরুদ্ধে ফিনেয়াসের ক্রোধের অর্থ ছিল।

এসমস্ত কিছুর পরে তিনি বিশ্রাম-পর্বত অভিমুখে অগ্রসর হন। জনগণ প্রতিশ্রুতির জোরে যে দেশ চেয়ে দেখছিল, তিনি সেই নিম্ন দেশে হেঁটে চলেন না। স্বর্গ থেকে বেয়ে বেয়ে যা নিচে প্রবাহিত হয়, যিনি তাতেই বাঁচতে শিখেছেন, তিনি পার্থিব খাদ্যে আর স্বাদ পান না, কিন্তু উচ্চতে, এমনকি পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে তিনি এমন দক্ষ ভাস্করের মত যিনি সযত্নে নিজের জীবনের মূর্তিতে মনোনিবেশ করেন, কর্মের শেষে তিনি নিজের কর্মকে সমাপ্তিমণ্ডিত নয় কিন্তু মাল্যভূষিত করেন।

৩১৪। কেননা তার বিষয়ে বিবরণী কী বলে? এটা বলে যে, ঈশ্বরের বাণী মত ঈশ্বরের দাস মোশি মরলেন, ও তাঁর কবর কেউই জানেনি; তাঁর চোখ ক্ষীণ হয়নি, ও তাঁর মুখমণ্ডলের ক্ষয় হয়নি। তাই আমরা এটা অবগত হই যে, তত সাফল্যের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি এ উৎকৃষ্ট আখ্যার যোগ্য বলে বিবেচিত, যার জন্য তিনি ঈশ্বরের দাস (ক) বলে অভিহিত, যার অর্থ এ: তিনি সবকিছুর উপরেই মহত্তম হলেন। কেননা কেউই ঈশ্বরের সেবা করতে পারে না যদি জগতে যা রয়েছে সেটার মহত্তর না হয়ে ওঠে। এবং ঠিক এটাই হল সদ্‌গুণ অনুযায়ী সেই জীবনের সমাপ্তি যে-জীবন ঈশ্বরের বাণী দ্বারা পরিচালিত। বিবরণী সেটাকে মৃত্যু বলে চিহ্নিত করে, এমন জীবন্ত মৃত্যু যে-মৃত্যুকে সমাধিগুহা গ্রহণ করে নেয় না ও যার উপরে সমাধিমন্দির উত্তোলিত হয় না, যা চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে না, মুখমণ্ডলকেও যা ক্ষয় করে না।

৩১৫। এসমস্ত কথা আমাদের কী শিক্ষা দেয়? জীবনকালে আমরা যেন একটামাত্র লক্ষ্য লক্ষ করি তথা, আমাদের জীবনধারণের জন্য ঈশ্বরের দাস বলে অভিহিত হওয়া। কেননা যখন তুমি সকল শত্রুর উপরে, সেই মিশরীয়, আমালেকীয়, ইদুমীয়, মিদিয়ানীয়ের উপরে জয়ী হবে, যথন সাগর পার হবে, যখন সেই মেঘ দ্বারা আলোকিত হবে ও সেই কাঠ দ্বারা মিষ্টিময় হবে, যখন শৈল থেকে জল পান করবে ও স্বর্গীয় খাদ্য আস্বাদ করবে; যখন পর্বতে আরোহণ করার জন্য শুচিতা ও পুণ্যতা দিয়ে পথ উন্মুক্ত করবে ও সেখানে গিয়ে পৌঁছে তুরির কণ্ঠ থেকে ঐশ্বরিক রহস্য বিষয়ে জ্ঞাত হবে ও দেখতে বাধা দিচ্ছিল যে তমসা, সেই ঘোর তমসায় বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যাবে ও সেখানে তাঁবু সংক্রান্ত রহস্যাদি ও যাজকত্বের মর্যাদা বিষয়ে জ্ঞাত হবে;

৩১৬। যখন [হৃদয়ে] ঐশ্বরিক বাণীগুলো খোদাই করার জন্য তুমি তোমার নিজের হৃদয়ের ভাস্কর হবে, যখন সেই সোনার প্রতিমা ধ্বংস করবে অর্থাৎ তোমার জীবন থেকে লোভের বাসনা মুছিয়ে দেবে, যখন নিজেকে এত উন্নীত করবে যার ফলে সেই বালায়ামের জাদুর কাছেও অপরাজেয় বলে প্রতীয়মান হবে (জাদু শব্দটা শুনে তুমি এজীবনের সেই বিবিধ ছলনা বোঝ যার জন্য মানুষ কির্কের (ক) পানপাত্র দ্বারাই যেন মায়াগ্রস্ত হয়ে নিজের স্বরূপ ছেড়ে বিচারশক্তিহীন পশুদের চেহারা ধারণ করে); যখন এসমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হবে ও তোমার অন্তরে যাজকত্বের লাঠি পুষ্পিত হবে, ও তেমনটা ঘটবে কারণ লাঠিটা কচি-ফুলের জন্য মাটি থেকে রস না টেনে কিন্তু নিজেতে ফল এমনকি সেই বাদাম ফলই দেওয়ার ক্ষমতা রাখে যা প্রথম স্পর্শে শক্ত ও অরুচিকর কিন্তু যার ভিতরের অংশ মিষ্টি ও খাদ্যের যোগ্য; যা কিছু তোমার যোগ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তা মাটির তলে তলিয়ে দিয়ে ও আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে যখন তুমি সেটা একেবারে নিঃশেষিত করবে, তখনই তুমি শেষ লক্ষ্যের কাছে এগিয়ে যাবে।

৩১৭। লক্ষ্য বলতে আমি সেই সমস্ত কিছু বোঝাই যা সেটার জন্য সবকিছু করা হয়, যেমন চাষকর্মের লক্ষ্য হল ফল ভোগ করা, ঘর-নির্মাণের লক্ষ্য হল সেখানে বাস করা, ব্যবসার লক্ষ্য ঐশ্বর্য, প্রতিযোগীদের শ্রমের লক্ষ্য জয়মালা। তেমনি ঊর্ধ্ব জীবনেরও লক্ষ্য আছে ও সেটা হল ঈশ্বরের দাস বলে অভিহিত হওয়া; এবং এটার সঙ্গে এটাও বিবেচনা করা হয় যে, মোশির উপরে কোন সমাধিমন্দির নির্মিত হয়নি: এর অর্থ হল যে, তাঁর জীবন বস্তুহীন ও ক্ষতিকর বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

৩১৮। বর্ণনাটা তেমন দাসত্বের বিশিষ্ট চিহ্ন হিসাবে তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন-নয় চোখ ও ক্ষয়প্রাপ্ত-নয় মুখমণ্ডল উপস্থাপন করে। কেননা যে চোখ সবসময় আলোতে বিরাজ করেছিল তা কেমন করে সেই অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারত যে অন্ধবার তার কাছে বিদেশী? এবং সারা জীবন ধরে যিনি সাফল্যের সঙ্গে অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ করেছিলেন, তিনি নিজেতে ক্ষয়ের কোনও চিহ্ন গ্রহণ করে নেন না। কেননা যে কেউ সত্যিকারে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে হয়ে উঠেছে (ক) ও কোন কিছুতেই ঈশ্বরের ছাপ থেকে ভিন্ন নয়, সে নিজেতে সেই চিহ্ন বহন করে এবং অক্ষয়শীলতা ও

অপরিবর্তনশীলতা দিয়ে ও রিপুর সমস্ত চিহ্নের অভাবেই নিজের প্রাণকে অলঙ্কৃত করায় সাদৃশ্যের খাতিরে আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিল রাখে।

উপসংহার

৩১৯। হে ঈশ্বরের মানুষ, আমাদের এ ক্ষুদ্র আলোচনা সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের সিদ্ধতা বিষয়ে তেমন পরামর্শই তোমাকে অর্পণ করে; এতে মহান মোশির জীবন সৌন্দর্যের আদর্শ হিসাবে বর্ণনা করেছি, যাতে আমরা প্রত্যেকেই তাঁর জীবনধারণ অনুকরণ ক'রে, যে সৌন্দর্য আমাদের দেখানো হয়েছে, সেই সৌন্দর্যের ছাপ নিজেতে অঙ্কিত করি। কেননা, যে সিদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব (ক), মোশি যে তেমন সিদ্ধতা অর্জন করেছেন, সেবিষয়ে ঈশ্বর যা বলেছিলেন সেই সাক্ষ্যের চেয়ে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য কোথায় পাওয়া যেতে পারবে? কেননা তাঁকে উদ্দেশ করে ঈশ্বর বলেছিলেন, '*আমি অন্যান্য সকলের চেয়ে তোমাকেই জেনেছি*' (খ)। ব্যাপারটা এতেও প্রমাণিত যে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত হলেন, এবং যারা পাপ করেছিল, ঈশ্বরত্ব তাঁর প্রতি নিজের মঙ্গলময়তার খাতিরে যদি তাদেরও প্রতি প্রশমিত না হতেন তবে তিনি যে সেই সকলের সঙ্গে নিজেরও মৃত্যু বাঞ্ছনীয় মনে করতেন, তা এতে প্রমাণিত, কারণ ঈশ্বর নিজের বন্ধুকে দুঃখ না দেবার জন্য নিজের বিচার পরিবর্তন করার ফলে মোশি ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে [ঈশ্বরের] ক্রোধ বন্ধ করে দিলেন। এসমস্ত সাক্ষ্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, মোশির জীবন সিদ্ধতার সর্বোচ্চ সীমায় উন্নীত হয়েছিল।

৩২০। সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য কি: যেহেতু এটাই ছিল আমাদের আলোচনার অন্বেষিত বিষয়, এবং যা কিছু বলা হয়েছে আমরা তাতে সেই লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছি, সেজন্য, হে আমার প্রিয়জন, সেই সময় এসে গেছে যখন তুমি আদর্শকে লক্ষ করবে, এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা যা বিচার-বিবেচনা করে এসেছি তুমি তা নিজের জীবনে আরোপ করায় নিজেকে ঈশ্বর দ্বারা পরিচিত হতে দেবে ও তাঁর বন্ধু হয়ে উঠবে। কেননা সত্যি এটাই সিদ্ধতা, তথা: শাস্তি পাবার দাসতুল্য ভয়েতেই পাপময় জীবন এড়ানো, তা নয় (ক); ব্যবসাময় ও স্বার্থময় মনোভাবে সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনকে বন্দোবস্ত ক'রে পুরস্কারের প্রত্যাশায় শুভকর্ম সাধন করা, তাও

নয়; কিন্তু এটা, প্রতিশ্রুতি অনুসারে যত মঙ্গল অর্জন করব বলে প্রত্যাশা করি তাও তুচ্ছ ক'রে ঈশ্বরের বন্ধুত্ব থেকে পতিত হব, শুধু তাই ভয়ঙ্কর মনে করা ও ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে ওঠাই আমাদের পক্ষে একমাত্র সম্মানসূচক ও বাঞ্ছনীয় বিষয় বিবেচনা করা। আমার বিবেচনায়, এটাই জীবনের সিদ্ধতা।

৩২১। তারপর, যখন তোমার মন উচ্চতর ও ঈশ্বরের যোগ্যতর উচ্চতায় নিজেকে উন্নীত করবে, তখন তুমি নিজে থেকে যা পাবে (এবং তুমি যে যথেষ্টই পাবে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত), তাই হবে সর্বতভাবে সকলের জন্য সাধারণ লাভ।

টীকা - ১ম পুস্তক

১:৩ (ক) ἀρετή (আরেতে) ধারণা নৈতিক জীবনের শীর্ষস্থানের অধিকারী; শব্দটার সাধারণ অর্থ হল 'গুণ', কিন্তু এমন গুণ যা একক (ফলে 'গুণাবলি' শব্দ বা ধারণা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ও সহজাত নয় বরং নৈতিক আচরণ বৃদ্ধি ক্ষেত্রে সাধনারই ফল; এজন্য এ গ্রীক শব্দের জন্য এই অনুবাদে 'সদ্‌গুণ' শব্দ ব্যবহৃত। তাই, যেমন গ্রীক তত্ত্ববিদ্যা অনুসারে সদ্‌গুণ ও সিদ্ধ জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তেমনি সাধু গ্রেগরির ধারণায়ও সিদ্ধতা (বা সিদ্ধ জীবন) ও সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন এক; এমন সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন যা ঐশজীবনে সহভাগিতা বলেই উপলব্ধ। তাছাড়া, সাধু গ্রেগরির কাছে ধারণাটা যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এতে প্রমাণিত, কারণ তাঁর এ লেখার প্রধান নাম হল ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ (পেরি আরেতেস) অর্থাৎ 'সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ'।

১:৪ (ক) সাম ১৪:৫ দ্রঃ।

১:৫ (ক) τελειότης (তেলেইয়োতেস - সিদ্ধতা): দার্শনিক-মনা গ্রেগরি সিদ্ধতা বিষয়ে নিজের ধারণাকে এরিষ্টটলের সিদ্ধান্ত থেকে গড়তে শুরু করেন যা অনুসারে তাই মাত্র সিদ্ধতাপ্রাপ্ত যা সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তিনি কিন্তু এ নিয়ম অস্বীকার করেন, কেননা ধারণাটা সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে উপযোগী নয় যেহেতু সদ্‌গুণের অগ্রগতি কোন সীমা মানে না। এর ফলে তিনি তথাকথিত ἐπέκτασις (এপেক্তাসিস - অগ্রগতি) বিষয় অর্থাৎ ঈশ্বর অভিমুখে প্রাণের অগ্রগতি বিষয় উপস্থাপন করেন: তেমন অগ্রগতি সীমাহীন, যেহেতু যাঁর প্রতি প্রাণ অগ্রসর হয় তিনি নিজেই অসীম ও সীমাবদ্ধ নন। এ অগ্রগতি ধারণা সাধু গ্রেগরির ধর্মতত্ত্বে প্রাধান্যের অধিকারী; বিষয়টা ভূমিকাতেও কিছুটা বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত।

(খ) 'সেই ঐশ্বরিক প্রেরিতদূত' হলেন সাধু পল যিনি ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে বলেন, 'পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে আমি সেইদিকে প্রাণপণে **"ধাবিত হয়ে"** শেষ সীমার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি' (৩:১৩-১৪)। উপরোল্লিখিত ἐπέκτασις

(এপেক্তাসিস) ধারণা ক্ষেত্রে প্রেরিতদূত পলের এবাণীই সাধু গ্রেগরিকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল: বাস্তবিকই, ἐπέκτασις (এপেক্তাসিস) শব্দটা ও 'ধাবিত হওয়া' শব্দটা একই শব্দ।

১:৯ (ক) মথি ৫:৪৮।

(খ) 'মহৎ লাভ': পূর্ণ মঙ্গল লাভ করা মানুষের পক্ষে সাধ্য নয়, সেজন্য সীমিত মঙ্গল পাওয়াই মহৎ লাভ; সদ্‌গুণ অভিমুখে আরোহণে, প্রাণের পক্ষে এ সীমিত মঙ্গলই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল।

১:১১ (ক) ইশা ৫১:২।

১:১৪ (ক) সাম ৭৬:২, ৩ দ্রঃ। 'সিয়োন': নূতন নিয়মে (হিব্রু ১২:২২-২৩ দ্রঃ) ও সেকালের ব্যাখ্যাতাদের লেখায়, সিয়োন ও যেরুশালেম প্রতীকমূলক অর্থও অর্জন করে যা অনুসারে যুদেয়ায় অবস্থিত শহরটা আধ্যাত্মিক অর্থে মণ্ডলীকে ও সেইসঙ্গে স্বর্গীয় মাতৃভূমিকেও নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ হিব্রু ১২:২২-২৩ উল্লেখযোগ্য, 'তোমরা এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের সেই নগরী, সেই স্বর্গীয় যেরুশালেম, লক্ষ লক্ষ দূতবাহিনীর সেই উৎসব-সমাবেশ, স্বর্গীয় তালিকাভুক্ত সেই প্রথমজাতদের মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, সিদ্ধতায় উন্নীত ধার্মিকদের আত্মা'; ৪৮:২-৪ সামও উল্লেখযোগ্য, 'আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়। তাঁর সেই পবিত্র পর্বত, সেই সুন্দর উঁচুস্থানই সারা পৃথিবীর আনন্দের আধার। উত্তরপ্রান্তে ওই সিয়োন পর্বত—ওই তো মহান রাজার রাজপুর। তার দুর্গশ্রেণির মাঝে পরমেশ্বর যেন দুর্গরূপেই দর্শন দিলেন', যখন সেকালের মানুষ এ সামসঙ্গীতের বাণী গাইত, তখন তারা মণ্ডলীর ও স্বর্গীয় মাতৃভূমির কথা বুঝত।

১:১৮ (ক) 'মোশি জাগতিক বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর': একথা পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত নয়, কিন্তু প্রেরিত ৭:২২ পদে স্তেফানও একই কথা বলেন; তাতে অনুমান করা যেতে পারে, বিষয়টা নতুন নিয়মকালে প্রচলিত ছিল; বাস্তবিকই, সাধু গ্রেগরি এসমস্ত বিষয়ে যাঁদের উপর নির্ভর করতেন, সেই ফিলোন ও অরিগেনেস উভয়ই একই কথা বলেছিলেন।

(খ) যাত্রা ২:১১-১৫ দ্রঃ।

১:২৫ (ক) প্রজ্ঞা ১৯:১৮ দ্রঃ।

১:৩০ (ক) 'মেঘটা … আলো দান করছিল': লোহিত সাগর-পারে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা হল খ্রিষ্টীয় পাস্কার বাপ্তিস্ম-শোভাযাত্রারই প্রতীক (পাস্কা শব্দের অর্থই তো পার হওয়া): এবার ইস্রায়েলীয়েরা নয়, নব-বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরাই ঐশ্বরিক আলোতে আলোকিত; বাস্তবিকই সেকালে নব-বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের 'সদ্য-আলোপ্রাপ্ত' বলে অভিহিত করা হত (যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা দ্রঃ)।

১:৪৬ (ক) ‘ঘোর তমসা’ (γνόφος - গ্নোফোস): যাত্রা ২০:২১ থেকে নেওয়া এ শব্দ সাধারণত বাইবেলে ভয়ঙ্কর ও তিরস্কারমূলক অর্থ বহন করে (এস্থার ১:১; যোয়েল ২:২; মিখা ৩:৬; জেফা ১:১৫ দ্রঃ)। কিন্তু সাধু গ্রেগরি শব্দটা ইতিবাচক অর্থে ব্যবহার করে সেই রহস্য ও সীমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন যা মানুষের কাছে পূর্ণ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করার পথ রোধ করে। অন্যদিকে তিনি ‘অন্ধকার’ (σκότος - স্কোতোস) শব্দটা সবসময় নেতিবাচক অর্থে অর্থাৎ আলোর বা পুণ্যের বিপরীত ও বিরোধী অর্থে অর্থাৎ পাপ, অজ্ঞতা ও ঈশ্বরবিহীনতা অর্থে ব্যবহার করেন। এই অনুসারে ইস্রায়েলীয়েরা আলোতে বিরাজ করত কিন্তু অন্ধকার মিশরকে আচ্ছাদিত করত।

(খ) ‘পুন্যালয়’ (ἄδυτον - আদুতোন): শব্দটা যেরুশালেমের মন্দিরের সেই অভ্যন্তরীণ স্থান নির্দেশ করে যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করতেন ও যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অপ্রবেশ্য ছিল, এমনকি, সময় সময় গ্রীক ‘আদুতোন’ শব্দটা ‘পুন্যালয়’ অর্থ বাদে ‘অভ্যন্তরীণ স্থান’ অর্থেও ব্যবহৃত। সেই অনুসারে সাধু গ্রেগরি বলতে চান, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন এমন রহস্যময় ব্যাপার যা কেবল আমাদের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করা যেতে পারে। সাধু গ্রেগরি ধারণাটা অন্যত্রও ব্যবহার করেন যেমন, ‘ঐশজ্ঞানের অদৃশ্য পুণ্যালয়’ (১৬৭ দ্রঃ); ‘স্বর্গীয় পুণ্যালয়’ (১৭৮ দ্রঃ); এবং ‘সত্য [অর্থাৎ ঈশ্বর] রহস্য-তাঁবুর সবচেয়ে অভ্যন্তরীণ ও গুপ্ত স্থানগুলোতে স্থিত’ (১৮৮ দ্রঃ) বাক্যটা ঈশ্বরের অপ্রবেশ্য বাস্তবতা নির্দেশ করে। সাধু গ্রেগরির কাছে বিষয়টা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই সেই পুণ্যালয়ে বা অপ্রবেশ্য অভ্যন্তরীণ স্থানে প্রবেশ করা, অর্থাৎ, অসীম ও দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরে প্রবেশ করা, বা সহজ ভাষায়, ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করা কেমন সম্ভব হতে পারে, এবিষয়ে সাধু গ্রেগরি পুস্তকের পরবর্তী অংশে যথেষ্ট কথা বলবেন, এবং মানুষের সীমাবদ্ধতা কতটুকু ঈশ্বরের অসীমতা উপলব্ধি করতে পারে সেবিষয়েও তিনি নির্দেশনা দেবেন (২৩৪ ইত্যাদি দ্রঃ]।

১:৪৭ (ক) ‘ধর্মভক্তি’ (εὐσέβεια - এউসেবেইয়া): এ শব্দও সাধু গ্রেগরির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যথার্থ বিশ্বাস ক্ষেত্রে ও সেই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত নীতিগত আচার-ব্যবহার ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্দেশ করে (২য় পুস্তক ১৩; ১৫; ১৬২; ১৬৬; ২৭৩ দ্রঃ)।

১:৫৬ (ক) ‘রহস্যাবৃত’ (μυστικός - মিস্তিকোস): সাধু গ্রেগরি এই শব্দ ও সদৃশ শব্দগুলো যেমন μυσταγωγία (মিস্তাগোগিয়া) এমন ক্ষেত্রে ও অর্থে ব্যবহার করেন যা মনবীয় নয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক বিষয়গুলো লক্ষ করে, যেমন, ঈশ্বরের রহস্যাবৃত দীক্ষাদান বা শিক্ষাদান ও মানুষের ঐশ্বরিক রহস্যাবৃত দীক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাগ্রহণ; তাছাড়া বাপ্তিস্মও ‘রহস্যাবৃত বাপ্তিস্ম’ বলে উল্লিখিত (১২৭ দ্রঃ), কারণ তা সেই ‘রহস্যের’ সঙ্গে সম্পর্কিত যা আমরা আজকালে ‘সাক্রামেন্ত’ শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করি কিন্তু যা নূতন নিয়মে ‘রহস্য’ বলে উল্লিখিত। এবিষয়ে ২য় পুস্তক ১৬ পদের টীকাও দ্রষ্টব্য।

১:৫৭ (ক) ‘দান’ (χάρις - খারিস): শব্দটা নতুন নিয়মে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা তাঁর অনুগ্রহদান নির্দেশ করে; সাধু গ্রেগরি এখানে ও ৫৯-তে ‘দান’ শব্দের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের

দেওয়া ‘বিধান’ নির্দেশ করেন, কারণ বিধানে নিহিত নৈতিক নির্দেশাবলি মানুষের কাছে সত্যিই ঈশ্বরের এক অপূর্ব দান।

১:৬৩ (ক) ‘বাসনা’ (ἐπιθυμία - এপিথুমিয়া) : সাধু গ্রেগরির সময়, দার্শনিক ভাষায়, এ শব্দ ‘যুক্তিবিরুদ্ধ বাসনা’ বোঝাত; সুতরাং শব্দটা সবসময় নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত ছিল। অন্যদিকে সাধু গ্রেগরি শব্দটা ‘মধ্যবর্তী অর্থবহ শব্দ’ বলে গণ্য করেন: অর্থাৎ বাসনাটা মঙ্গল বা অমঙ্গল লক্ষ্যের প্রতি প্রবণতা বলে পরিগণিত, এর ফলে তিনি কথা প্রসঙ্গে শব্দটা ইতিবাচক ও নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করেন; নেতিবাচক অর্থে: ১ম পুস্তক ৬৩, ৬৭; ২য় পুস্তক ১২৫, ২৭১, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ৩১৬; এবং ইতিবাচক অর্থে: ২য় পুস্তক ৯০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৮, ২৩৯ দ্রঃ।

১:৭৩ (ক) বালায়াম যে এমন বিশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী ছিল যা দ্বারা সে পাখি-ওড়ার কায়দা পরীক্ষা করত, এবং সে যে কয়েকটা অপদূতের সাহায্যে জাদুবিদ্যা অনুশীলন করত, একথা গণনা পুস্তকে উল্লিখিত নয়; সাধু গ্রেগরি সেকালে প্রচলিত ব্যাখ্যামূলক লেখা উপস্থাপন করেন।

১:৭৬ (ক) মোশির ‘প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা’ ও ‘সৌন্দর্যের অপরিবর্তনশীলতা’: যেকোন সৃষ্টজীব পরিবর্তনশীলতা দ্বারা চিহ্নিত; কিন্তু এখানে সাধু গ্রেগরি মোশির ‘সৌন্দর্যের অপরিবর্তনশীলতাও’ উল্লেখ করেন; তবে এর অর্থ এ নয় যে, সৌন্দর্য (অর্থাৎ মঙ্গল) ক্ষেত্রে মোশি মানুষ হিসাবে অপরিবর্তনশীলতা অর্জন করেছিলেন, বরং অর্থটা হল, পাপ ও অমঙ্গলের আকর্ষণ একেবারে বশীভূত করে মোশি নিষ্ঠার সঙ্গে মঙ্গল আঁকড়িয়ে ধরছিলেন, কেননা মঙ্গল সাধন ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণ অগ্রগতিকেও স্থান দেয়; বাস্তবিকই ইতিমধ্যে সাধু গ্রেগরি এবিষয়ে বলেছেন যে, মঙ্গল অভিমুখে প্রাণের অগ্রগতি সীমাহীন ও তাই বলে গতিশীল ও ফলত পরিবর্তনশীল। এক কথায়, মোশি ‘সৌন্দর্যে অপরিবর্তনশীল’ অর্থাৎ মঙ্গল সাধনায় নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্তু সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনে ছিলেন ‘পরিবর্তনশীল’ যেহেতু সেজীবনে সবসময় অগ্রসর ছিলেন।

১:৭৭ (ক) বাইবেলের ঘটনাবলির আক্ষরিক ব্যাখ্যা জ্ঞানদায়ী হতে পারে, কিন্তু তা যে চরিত্র গঠনে সবসময় উপকারী তা নাও হতে পারে। অন্যদিকে সেই ঘটনাবলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সবসময়ই ‘সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের জন্য উপকারী অবদান’ রাখে। এক কথায়, সাধু গ্রেগরি এটা সমর্থন করেন যে, বাইবেলের ব্যাখ্যা তখনই যথার্থ যখন সেই ব্যাখ্যা মানুষের জীবনে উপকারিতা আনে।

টীকা - ২য় পুস্তক

২:১ (ক) προαίρεσις (প্রয়াইরেসিস - স্বাধীন বেছে নেওয়াটা) : সাধু গ্রেগরি প্রায়ই গ্রীক তত্ত্ববিদ্যার এ শব্দ ব্যবহার করেন যা অনুসারে মানুষ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রাখে। তাঁর কাছে ধারণাটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেটা অনুসারে মানুষ আদমের পাপের পরেও স্বাধীন

ভাবেই মঙ্গল বা অমঙ্গল বেছে নিতে পারে; এমনকি, এ স্বাধীন বেছে নেওয়াটা মানুষকে ঈশ্বরের সদৃশ করে তোলে। সুতরাং অগ্রগতিশীল সাধনা সংক্রান্ত এ লেখায় ধারণাটা বিশেষ স্থান অধিকার করে, কেননা এধারণা অনুসারে মানুষের পরিত্রাণ ঐশঅনুগ্রহের সঙ্গে তার নিজের স্বাধীন বেছে নেওয়াটার সহযোগিতার উপর নির্ভর করে (২য় পুস্তক ৪৪ দ্রঃ); তাছাড়া সাধু গ্রেগরি এটাও সমর্থন করেন যে, মানুষ যখন স্বাধীন ভাবে মঙ্গল বেছে নেয় তখন দিয়াবলও তার এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না (২য় পুস্তক ৪ দ্রঃ, যেখানে স্বৈরশাসক বলতে দিয়াবল বোঝায়)। এতে সাধু গ্রেগরি সেকালের পৌত্তলিকদের সাধারণ ধারণা প্রতিরোধ করেন যা অনুসারে মানুষ দৈবের বা কপালের শিকার মাত্র; আসলে তাঁর মতে দৈব বা কপাল বলতে কিছুই নেই; যা বাস্তব তা হল মানুষের সেই স্বাধীন বেছে নেওয়ার অধিকার যা ঈশ্বর নিজে মানুষকে দিয়েছেন: মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে মানুষ যা বেছে নেবে, ঈশ্বর তা মেনে নেবেন (এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবরণ দ্রঃ)।

তাই, এই একই পদে যারা এমনটা সমর্থন করে যে, মঙ্গল-অনুকরণটা কঠিন হওয়ায় তা 'আমাদের উপর আদৌ নির্ভর করে না', তাদের প্রতি সাধু গ্রেগরির উত্তর হল, 'অনুকরণটা শুরু করা আদৌ কঠিন নয়', অর্থাৎ, সেই কঠিন অনুকরণটা তোমার নিজের স্বাধীন বেছে নেওয়ার উপর নির্ভর করে।

২:২ (ক) সবকিছু 'পরিবর্তনের অধীন': প্লেটোর তত্ত্ববিদ্যা সেসময় এবিষয়ে যথেষ্ট নেতিবাচক ধারণা সমর্থন করত কারণ জগতের পরিবর্তনশীলতা স্বর্গীয় অপরিবর্তনশীলতার বিপরীত। কিন্তু স্তোয়া মতবাদের সঙ্গে সাধু গ্রেগরি মূলত প্লেটোপন্থী হয়েও তবু এক্ষেত্রে ইতিবাচক ধারণা সমর্থন করেন যা অনুসারে স্বর্গীয় অপরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও মানুষের পরিবর্তনশীলতা অমঙ্গলে সীমাবদ্ধ নয় বরং মঙ্গলকেও বেছে নেবার স্বাধীনতা রাখে। ঠিক এখানেই রয়েছে মানুষের ও পশুদের মধ্যকার পার্থক্য, যেহেতু পশুরা তেমন স্বাধীনতার অধিকারী নয়।

(খ) 'সেই স্ত্রীলিঙ্গাত্মক ভাগ': যা পুংলিঙ্গাত্মক তা যে ইতিবাচক কিন্তু যা স্ত্রীলিঙ্গাত্মক তা যে নেতিবাচক, তা প্রাচীনকালের সাধারণ ধারণা; কারণ সেই প্রাচীনকালে নারী ছিল দুর্বলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক, এর ফলে সে ছিল অবজ্ঞার পাত্র।

(গ) 'সেই স্বৈরশাসক': খ্রিষ্টীয় জগতে ফারাও সবসময় দিয়াবলের প্রতীক বলে বিবেচিত ছিল, তাই সাধু গ্রেগরিও ফারাওকে সেই দিয়াবলের প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করেন যে মোশির বিরোধী ছিল ও তাদের সকলেরও বিরোধী যারা সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনে পদার্পণ করে (২য় পুস্তক ২৬৪, ২৭৮, ২৯১, ২৯৭ দ্রঃ); দিয়াবল ছাড়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগগুলোও মানুষের স্বৈরশাসক বলে উপস্থাপিত (২য় পুস্তক ৫৯-৬১ দ্রঃ)।

২:৫ (ক) 'গুপ্ত অর্থ': প্রকৃতপক্ষে 'ঝাপসা' অর্থ: 'ঝাপসা' শব্দটা সাধু পলের ভাষা থেকে আগত (১ করি ১৩:১২): সাধু গ্রেগরি ও সেকালের ব্যাখ্যাতারা বলতেন, বাইবেলের বর্ণনা এমন আবরণ যা সেটার অর্থ আবিষ্কার করার জন্য খুলে দেওয়া দরকার, তবেই বর্ণনার 'ঝাপসা' অর্থের নিচে সেটার আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকাশ পায়। অনুবাদে 'ঝাপসা' প্রকৃত শব্দের

পরিবর্তে প্রায়ই 'গুপ্ত অর্থ', 'আবৃত অর্থ', 'প্রহেলিকা', 'প্রতীক' ইত্যাদি সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত।

২:৬ (ক) 'জলস্রোত': জল ও সমুদ্রের অর্থাৎ জগতেরই বিপজ্জনক ভূমিকা বাইবেলেও উল্লিখিত। তেমন বিপদগুলো ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে নির্দেশিত। একদিকে ভাবাবেগ নিজে থেকে খারাপ নয়, অন্যদিকে আদমের পাপের ফলে ভাবাবেগ মানুষের মধ্যে সহজাত অনিষ্টকর ভূমিকা অর্জন করেছে বিধায় মানুষকে পাপের দিকে আকর্ষণ করে ও তাই করে সদ্‌গুণ প্রতিরোধ করে (১২৯-৩০১ দ্রঃ)।

২:১১ (ক) θεογνωσία (থেওগ্নসিয়া - ঈশ্বরজ্ঞান): সাধু গ্রেগরির লেখায় 'ঈশ্বরজ্ঞান' শব্দটা খুবই ব্যবহৃত; তা এমন গভীরতম জ্ঞান যা মানুষকে ঈশ্বর-রহস্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করে (১৫২ ও ১৬৭ দ্রঃ)।

২:১৬ (ক) μυστήριον (মিস্তেরিওন - রহস্য): শব্দটা বিশেষভাবে সাধু পলের মাধ্যমেই খ্রিষ্টধর্মে প্রাধান্য পেয়েছে; সেই অনুসারে সাধু গ্রেগরিও শব্দটা নানা অর্থে ব্যবহার করেন: যেমন, ১) সাক্রামেন্তীয় অর্থ (২৬৯ দ্রঃ); ২) পবিত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যামূলক আধ্যাত্মিক অর্থ (১৪৮ দ্রঃ); ৩) জগৎ-নিয়ন্ত্রণে ঐশব্যবস্থার রহস্যময় অর্থ (১১৫, ১৩৩ দ্রঃ); ৪) অধ্যাত্ম জীবনের রহস্য সংক্রান্ত অর্থ (১৭৮ দ্রঃ)। কিন্তু এ পদে 'মহত্তর ও গভীরতর রহস্যাদি জানা' বলতে বিশ্বাসের অতলান্ত অর্থ অনুসন্ধান করা বোঝায়, সেই মোশির দৃষ্টান্ত অনুকরণে যিনি নির্জনতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, অর্থাৎ আমাদের পক্ষেও ঐশতাত্ত্বিক তর্কযুক্তির চাঞ্চল্য থেকে সরে গিয়ে নির্জনতায়ই আশ্রয় নিয়ে অনুসন্ধান করা দরকার। গ্রেগরির অন্যান্য লেখা অনুসারে সাধু বাসিল ও বিস্ময়কর কর্মের সাধক সাধু গ্রেগরিই বিশেষভাবে মোশির নির্জনতার দৃষ্টান্ত পালন করেছিলেন। এখানে নির্জনতা বলতে অনিষ্টের প্রতীক সেই জগৎ-প্রত্যাহার বোঝায়।

২:১৯ (ক) 'প্রাণের চক্ষু': সাধু গ্রেগরি এমন ধারণা পালন করেন যা অনুসারে প্রতিটা দৈহিক কর্মের পাশাপাশি একটা অভ্যন্তরীণ কর্ম রয়েছে ও প্রতিটা দৈহিক ইন্দ্রিয়ের পাশাপাশি একটা অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় রয়েছে ; তাই প্রাণের চক্ষুর কথা ছাড়া তিনি অন্যত্র 'হৃদয়ের শ্রবণশক্তি'-ও উল্লেখ করেন (১৬৯ দ্রঃ)। সাধু গ্রেগরি ধারণাটা অরিগেনেসের লেখাগুলো থেকে পেয়েছিলেন।

(খ) φωταγωγία (ফোতাগোগিয়া - আলোকীকরণ): শব্দটা মরমী পরিভাষায় প্রচলিত শব্দ যা সাধু গ্রেগরি ব্যবহার করেন যেহেতু মোশির সেই দর্শনলাভ জ্বলন্ত ঝোপের কারণে আলোময় হয়েছিল। সাধু গ্রেগরির আগে জ্বলন্ত ঝোপের সেই দর্শন 'ঐশ্বরিক লোগোস' খ্রিষ্টকেই (অর্থাৎ ঐশবাণী খ্রিষ্টকেই) লক্ষ করছিল, কেননা সেকালের ব্যাখ্যাতাদের বিবেচনায় 'ঐশ্বরিক লোগোস' সেই খ্রিষ্টই পুরাতন নিয়মের সমস্ত ঐশদর্শনে দেখা দিতেন যেহেতু তিনিই অতীন্দ্রিয় পিতা ও জড় জগতের মধ্যকার মধ্যস্থ। কিন্তু সাধু গ্রেগরি মাংসধারণ-রহস্যের উপর জোর দিয়ে দর্শনটা অনন্তকালীন ঐশবাণী খ্রিষ্টকে নয়, মাংস-হওয়া-বাণী খ্রিষ্টকেই আরোপ করেন (১৭৪ ও ২১৬ দ্রঃ), এবং সেই ধারায় তিনি এমন

ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে ব্যাখ্যা অনুসারে, যে জ্বলন্ত ঝোপ পুড়ে যাচ্ছিল না কিন্তু অক্ষত অবস্থায় থেকে যাচ্ছিল, তা হল ধন্যা মারীয়ার কুমারীত্বের প্রতীক যিনি যিশুকে প্রসব করলেও তাঁর কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন হয়ে থেকেছিল (২য় পুস্তক ২১ দ্রঃ)।

২:২০ (ক) যোহন ১৪:৬; ৮:১২ দ্রঃ।

২:২২ (ক) আদি ৩:২১ দ্রঃ।

২:২৩ (ক) 'যা বাস্তবে আছে': সাধু গ্রেগরির যুক্তি সেই উক্তিতেই ভিত্তি করে যা স্বয়ং ঈশ্বর জ্বলন্ত ঝোপের দর্শনদানে নিজের বিষয়ে উচ্চারণ করেছিলেন তথা, 'আমি সেই আছি যিনি আছেন' (যাত্রা ৩:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)। সেই অনুসারে সাধু গ্রেগরি এখানে ঈশ্বরের সেই স্থিতিশীলতার উপরে জোর দেন যা মানুষের অস্থিতিশীলতা অর্জন করতে আকাঙ্ক্ষা করে, কেননা, তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে, এক্ষেত্রে, সত্ত্ব ও সত্য এক; পরম সত্ত্ব ও পরম মঙ্গলও এক।

২:২৪ (ক) θεοφανεία (থেওফানেইয়া - ঐশদর্শন): পুরাতন নিয়মের পিতৃকুলপতিদের কাছে ও মোশির কাছে ঈশ্বরের দর্শনদান ঠিক এ 'থেওফানেইয়া' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত।

২:২৫ (ক) μετουσία (মেতুসিয়া - অংশী হওয়া বা অংশভাগিতা): খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব প্লেটোর এ ধারণাকে অন্য অর্থ অনুসারে ব্যাখ্যা করত, কেননা প্লেটো এমনটা ধরে নিতেন, মানুষ স্বরূপেই ঈশ্বরের অংশী, কিন্তু খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব অনুসারে মানুষ স্বরূপে নয় কিন্তু কেবল ঐশঅনুগ্রহের গুণেই ঈশ্বরের অংশভাগিতা লাভ করে। সেই অনুসারে, সাধু গ্রেগরির ধারণায়, ঈশ্বরের অংশী হওয়া বলতে ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে ওঠা বোঝায়; এমনকি, ঈশ্বর দ্বারা তাঁর বন্ধু বলে পরিচিতি লাভ করাই হল সিদ্ধতা অভিমুখে যাত্রার শীর্ষস্থান (৩২০ দ্রঃ)। লক্ষণীয় বিষয়: এই লেখায় 'অংশভাগিতা' শব্দ ও নূতন নিয়মের κοινωνία (কোইনোনিয়া) 'সহভাতিগা' শব্দ আলাদা, গুরুত্বও আলাদা, অর্থও আলাদা (প্রেরিত ২:৪২; রো ১৫:২৬; ১ করি ১:৯; ১০:১৬; ২ করি ৬:১৪; ১৩:১৩; গা ২:৯; ফিলি ২:১; ৩:১০; ১ তি ৬:১৮; ফিলেমন ৬; ১ যোহন ১:৩, ৬, ১৭); এমনকি, বাইবেলে মেতুসিয়া-অংশভাগিতা শব্দ কোথাও উল্লিখিত নয়, এবং এলেখায় কোইনোনিয়া-সহভাগিতা শব্দ কোথাও উল্লিখিত নয়।

২:২৬ (ক) যোহন ১:৯ দ্রঃ। ἀλήθεια (আলেথেইয়া - সত্য): সাধু গ্রেগরির আগে, অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মের প্রথম শতাব্দীগুলোতে, যাত্রাপুস্তকে বর্ণিত ঐশদর্শনে (যাত্রা ৩:১ ইত্যাদি পদ, সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ) সেই 'আমি সেই আছি যিনি আছেন' বাক্যটা কেবল পিতা ঈশ্বরকে আরোপ করা হত; কিন্তু সাধু গ্রেগরি এমনটা সমর্থন করেন, লোগোস-বাণীও সেই 'আমি আছি' এর অংশী: বাস্তবিকই এই পদে, সুসমাচারের সাক্ষ্যবাণী অনুসারে তিনি সত্যকার আলো ও সত্য বলে চিহ্নিত (যোহন ১৪:৬; ১:৯ দ্রঃ); এর ফলে, ঐশ হিপোস্তাসিস দু'টোর মধ্যকার পূর্ণ সমতার গুণে, লোগোস-বাণীও পিতার মত পরম সত্ত্ব ('হিপোস্তাসিস' ধারণা ক্ষেত্রে সাধু বাসিলের 'পবিত্র আত্মা প্রসঙ্গ' দ্রঃ)।

(খ) 'পরিত্রাণ': সাধু গ্রেগরির মতে, সিদ্ধতাপ্রাপ্ত খ্রিষ্টপন্থী আপন ভাইবোনদের পরিত্রাণের দিকে অর্থাৎ মঙ্গল-যাত্রায় অগ্রসর হবার জন্য সাহায্য করতে আহূত। এক্ষেত্রে আদর্শ বলে সেই মোশি উপস্থাপিত যিনি ঈশ্বর ও জনগণের মধ্যে মধ্যস্থ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

(গ) যাত্রা ৪:৭ দ্রঃ।

২:২৮ (ক) সাম ৭৭:১১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

২:২৯ (ক) যোহন ১:১৮ দ্রঃ।

২:৩০ (ক) ἀπάθεια (আপাথেইয়া - ভাবাবেগহীনতা): শব্দটা সেকালের দার্শনিকদের ব্যবহৃত একটা শব্দ বিশেষ যা মানবীয় সমস্ত ভাবাবেগ বশীভূত করা বোঝাত। সেকালের খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণও ধারণাটা সেই অর্থে ব্যবহার করতেন। কিন্তু এই পদ এমনটা দেখায়, সাধু গ্রেগরি ভাবাবেগহীনতা বলতে ঐশজীবনে সেই অংশভাগিতা বোঝান যা ভাবাবেগের উপরে সদ্‌গুণের বিজয়ের ফলে অর্জিত; কেননা পতনের কারণে আদম যে উন্নত জীবন হারিয়ে ফেলেছিলেন, সদ্‌গুণের সেই বিজয়ই সেই জীবনকে ফিরিয়ে এনেছে। সুতরাং, সাধু গ্রেগরির মতে, 'ভাবাবেগহীনতা' হল সিদ্ধ জীবনের নামান্তর, এবং মোশিই ভাবাবেগহীনতার আদর্শ।

২:৩১ (ক) 'সেই সাপের রূপান্তর': সেই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হয়: তেমন রূপান্তর খ্রিষ্টের মাংসধারণের প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করা কঠিন ব্যাপার, কেননা সাপ সাধারণত সেই দিয়াবলেরই প্রতীক বলে পরিগণিত হয়েছিল যে সাপের আকারে আদম ও হবাকে ভুলিয়েছিল (আদি ৩:১ দ্রঃ)। কিন্তু এব্যাপারে সাধু গ্রেগরির অভিমত এ: যেহেতু খ্রিষ্ট নিজেই মোশির দ্বারা উত্তোলিত সেই ব্রঞ্জের সাপের সঙ্গে (গণনা ২১:৯ দ্রঃ) নিজের তুলনা করেছিলেন (যোহন ৩:১৬ দ্রঃ), সেজন্য সাপ ও খ্রিষ্টের মধ্যকার প্রতীকমূলক তুলনা গ্রহণযোগ্য; তাছাড়া সাধু গ্রেগরি খ্রিষ্টকে পাপ-সাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেন কারণ প্রেরিতদূত পল বলেছিলেন, ঈশ্বর খ্রিষ্টকে পাপ করে তুলেছিলেন (২ করি ৫:২১ দ্রঃ)।

(খ) যোহন ৩:১৪।

২:৩২ (ক) ২ করি ৫:১২ দ্রঃ।

২:৩৪ (ক) হিব্রু ১১:১।

২:৩৫ (ক) আদি ৫:২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

২:৩৭ (ক) যাত্রা ৪:১ দ্রঃ।

২:৪৫ (ক) 'পিতৃগণ থেকে আগত একটা বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরা': এক একটা মানুষের রক্ষার জন্য ঈশ্বর যে একটা দূত নিযুক্ত করেন, তা বাইবেলে প্রমাণিত (তোবিত ৫:৪; মথি ১৮:১০;

প্রেরিত ১২:১৫ দ্রঃ); কিন্তু অমঙ্গলকারী আর এক দূত যে নিযুক্ত, তা বাইবেলে প্রমাণিত নয়; কিন্তু তবু ব্যাপারটা পিতৃগণের লেখায় উল্লিখিত (বার্নাবাসের পত্র ও পালক দ্রঃ)।

২:৫৩ (ক) ২ করি ১২:৭.

(খ) প্রবচন ১৭:১৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য.

(গ) যেরে ৯:৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য.

২:৬২ (ক) মথি ৩:১২; ১ করি ৩:১২-১৩ দ্রঃ।

২:৬৩ (ক) এফে ৬:১১ দ্রঃ।

২:৭৩ (ক) রো ১:১৮ দ্রঃ।

২:৭৫ (ক) রো ১:২৬ দ্রঃ।

২:৭৯ (ক) রো ৬:২১।

২:৮২ (ক) 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা': পুনঃপ্রতিষ্ঠা-ধারণাটা এমনটা সমর্থন করত, সকল পাপী মানুষ জাহান্নামের দণ্ড নির্দিষ্ট কাল ধরে ভোগ করার পর স্বর্গরাজ্যের অনন্ত সুখে গৃহীত হবে। সাধু গ্রেগরি কতটুকু এধারণা সমর্থন করেন তা বলা যায় না; বাস্তবিকই তিনি এবিষয়ে বলেন, 'হয় তো'। যাই হোক, পুনঃপ্রতিষ্ঠা-ধারণাটা সাধু গ্রেগরির মৃত্যুর পরে, ৫৫৩ সালে, কনস্তান্তিনোপলিস-মহাসভায় অস্বীকৃত হয়।

(খ) মথি ৮:১১ ইত্যাদি দ্রঃ।

২:৮৩ (ক) যাত্রা ৫:৮; মথি ১৩:৪২ দ্রঃ।

২:৮৬ (ক) রো ২:৫-৬।

২:৯১ (ক) এজে ১৮:২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ।

২:৯৩ (ক) মথি ৫:২২, ২৭ দ্রঃ।

২:৯৫ (ক) 'মেষশাবক': স্বয়ং খ্রিষ্টই যে হিব্রুদের পাস্কা-মেষশাবক, তা যোহনের সুসমাচারে ঘোষিত (যোহন ১:২৯; ১৯:৩৩, ইত্যাদি পদ দ্রঃ)। হিব্রুদের ঘরের প্রবেশদ্বারের কপালি ও দুই বাজু যে মেষশাবকের রক্তে চিহ্নিত, তা হল সেই পরিত্রাণের পূর্বচিহ্ন যা খ্রিষ্টের বলিদান থেকে আমাদের কাছে প্রদত্ত। প্রকৃতপক্ষে, খ্রিষ্টীয় সাক্রামেন্তীয় ঐতিহ্য অনুসারে, যে রক্ত প্রবেশদ্বারের কপালিতে ও দুই বাজুতে লেপন করা হত, তা হল বাপ্তিস্মের তৈলাভিষেকের প্রতীক।

‘বিধান’: এখানে বিধান বলতে কেবল মোশির দেওয়া পাস্কা-পালনের রীতি নয়, কিন্তু খ্রিষ্টীয় বিধানের সেই নির্দেশসমূহও বোঝায় যা খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত যারা তারা তা পালন করতে আহূত।

২:১০৭ (ক) আদি ৩:১৮ দ্রঃ।

২:১১০ (ক) ১ করি ২:১০।

২:১১১ (ক) সিরা ৩:২২।

২:১২১ (ক) ‘জল-রহস্য’: লোহিত সাগর পার ঘটনাটা যে খ্রিষ্টীয় বাপ্তিস্মের একটা পূর্বচিহ্ন, তা সাধু পল থেকে আসে (১ করি ১০:২ ইত্যাদি পদ)। সেকালের অন্যান্য লেখকগণও বিষয়টা উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা অনুসারে বাপ্তিস্ম-জলকুণ্ডে নিমজ্জনের অর্থ হল নবজন্ম লাভ করার জন্য মৃত্যুরাজ্যে প্রবেশ, অর্থাৎ খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা ও পুনরুত্থান করা, যেইভাবে ইস্রায়েলীয়েরা সমুদ্রে নেমেছিল ও তা থেকে বেরিয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, যে মিশরীয়েরা নিমজ্জিত হয়ে মারা যায়, সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা অনুসারে তারা হল সেই উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের প্রতীক যা থেকে বাপ্তিস্ম আমাদের মুক্ত করে দেয়।

২:১২৪ (ক) ‘লাঠি’ ও ‘মেঘ’: সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা অনুসারে, যে লাঠি দ্বারা মোশি সাগরের জলরাশি দু’ভাগ করেন, সেই লাঠি হল ক্রুশকাষ্ঠের প্রতীক ও বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের বিশ্বাসেরও প্রতীক, এবং মেঘটা হল পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের প্রতীক, কেননা প্রার্থীর বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ হল বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানরীতির আবশ্যকীয় উপাদান দু’টো স্বরূপ। কিন্তু, এ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার পর পরেই তিনি প্রার্থীর আবশ্যকীয় মনোভাব ও অভিপ্রায়ের উপরেই জোর দেন, কেননা তেমন মনোভাব ও অভিপ্রায় থাকলেই বাপ্তিস্ম সত্যিকারে কার্যকর হয়।

২:১২৬ (ক) ‘খামিরবিহীন রুটি’ যে নতুন জীবনধারণের প্রতীক, তা সাধু পলই বলেছিলেন (১ করি ৫:৭ ইত্যাদি পদ দ্রঃ), এবং বাপ্তিস্মও যে একেবারে নবীকৃতই জীবনধারণের প্রতীক, এ প্রতীক দু’টোর মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এতে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, নবজীবন দানকারী বাপ্তিস্ম সেকালে পাস্কা রাতে অর্থাৎ পুনরুত্থান-রাতেই সম্পাদিত ছিল, ফলে সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা যিশুর সঙ্গে পুনরুত্থান ও নবজীবনের অভিজ্ঞতা করছিল।

(খ) ১ করি ৫:৭-৮ দ্রঃ।

২:১৩০ (ক) হিব্রু ১৩:১৭ দ্রঃ।

(খ) ‘যাজকত্ব’: প্রথম শতাব্দীগুলোতে যাজকত্ব শব্দটা তত প্রচলিত ছিল না; সেটার বদলে বাইবেলের ভাষা থেকে আগত ‘প্রবীণ’ শব্দটা (২ যোহন ১-২; ১ পিতর ৫:১, ৫; যাকোব ৫:১৪; তীত ১:৫; ১ তি ৪:১৪; ৫:১৭, ১৯; ইত্যাদি) ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু যখন, ৩১৩ সালে, রোম-সম্রাট কনস্তান্তিনুস খ্রিষ্টধর্ম-পালন উন্মুক্ত করে দেন, তখন থেকেই ‘যাজকত্ব’ শব্দটা প্রচলিত হতে লাগল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে যাজকত্ব সাধারণ বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের দেহ

থেকে কেমন যেন উচ্চতর দেহ হয়ে উঠল। কিন্তু যাজকত্বের এ গুরুত্ব ভিত্তি করে সাধু গ্রেগরি এ উচ্চতর শ্রেণির স্পষ্ট ত্রুটিও সমালোচনা করেন (১১৮, ২৭৯, ২৮৬ দ্রঃ)।

২:১৩৩ (ক) যারা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের মাধুর্যের অংশী হয়েছে, তারা সুসমাচার-শিক্ষার শিষ্য হয়ে ওঠে; কিন্তু সুসমাচার-শিক্ষার শিষ্য হওয়া বলতে শুধু কয়েক জনেরই জন্য নির্দিষ্ট একটা আধ্যাত্মিক পর্যায় নয়, বরং এমন পর্যায় যা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত সবারই কাছে দাবীকৃত; স্বল্প কথায়: খ্রিষ্টের শিষ্য হওয়া বলতে সুসমাচারের শিক্ষা আমাদের বাস্তব জীবনে উপযোগী করা বোঝায়।

২:১৩৪ (ক) সাম ৬৮:২৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

২:১৩৬ (ক) ১ করি ১০:৪।

(খ) যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ।

২:১৩৭ (ক) 'উর্ধ্ব থেকে আসা খাদ্য': যোহনের সুসমাচারে মান্নার প্রতীকচিহ্ন এউখারিস্তীয় অর্থ বহন করত (যোহন ৬:৪৯ দ্রঃ), এবং খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণও সেই ভাবে তা ব্যাখ্যা করে এসেছিলেন। কিন্তু সাধু গ্রেগরি অরিগেনেসের ব্যাখ্যা অনুসরণ ক'রে সেই মান্না-খাদ্য মাংস-হওয়া-অনন্তকালীন লোগোস-খ্রিষ্ট বলে ব্যাখ্যা করেন।

২:১৩৯ (ক) যোহন ৬:৫১ দ্রঃ।

২:১৪০ (ক) প্রজ্ঞা ১৬:২১ দ্রঃ।

(খ) রো ১৪:২; ১ করি ৩:২; হিব্রু ৫:১২ দ্রঃ।

২:১৪৩ (ক) মার্ক ৯:৪৮; ইশা ৬৬:২৪ দ্রঃ।

২:১৪৪ (ক) যোহন ১৯:৪২ দ্রঃ।

২:১৪৫ (ক) গা ৬:৮।

২:১৪৭ (ক) 'যোশুয়া' এবং 'যিশু': এ নাম দু'টোর মধ্যে পার্থক্য আছে কি? না, কোন পার্থক্য নেই। হিব্রু ভাষায় নামটা হল יהושע (যোশুয়া), কিন্তু যিশুর জন্মের অনেক আগে যখন পুরাতন নিয়ম হিব্রুদের দ্বারা গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়, তখন নামটা Ἰησοῦς (ইয়েসুস) হল যা বাংলা ভাষায় 'যিশু' দাঁড়ায়। সেজন্য যে নাম দু'টো আপাত দৃষ্টিতে আলাদা, প্রকৃতপক্ষে একক নাম, ও সেইজন্য সেকালের ব্যাখ্যাতাগণের কাছে (ফলত সাধু গ্রেগরিও কাছে) পুরাতন নিয়মের যোশুয়া-ইয়েসুস-যিশু হয়ে উঠলেন প্রভু যিশুর পূর্বচিহ্ন। এজন্য এই অনুবাদে 'যোশুয়া-ইয়েসুস-যিশু' 'যিশু [অর্থাৎ যোশুয়া]' বলে উপস্থাপিত।

২:১৪৮ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩৪:৫ দ্রঃ।

(খ) হিব্রু ৮:৫ দ্রঃ।

২:১৪৯ (ক) যুদ্ধের সময় মোশি যে হাত দু'টো উত্তোলিত রাখেন (যাত্রা ১৭:১১ ইত্যাদি দ্রঃ), তা সেকালের খ্রিষ্টিয়ানদের কাছে ছিল খ্রিষ্টের ক্রুশারোপণের পূর্বচিহ্ন: যিনি মোশিকে সাহায্য করেন, সেই মহাযাজক আরোনও খ্রিষ্টের পূর্বচিহ্ন হয়ে ওঠেন, এবং মোশি হয়ে ওঠেন বিধানের প্রতীক, কেননা মোশির উত্তোলিত হাত দু'টো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রভু যিশুর ক্রুশ বোঝায় (১৫০ দ্রঃ)। এবং যে পাথরের উপরে মোশিকে বসানো হয় তাও খ্রিষ্টের প্রতীক কারণ প্রেরিতদূত পলের কথা মত 'শৈলটা সেই খ্রিষ্ট' (১ করি ১০:৪; রো ৯:৩৩)। আসলে সাধু গ্রেগরি বলতে চান, বিধানে ক্রুশের পূর্বচিহ্ন চিনিয়ে দিয়ে খ্রিষ্ট নিজেই বিধানকে আধ্যাত্মিক ভাবে বুঝবার জন্য চাবিকাঠি দিয়েছেন।

২:১৫১ (ক) এখানে 'বিধান' বলতে সমস্ত পুরাতন নিয়ম বোঝায়। সেই অনুসারে, পুরাতন নিয়মে যে যে পদে 'কাঠ' শব্দ উল্লিখিত, সেকালের খ্রিষ্টভক্তগণ সেই সকল পদ ক্রুশের পূর্বচিহ্ন বলে ব্যাখ্যা করতেন।

(খ) মথি ৫:১৮ দ্রঃ।

২:১৫২ (ক) 'হাত ধরে': পবিত্র বাইবেল হাত ধরেই অর্থাৎ স্নেহভরেই সিদ্ধতা অভিমুখে শ্রোতাকে চালনা করে; শ্রোতাও যেন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বাধ্যতা দেখিয়ে নিজেকে চালিত হতে দেয়।

২:১৫৩ (ক) যোহন ৪:১০ দ্রঃ।

(খ) যোহন ৬:৩২ দ্রঃ।

২:১৫৪ (ক) মথি ৬:৪ দ্রঃ।

২:১৫৫ (ক) সেকালের মানুষের কাছে পোশাকের বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেননা মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক পোশাকের বর্ণনা অনুযায়ী হওয়ার কথা ছিল।

২:১৫৭ (ক) ১ করি ২:৯ দ্রঃ।

২:১৫৮ (ক) আরোহণ করতে করতে মোশি পর্বতচূড়ার যত কাছাকাছি এগিয়ে যান তুরির কণ্ঠ যে বেশি তীব্রতম হয়, তা এমনটা বোঝায় যে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ কেমন যেন ধাপে ধাপেই ঘটেছিল: প্রথম ধাপে সেই আত্মপ্রকাশ মোশির বিধান দ্বারা ইঙ্গিত পেয়েছিল, পরবর্তী যত ধাপে তা নবীদের প্রচারকর্মে বৃদ্ধিশীল হতে চলেছিল, ও শেষ ধাপে তা প্রেরিতদূতদের প্রচারকর্মে সিদ্ধিলাভ করেছিল কেননা তাঁদের দ্বারা খ্রিষ্টের বাণী সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এ অগ্রগতিশীল পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল, যেন মানুষ আস্তে আস্তে লোগোস-ঐশবাণীর মনুষ্যত্ব-ধারণ রহস্যের নবীনতা গ্রহণ করে নেবার জন্য তৈরী হয় (১৫৯ দ্রঃ)। কণ্ঠটা যে স্বয়ং পবিত্র আত্মা ও যন্ত্রগুলো যে সেই নবীরা ও সেই প্রেরিতদূতেরা, তাতে দেখানো হয়, সেই ঐশপ্রকাশ-প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে ছিল ঈশ্বরেরই উদ্যোগ ও তাঁর নিজের কাজ।

২:১৫৯ (ক) সাম ১৯:৫।

২:১৬০ (ক) এখানে সাধু গ্রেগরি জনগণ ও ঈশ্বরের মধ্যকার যাজকত্বের মধ্যস্থতা তুলে ধরেন, ও পুনরায় তাদেরই অযোগ্যতা তুলে ধরেন যারা অযোগ্য ও অপ্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও যাজক হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

২:১৬১ (ক) ১ করি ১২:২৯ দ্রঃ।

২:১৬৩ (ক) যোহন ১:১৮।

২:১৬৪ (ক) যাত্রা ২০:২১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সাম ১৮:১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

২:১৬৭ (ক) হিব্রু ৯:১১ দ্রঃ।

২:১৬৮ (ক) সাম ১৯:২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সিরা ৪৬:২৭ দ্রঃ।

২:১৭০ (ক) যাত্রা ২৫:৪০।

২:১৭১ (ক) হিব্রু ৯:৫ দ্রঃ।

(খ) হিব্রু ৯:৫ দ্রঃ।

২:১৭৩ (ক) ১ করি ২:১০ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১৪:২ দ্রঃ।

২:১৭৪ (ক) ১ করি ১:২৪ দ্রঃ।

২:১৭৫ (ক) কল ১:১৭ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১:১৪ দ্রঃ।

২:১৭৭ (ক) কল ২:৯ দ্রঃ।

২:১৭৮ (ক) হিব্রু ১০:২০ দ্রঃ।

(খ) ২ করি ১২:৪ দ্রঃ।

২:১৭৯ (ক) কল ১:১৬।

২:১৮০ (ক) হিব্রু ১:১৪ দ্রঃ।

(খ) যাত্রা ২১:১৮-২০ দ্রঃ।

(গ) ইশা ৬:২; এজে ১০:১ ইত্যাদি দ্রঃ।

২:১৮১ (ক) ইশা ৬:২ দ্রঃ।

(খ) ইশা ১১:২ দ্রঃ।

(গ) প্রকাশ ৪:৫ দ্রঃ।

২:১৮২ (ক) রো ৩:২৫ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ২:১০ দ্রঃ।

(গ) হিব্রু ১৩:১৫; প্রকাশ ৫:৮ দ্রঃ।

২:১৮৪ (ক) ১ করি ১২:১২; কল ১:১৮; এফে ১:২৩ ইত্যাদি দ্রঃ।

(খ) গা ২:৯ দ্রঃ।

(গ) ফিলি ২:১৫ দ্রঃ।

(ঘ) মথি ৫:১৪।

(ঙ) ১ করি ১৫:৫৮।

(চ) ১ তি ৩:১৫।

২:১৮৫ (ক) সাম ১৪১:২ দ্রঃ।

(খ) মার্ক ১:৪ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ১:৪১ দ্রঃ।

(ঘ) প্রেরিত ৮:২৭ দ্রঃ।

২:১৮৬ (ক) সাম ১৪৭:১৪ সত্তনী পাঠ্য দ্রঃ।

২:১৮৭ (ক) রো ৮:৩ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ৯:২৭ দ্রঃ।

২:১৯১ (ক) রো ১২:১ দ্রঃ।

(খ) ১ থে ৪:১৭ দ্রঃ।

(গ) সাম ৩৯:১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২:১৯২ (ক) ১ তি ১:১৯

২:১৯৩ (ক) হিব্রু ১২:১১ দ্রঃ।

২:১৯৪ (ক) ২ করি ১১:৭ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ৯:১৩, ১৪ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ৪:১১; ৯:১৮ দ্রঃ।

২:১৯৮ (ক) ২ করি ৬:৭ দ্রঃ।

২:২০৭ (ক) যাত্রা ৩২:১৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

২:২১৩ (ক) যাত্রা ৩২:২৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

২:২১৫ (ক) ২ করি ৩:৩ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ২:১ দ্রঃ।

(গ) 'মানব স্বরূপ আদিতে ছিল অভঙ্গুর ও অমর': গ্রীকভাষী পিতৃগণের কাছে প্রকৃত মানব স্বরূপ পাপের ফলে পতিত ও বিকৃত এই বর্তমান স্বরূপ ছিল না, বরং ছিল পতনের আগেকার আদমের স্বরূপ।

২:২১৬ (ক) আদি ৩:৪ দ্রঃ।

(খ) লুক ১:৩৫ দ্রঃ।

(গ) 'সেই আঙুল দ্বারা খোদাই করা অক্ষর গুণে অমর হয়ে মানব স্বরূপ পুনরায় অভঙ্গুরতা অর্জন করল': খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তিকর্মের গুণে মানুষ যে অমরতা ফিরে পায়, এমনকি ঈশ্বরের আঙুল দ্বারা পাথরফলকে খোদাই করা বিধানে প্রতীকমূলক ভাবে নির্দেশিত যে অমরতা, সেই অমরতা পতনের আগেকার আদমের দৈহিক অমরতা নয়, কিন্তু তা হল প্রাণেরই আত্মিক অমরতা। উপরন্তু, পবিত্র আত্মা এখানে ঈশ্বরের আঙুল বলে উপস্থাপিত: প্রকৃতপক্ষে মথির সুসমাচার ঈশ্বরের 'আত্মারই' প্রভাবের কথা বলে (মথি ১২:২৮ দ্রঃ); কিন্তু লুক ঈশ্বরের 'আঙুলেরই' প্রভাবের কথা বলেন (লুক ১১:২০ দ্রঃ): তাই সাধু গ্রেগরি অনুসারে 'আঙুলের প্রভাব' হল 'আত্মার প্রভাব' এর নামান্তর, যার ফলে আঙুল বলতে পবিত্র আত্মাকে বোঝায়।

(ঘ) লুক ১১:২০ দ্রঃ।

২:২১৮ (ক) মার্ক ৮:৫৮।

(খ) ইশা ২৬:১০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

২:২১৯ (ক) 'অবিরত অগ্রগতি' সম্পর্কে ভূমিকা - 'মোশির জীবনী' অধ্যায় দ্রঃ।

(খ) যাত্রা ৩৩:১১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২:২২৫ (ক) ফিলি ৩:১৫ দ্রঃ।

২:২২৭ (ক) আদি ২৮:১২ দ্রঃ।

২:২৩২ (ক) ১ করি ১৩:১২ দ্রঃ।

২:২৩৩ (ক) যাত্রা ৩৩:২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

২:২৪১ (ক) যাত্রা ৩৩:২১।

(খ) রো ৮:২৮ বিকল্প গ্রীক পাঠ্য দ্রঃ।

২:২৪৩ (ক) এফে ৪:১৪ দ্রঃ।

২:২৪৪ (ক) সাম ৪০:৩ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১০:৫ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ১৫:৫৮ দ্রঃ।

২:২৪৫ (ক) ২ করি ৫:১ দ্রঃ।

২:২৪৬ (ক) ২ তি ৪:৭-৮ দ্রঃ।

২:২৪৬ (খ) 'ক্রীড়া প্রতিযোগিতা': সাধু গ্রেগরি অন্য একটা লেখায় বলেন, একসময় তিনি কোন একটা গির্জায় এমন চিত্র দেখেছিলেন যেখানে খ্রিষ্ট ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে সাক্ষ্যমরদের পুরস্কৃত করছিলেন। এবিষয়ে এটা স্মরণযোগ্য যে, সন্ন্যাস-কৃচ্ছ্রসাধনায় খ্রিষ্টের খাতিরে যাপিত জীবন রক্তপাতহীন সাক্ষ্যমরণ বলে গণ্য ছিল।

২:২৪৮ (ক) ১ করি ১০:৫ দ্রঃ।

২:২৪৯ (ক) যোহন ১:৩।

(খ) যোহন ১৪:৬।

(গ) শৈল', 'বিশ্রাম', 'বাসস্থান': খ্রিষ্টের এ তিনটে নাম দ্বারা সাধু গ্রেগরি বলতে চান, সিদ্ধতা অভিমুখে প্রাণের যাত্রাপথের প্রতিটি ধাপে খ্রিষ্ট নানা ভাবে উপস্থিত: তাছাড়া তিনিই সেই যাত্রা সাধ্য করেন ও সেই যাত্রার গন্তব্যস্থান।

(ঘ) দ্বিঃবিঃ ১৩:৫ দ্রঃ।

২:২৫০ (ক) সাম ৯১:৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সাম ৬৩:৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২:২৫১ (ক) লুক ৯:২৩।

(খ) লুক ১৮:২২।

২:২৫৩ (ক) যাত্রা ৩৩:২০।

২:২৫৪ (ক) যাত্রা ৩৩:২০ দ্রঃ।

২:২৫৭ (ক) 'প্রাণের পেরেক' : প্লেটোই লিখেছিলেন, প্রাণ পেরেক দিয়ে দেহে বিদ্ধ (ফাইদোন ৮৩গ দ্রঃ)।

২:২৬২ (ক) রো ১৩:১৪।

২:২৬৭ (ক) গণনা ১৩:২৩ দ্রঃ।

২:২৬৮ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩২:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ দ্রঃ।

২:২৭০ (ক) শৈল থেকে উৎসারিত সেই জল ও সেইসঙ্গে দেশ-পরিদর্শন ও আঙুরগুচ্ছের কথা এটা দেখাতে চায় যে, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বুক থেকে উৎসারিত জল যার প্রতীক সেই পাপের ক্ষমা সেই ক্রুশবিদ্ধজনের নামে ও তাঁর পুণ্যেই মঞ্জুর করা হয় যিনি সেই আঙুরগুচ্ছতে পূর্বনির্দেশিত। একথা স্বীকার্য যে, মনপরিবর্তন-সাক্রামেন্তের ব্যাখ্যা হিসাবে সাধু গ্রেগরির একথা চমৎকার।

২:২৭২ (ক) ৩১ পদে সাধু গ্রেগরি সাপকে ক্রুশে উত্তোলিত খ্রিষ্টের প্রতীক করেছিলেন। এই পদে তিনি সেই ব্যাখ্যা ছাড়া এটাও যোগ করেন যে, বাঁচবার জন্য সাপের দিকে তথা ক্রুশেরই দিকে চোখ তোলা দরকার, অর্থাৎ খ্রিষ্ট যেমন ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তেমনি তাঁর অনুকরণে আমাদের পাপের কাছে মৃত্যুবরণ করা দরকার।

২:২৭৪ (ক) সাম ১১৯:১২০ দ্রঃ।

(খ) গা ৬:১৪ দ্রঃ।

২:২৭৫ (ক) রো ৮:৩ দ্রঃ।

২:২৭৬ (ক) গা ৫:১৬-১৭ দ্রঃ। এ পদের অর্থ এরূপ : খ্রিষ্টের সাধিত মুক্তি পাপের ফল ধ্বংস করেছে, কিন্তু পাপের প্রতি মানুষের সহজাত প্রবণতা ধ্বংস করেনি। আর আসলে ঠিক এ অবস্থার কারণেই সাধনার জীবন অত্যাবশ্যক বলে প্রকাশিত, এমন জীবন যা সবসময় খ্রিষ্টের যন্ত্রণাময় ক্রুশের দিকে দৃষ্টি রাখে।

২:২৭৭ (ক) যোহন ৩:১৪।

২:২৭৯ (ক) 'যাজকত্ব আকাঙ্ক্ষা করা': অর্থাৎ বিশপ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। সেসময় বিশপের মর্যাদা ও প্রভাব শুধু মণ্ডলীতে নয়, বৃহত্তর পৌত্তলিক সমাজেও স্বীকৃত ছিল বিধায় বিশপ হওয়া আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

২:২৮৪ (ক) আরোনের লাঠি সংক্রান্ত বিস্ময়কর কাজ ব্যাখ্যা করে সাধু গ্রেগরি যাজকত্বের মর্যাদার পাশাপাশি কোন না কোন যাজকের অযোগ্যতাও তুলে ধরেন।

২:২৮৬ (ক) লুক ৬:৪৩-৪৪ দ্রঃ।

২:২৮৭ (ক) দ্বিঃবিঃ ২৮:১৪ দ্রঃ।

(খ) মথি ৭:১৪ দ্রঃ।

২:২৮৯ (ক) মথি ১০:১৬ দ্রঃ।

(খ) ১ তি ৪:২ দ্রঃ।

২:২৯০ (ক) ১ যোহন ৫:১৯ দ্রঃ।

২:২৯৪ (ক) মার্ক ৫:৯ দ্রঃ।

(খ) মার্ক ঙ:২৪; মথি ৮:২৯ দ্রঃ।

২:২৯৬ (ক) তীত ২:৮ দ্রঃ।

(খ) গণনা ২৩:৮ দ্রঃ।

২:৩০২ (ক) 'মানুষ একটা পশু হয়': সেকালের মানুষের কাছে একথা সাধারণ অত্যুক্তি ছিল না; কেননা প্লেটোর তত্ত্ববিদ্যা অনুসারে সত্ত্ব ও মঙ্গলের মধ্যে যেমন একাকীত্ব রয়েছে, তেমনি মানুষের নৈতিকতা ও তার সত্তার মধ্যেও একাকীত্ব রয়েছে। সেই অনুসারে পশু হওয়ার অর্থ হল পশুর প্রকৃতি ধারণ করা (৩১৬ দ্রঃ)।

২:৩০৩ (ক) প্রবচন ৬:২৭-২৮ দ্রঃ।

২:৩০৪ (ক) মথি ৫:১৯ দ্রঃ।

২:৩১৪ (ক) সিদ্ধতা অভিমুখে যাত্রার সূচনায় প্রাণ দিয়াবল ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের দাস ছিল (২য় পুস্তক ১ দ্রঃ); এবার, যাত্রা শেষে, সেই স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণ ঈশ্বরের দাস হয়ে ওঠে, এ এমন দাসত্ব যা সমস্ত ভয় দূর করে দেয় ও প্রাণকে ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্বে উন্নীত করে (৩২০ দ্রঃ)।

২:৩১৬ (ক) গ্রীক পুরাণ অনুসারে মন্ত্রজালিক কির্কে ছিল সূর্যদেবের কন্যা। মানুষকে মায়াগ্রস্ত করে সে নিজের তৈরী মাদকদ্রব্য পান করিয়ে তাদের নেকড়েতে, সিংহে ও শূকরে রূপান্তরিত করত। এক্ষেত্রে ৩০২ টীকা দ্রঃ]।

২:৩১৮ (ক) 'ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে হয়ে ওঠা': পাপের আগে মানুষের অবস্থা ছিল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও তাঁর সাদৃশ্য অনুসারে সৃষ্ট হওয়া (আদি ১:২৬ দ্রঃ); সেই প্রতিমূর্তি চামড়ার পোশাক দ্বারা (২য় পুস্তকের টীকা ২ দ্রঃ) অর্থাৎ পাপের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছিল; তাই সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্যই প্রাণকে সেই পাপময় আবরণ থেকে মুক্ত করে দেওয়া ও ঐশ্বরিক সেই প্রতিমূর্তি আলোতে ফিরিয়ে আনা; তেমন অবস্থায় প্রাণ তার আদি অবস্থার

বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা অক্ষয়শীলতা, অপরিবর্তনশীলতা, ও অনিষ্ট থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্তি ফিরে পায়।

২:৩১৯ (ক) 'যে সিদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব …': লেখার শুরুতেই সাধু গ্রেগরি বলেছিলেন, 'সিদ্ধতার নাগাল পাওয়া অসাধ্য' (১ম পুস্তক ১০ দ্রঃ), এবং তাঁর সমস্ত বক্তব্যের অর্থই যে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধতা অর্জন করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য; কিন্তু 'যে সিদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব', মোশি যে ঠিক সেটাই অর্জন করেছিলেন, তার প্রমাণ স্বরূপ সাধু গ্রেগরি সেই ঘটনা বর্ণনা করেন যা অনুসারে মোশি মরিয়মকে ও আরোনকে ক্ষমা করেছিলেন ও তাঁদের হয়ে ঈশ্বরকে অনুনয় করেছিলেন (টীকা ২৬১ দ্রঃ]), কেননা সেই উপলক্ষে মোশির বিষয়ে ঈশ্বর তাঁকে নিজের বন্ধু বলে অর্থাৎ সিদ্ধতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে উপস্থাপন করেছিলেন। এই পদে, জনগণের হয়ে ঈশ্বরকে অনুনয় করায় মোশি তাঁর এ বৈশিষ্ট্য পুনরায় প্রদর্শন করেন। বাস্তবিকই সাধু গ্রেগরি, অন্য একটা লেখায়, ঈশ্বরের বন্ধুর চিহ্ন হিসাবে সেই παρρησία (পার্‌রেসিয়া) অর্থাৎ সেই 'সৎসাহস' উল্লেখ করেন যা গুণে তেমন বন্ধু অবাধে ও নির্ভয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে।

(খ) যাত্রা ৩৩:১২ গ্রীক সত্তরী দ্রঃ।

২:৩২০ (ক) 'ঈশ্বরের বন্ধু': সিদ্ধতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালবাসে ও তাঁর বন্ধু হয়ে উঠেছে বলে প্রাথমিক পর্যায়ের যত ভয়-আতঙ্ক অতিক্রম করেছে।